ড. জিয়াউর রাহমান আজমি

হিন্দু বৌদ্ধ জৈন শিখ ধর্মের ইতিহাস

হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ ধর্মের ইতিহাস ● ড. জিয়াউর রাহমান আজমি

ভারতবর্ষ হলো হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ ধর্মের উৎপত্তিস্থল। এই চারটি ধর্ম একত্রে ভারতীয় ধর্ম নামে পরিচিত। বর্তমানে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম যথাক্রমে বিশ্বের তৃতীয় ও চতুর্থ বৃহত্তম ধর্মবিশ্বাস। এই ধর্মগুলোর প্রতিটির মধ্যেই রয়েছে প্রগাঢ় সম্পর্ক। ভারতীয় সমাজে এসব ধর্মের প্রভাব ছিল অপরিসীম।

হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ ধর্মের ইতিহাস গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে ভারতবর্ষের ধর্মসমূহের উপাখ্যান। আর এগুলোর রেফারেন্স আনা হয়েছে সেসব ধর্মের লেখকদের লেখা থেকেই। গ্রন্থটিতে দেখানো হয়েছে সেখানের অসংখ্য মানুষ আল্লাহকে বাদ দিয়ে গাছ-পাথর, মানুষ-জিন ও প্রাকৃতিক শক্তিগুলোকে উপাস্যরূপে কীভাবে গ্রহণ করেছে।

গ্রন্থটি অধ্যয়নে পাঠক হয়তো সৌভাগ্যের পরশে সিজদাবনত হবেন দয়াময় রবের দরবারে। অনুধাবন করবেন, আল্লাহর দরবারের একটি সিজদা কীভাবে আপনাকে মুক্তি দিয়েছে অসংখ্য সৃষ্টির সামনে মাথা ঝোঁকানো থেকে। আলহামদুলিল্লাহি আলা নিমাতিল ইসলাম।

গ্রন্থটি রচনা করেছেন ড. জিয়াউর রাহমান আজমি। ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের উত্তর প্রদেশের আজমগড়ের বিলিরিয়াগঞ্জে এক ধনাঢ্য হিন্দু-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁর নাম ছিল বাঁকেলাল। ১৬ বছর বয়সে তিনি মাধ্যমিক স্তরে অধ্যয়নকালে ইসলামগ্রহণ করেন। পরে জিয়াউর রাহমান নাম গ্রহণ করেন। স্বজাতির নিগ্রহের শিকার হয়ে তিনি প্রথমে পাকিস্তান, এরপর সৌদি আরবে পাড়ি জমান। সেখানে তিনি মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স ও মক্কার কিং আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি এবং মিসরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

কর্মজীবনে তিনি মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদালয়ে প্রফেসর নিযুক্ত হন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। হাদিস অনুষদের ডিন হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। তাঁকে সৌদি আরবের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়। ২০২০ খ্রিষ্টাব্দের ২০ জুলাই এই মহান মনীষী ইনতিকাল করেন।

Kalantor Prokashoni

Hindu, Bouddah, Jain o
Shik Dharmer Etihas
by Dr. Jiaur Rahman Ajomi
Kalantor Prokashoni
Price : ৳ ২৩০ US $ 10, UK £ 7
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
www.kalantorprokashoni.com
facebook.com/kalantorprokashoni

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

ড. জিয়াউর রাহমান আজমি

হিন্দু বৌদ্ধ জৈন শিখ ধর্মের ইতিহাস

হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ ধর্মের ইতিহাস

মূল : ড. জিয়াউর রাহমান আজমি

অনুবাদ : মহিউদ্দিন কাসেমী

কালান্তর প্রকাশনী

প্রকাশকাল : ৫ জুন ২০২১

©: প্রকাশক

মূল্য : ৳ ২৩০, US $ 10. UK £ 7

প্রচ্ছদ : মুহারেব মুহাম্মাদ

প্রকাশক

কালান্তর প্রকাশনী

বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার

সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

ঢাকা বিক্রয়কেন্দ্র

ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা

বাংলাবাজার, ঢাকা।

০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

অনলাইন পরিবেশক

রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া

bokharasyl@gmail.com

Hindu, Bouddah, Jain o
Shik Dharmer Etihas
by Dr. Jiaur Rahman Ajomi

Published by

Kalantor Prokashoni

+88 01711 984821

kalantorprokashoni10@gmail.com

facebook.com/kalantorprokashoni

www.kalantorprokashoni.com

প্রকাশকের কথা

হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও শিখধর্মের গোড়ার কথা নিয়ে বাংলাভাষায় তেমন কোনো গ্রন্থ চোখে পড়ে না। সেই শূন্যতা পূরণে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি বাংলাভাষায় অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। গ্রন্থটি আরবিভাষায় রচনা করেছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত আলিম ও গবেষক ড. জিয়াউর রাহমান আজমি রাহ.। লেখক কোনো ধরনের বাড়াবাড়ি বা বাহুল্য ছাড়াই এত চমৎকার একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, যা পাঠ করলে আপনি অবাক হবেন নিশ্চয়।

মূল গ্রন্থের নাম *ফুসুলুন ফি আদইয়ানিল হিন্দি, আল-হিনদুসিয়াতু, ওয়াল বুজিয়াতু, ওয়াল জাইনিয়াতু, ওয়াস সিখিয়াতু ও আলাকাতুত তাসাওউফি বিহা*। বাংলায় যার অনুবাদ দাঁড়ায় 'হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ ধর্ম তথা ভারতীয় ধর্মসমূহের সমীক্ষা ও সুফিবাদের সঙ্গে এসবের সম্পর্ক'। কিন্তু অনুবাদগ্রন্থটির নাম আমরা সংক্ষেপে রেখেছি *হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ ধর্মের ইতিহাস*। যেহেতু ভারতবর্ষের এসব ধর্মের গোড়ার ইতিহাসই এ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, তাই নামটি আমাদের কাছে যথার্থ মনে হয়েছে।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু জটিল এই গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন মহিউদ্দীন কাসেমী। তাঁর অনুবাদ পড়ে আমার কাছে মনে হয়নি যে, আমি কোনো অনুবাদগ্রন্থ পড়ছি। এত কঠিন আর জটিল বিষয়গুলো তিনি তাঁর শব্দের জাদু প্রয়োগ করে অনুবাদ করেছেন। আল্লাহ তাঁর সবকিছুতে বরকত দিন।

গ্রন্থটি পড়লে পাঠক আমাদের অন্যান্য গ্রন্থের মতো এতেও চমৎকার বিন্যাস দেখতে পাবেন। যদিও মূল গ্রন্থ এভাবে বিন্যাস করা ছিল না। পাঠকের সহজবোধ্যতার জন্য, প্রতিটি বিষয় ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য আমরা আমাদের মতো করে গ্রন্থটি সাজিয়েছি। অধ্যায়, পরিচ্ছেদ, শিরোনাম-উপশিরোনাম ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে। শিরোনাম-উপশিরোনামগুলো ক্রমিক নম্বর দিয়ে সাজানো

হয়েছে। কিছু শিরোনাম-উপশিরোনামও আমাদের থেকে বাড়িয়েছি। অনুবাদক বা সম্পাদকের পক্ষ থেকে দুর্বোধ্য জায়গাগুলোতে টীকা সংযোজন করা হয়েছে। এতে পাঠকের কাছে কোনো বিষয় আর দুর্বোধ্য থাকবে না আশা করি। আয়াত এবং হাদিসের আরবি ইবারত দেওয়া হয়েছে।

গ্রন্থটি অনেক আগে প্রকাশের ইচ্ছা থাকলেও নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে সম্ভব হয়নি। আর গ্রন্থটিও সার্বিকভাবে এত জটিল যে, একেকটা নামের সঠিক উচ্চারণ বের করতে গলদ্‌ঘর্ম হতে হয়েছে। অতিরিক্ত সতর্কতার জন্য প্রায় প্রতিটি নামের উচ্চারণ আমরা দ্বিতীয়বার যাচাই করেছি। এতে বহুল প্রচলিত নামগুলো রাখার চেষ্টা করেছি। অধিকাংশ নামের সঙ্গে আবার ইংরেজি বানানও সংযুক্ত করা হয়েছে।

ভাষা, বানান এবং এসব জটিল কাজে আমাকে সহযোগিতা করেছেন ইলিয়াস মশহুদ ও আবদুল্লাহ আরাফাত। তাঁরাসহ গ্রন্থটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার কল্যাণ কামনা করছি। বিশেষ করে লেখকের জন্য অনিঃশেষ দুআ থাকল।

আমরা আমাদের সাধ্যের ভেতর থেকে চেষ্টা করেছি একটা নির্ভুল গ্রন্থ আপনাদের হাতে তুলে দেওয়ার। কতটুকু পেরেছি, তা বিবেচনার ভার পাঠকের হাতে। এতকিছুর পরও ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। কোনো ভুল নজরে পড়লে আমাদের অবগত করবেন, ইনশাআল্লাহ আমরা সংশোধন করব। আল্লাহ সবাইকে কবুল করুন। গ্রন্থটিকে কবুল করুন।

আবুল কালাম আজাদ
প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
১ জুন ২০২১

অনুবাদকের কথা

ভারত এক বৈচিত্র্যময় ভূখন্ড। এখানের অপার্থিব সৌন্দর্য, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-পোশাক ও ভাষার বৈচিত্র্য একে একটি ঐতিহ্যশালী অঞ্চলে পরিণত করেছে। তাই তো ইতিহাসবিদগণ ভারত উপমহাদেশকে পৃথিবীর প্রতিলিপি মনে করেন।

ভারতের জনসাধারণের মধ্যে যে ধর্মকেন্দ্রিক পার্থক্য দেখা যায়, তা বিশ্বের আর কোথাও দেখা যায় না। ভারত একাধারে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ ধর্মের উৎপত্তিস্থল। এই চারটি ধর্ম একত্রে ভারতীয় ধর্ম নামে পরিচিত। বর্তমানে এই ধর্মমতগুলো ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির ওপর এসব ধর্মের প্রভাব অত্যন্ত গভীর। তাই ভারতীয় সমাজ, দর্শন, ঐতিহ্য ও ইতিহাস সম্পর্কে যথাযথ ধারণা পেতে এসব ধর্মের ইতিহাস সম্পর্কে জানাশোনার বিকল্প নেই।

অভিজাত প্রকাশনী হিসেবে সুপরিচিত কালান্তর প্রকাশনী বাংলাভাষী ইতিহাসপ্রেমীদের হাতে তুলে দিচ্ছে ভারতবর্ষের ধর্মসমূহের ইতিহাস-সংবলিত ড. মুহাম্মাদ জিয়াউর রাহমান আজমি রচিত গ্রন্থ *হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ ধর্মের ইতিহাস*। আশা করছি, বাংলাভাষায় ভারতীয় ধর্মসমূহের ইতিহাস-সংক্রান্ত গ্রন্থের অভাব পূরণে বইটি মাইলফলক হয়ে থাকবে এবং পাঠকরাও বইটিকে সমাদরে গ্রহণ করে নেবেন।

বই প্রকাশের এই আনন্দঘন মুহূর্তে শুকরিয়া আদায় করছি মহান আল্লাহর। ইতিহাসের এক নতুন সরোবরে অবগাহনের আনন্দ বইটির অনুবাদের সব কষ্ট-যাতনা নিমিষেই ভুলিয়ে দিয়েছে। বহু অযোগ্যতা ও দুর্বলতা সত্ত্বেও মহান আল্লাহর তাওফিকে এই কাজটি আনজাম দেওয়া সম্ভব হয়েছে। রাব্বে কারিমের দরবারে ফরিয়াদ, এই সামান্য খিদমতটুকু যেন হয় পরকালের পাথেয়।

বইটির প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সবার বিনিময়ভার সোপর্দ করছি উত্তম বিনিময়দাতার উদ্দেশে। বিশেষত, প্রতিকূল পরিবেশেও বইটি প্রকাশনার গুরুদায়িত্ব ধৈর্যের সঙ্গে আনজাম দিয়েছেন প্রকাশক মহোদয়। মহান আল্লাহ সবার খিদমতকে ইখলাসের মোড়কে কবুল করুন।

মহিউদ্দিন কাসেমী
২০ মে ২০২১

সূচি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হিন্দুসমাজের শ্রেণিবিন্যাস # ৫৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হিন্দু আচারবিধি বা আইনশাস্ত্র # ৬৯

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হিন্দুদের পারিবারিক বিধিবিধান # ৭৫

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হিন্দুদের উপদলসমূহ # ৭৯

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

হিন্দু ধর্মমতে উপাসনা # ৮৪

সপ্তম পরিচ্ছেদ

হিন্দুদের গুরুত্বপূর্ণ ধর্মবিশ্বাস # ৮৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৌদ্ধধর্ম : ইতিহাস ও ধর্মবিশ্বাস # ১০৮

প্রথম পরিচ্ছেদ

বৌদ্ধধর্ম আবির্ভাবের ইতিহাস # ১০৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গৌতম বুদ্ধের শিক্ষাসমূহ # ১১৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বৌদ্ধধর্মে স্রষ্টার ধারণা # ১১৮

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বৌদ্ধ ধর্মমতে উপাসনা # ১২৫

তৃতীয় অধ্যায়

জৈনধর্ম : ইতিহাস ও ধর্মবিশ্বাস # ১২৮

প্রথম পরিচ্ছেদ

জৈনধর্মের গোড়ার কথা # ১২৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জৈনদের ধর্মবিশ্বাস # ১৩৪

চতুর্থ অধ্যায়

শিখধর্ম : ইতিহাস ও ধর্মবিশ্বাস # ১৩৯

প্রথম পরিচ্ছেদ

শিখধর্ম আবির্ভাবের পটভূমি # ১৪০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শিখধর্মে হিন্দু-দর্শন # ১৪৬

মুখবন্ধ

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর। সালাত ও সালাম অবতীর্ণ হোক তাঁর রাসুলের ওপর, রাসুলের পরিজন ও সহচরদের ওপর।

গ্রন্থটি ভারতীয় অঞ্চলের হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ ধর্ম সম্পর্কে সংকলন করা হয়েছে। মদিনাতুর রাসুলের ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাময়িকীতে হিন্দুধর্ম-সংক্রান্ত বিভিন্ন নিবন্ধ লেখার সূত্রে এ বিষয়ের সঙ্গে আমি দীর্ঘ ২০ বছর ধরে সম্পৃক্ত ছিলাম। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ব্যস্ততায় জড়িয়ে পড়লেও সুযোগ পেলেই এই ধর্মের অনুসারীদের রচিত গ্রন্থসমূহ অধ্যয়নে আগ্রহী ছিলাম।

১৪০৯ হিজরিতে আমার রচিত *আল-ইয়াহুদিয়া ওয়াল মাসিহিয়া* বা *ইয়াহুদি ও খ্রিষ্টধর্মের ইতিবৃত্ত* প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির ভূমিকায় আমি ভারতবর্ষের ধর্মগুলোর ইতিবৃত্ত নিয়ে কলম ধরার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম।

আলহামদুলিল্লাহ, আজ সেই মাহেন্দ্রক্ষণ এসেছে, যখন আমি সেই প্রতিশ্রুত গ্রন্থটির সংকলন সমাপ্ত করতে পেরেছি। আজ আমি সৌভাগ্যের পরশ অনুভব করছি মুসলমানের ধর্ম ও আকিদার জন্য। কেননা, এটি তাদের সিজদাবনত করে দেয়, যখন তারা নিজেদের চোখের সামনে মিলিয়ন মিলিয়ন মানবসন্তানকে ভ্রষ্টতা ও মূর্খতার গহ্বরে তলিয়ে যেতে দেখে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য দীন একমাত্র ইসলাম। [সুরা আলে ইমরান : ১৯]

তিনি আরও বলেন,

﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا ۖ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ ۖ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾

যারা আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করে, তাদের উদাহরণ হচ্ছে মাকড়সা, সে ঘর বানায়। আর সব ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো অধিক ভঙ্গুর, যদি তারা জানত। [সুরা আনকাবুত : ৪১]

আরও ইরশাদ হয়েছে,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ ۖ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ۚ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ﴾

হে লোকসকল, একটি উপমা বর্ণনা করা হলো। অতএব, তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোনো। তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের পূজা করো, তারা কখনো একটি মাছি সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা সবাই একত্রিত হয়। আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোনোকিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করতে পারবে না। প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয়, উভয়েই শক্তিহীন। [সুরা হজ : ৭৩]

পাঠক, আমাদের উচিত আল্লাহর মনোনীত দীন অনুধাবন করা। ধর্মীয় বিষয়ে দক্ষতা লাভ করা। আল্লাহর একত্ববাদ, তাঁর সুন্দর নাম ও গুণাবলির সম্যক জ্ঞানার্জনই সত্যিকারের পাণ্ডিত্য। গ্রন্থের ভেতরে আপনি দেখতে পাবেন কীভাবে একটি জাতি পুরোপুরি ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হয়েছে। কীভাবে তারা আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণের পরিবর্তে গাছ-পাথর, মানুষ-জিন ও প্রাকৃতিক শক্তিগুলোকে নিজেদের উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে। এদের ব্যাপারেই মন্তব্য করা হয়েছে যে, তারা এক স্রষ্টার ইবাদত থেকে পালিয়ে অসংখ্য স্রষ্টার উপাসনায় লিপ্ত হয়েছে।

বলা হয়েছে, আল্লাহর দরবারে একটি সিজদা আপনাকে অসংখ্য প্রভুর সামনে অবনত হওয়া থেকে বাঁচিয়ে দেবে।

গ্রন্থটি সংকলনে যেসব বিষয় লক্ষ করেছি

১. সংশ্লিষ্ট ধর্মগুলোর অনুসারীদের মতামতের আলোকে তথ্য উপস্থাপন করেছি।

২. এসব ধর্মাবলম্বীদের উপাস্য দেব-দেবীর গালমন্দ করা থেকে নিবৃত্ত থেকেছি। তারা তাদের দেব-দেবীকে যেভাবে উপস্থাপন করে, আমিও সেভাবেই উত্থাপন করেছি। এ ক্ষেত্রে আমি কুরআনের সেই নির্দেশনার অনুসরণ করেছি, যেখানে বলা হয়েছে—

﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾

'তোমরা তাদের মন্দ বলো না, যাদের তারা আরাধনা করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে, তাহলে তারা ধৃষ্টতা করে অজ্ঞতাবশে আল্লাহকে মন্দ বলবে।' [সুরা আনআম : ১০৮]

আমি শুধু তাদের ধর্মবিশ্বাসকে তুলে ধরেই আলোচনা শেষ করিনি; বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমি ইতিহাসের নিরিখে ও তাদের গ্রন্থসমূহের আলোকে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে সেই বিশ্বাস খণ্ডনের চেষ্টা করেছি।

৩. আমি প্রতিটি বিষয়ের বিশ্লেষণে যাওয়ার পরিবর্তে তা নিয়ে খুবই সংক্ষেপে আলোচনা করেছি—যেহেতু তাদের ধর্মীয় বিষয়াদির বিশ্লেষণে তাদের মধ্যেই বহু মত রয়েছে। কেননা, মৌলিক বিশ্বাস ও বর্ণনার ধারাবাহিকতা তথা সনদের বাধ্যবাধকতা না থাকায় তারা তাদের গ্রন্থগুলোতে অসামঞ্জস্যপূর্ণ অনেক বর্ণনা সন্নিবেশ করেছে। তাদের অনেক পণ্ডিত এ কথা স্বীকারও করেছেন যে, আরব ও গ্রিকরা যেভাবে নিজেদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ করেছে, হিন্দুরা সেভাবে তা সংরক্ষণ করেনি।

৪. হিন্দুদের ধর্মীয় বিষয়াদির বিবরণে আমি মোটাদাগে তাদের রচিত গ্রন্থাবলির ওপর ভরসা করেছি। তাই বহু আলোচনায় হিন্দুধর্মের প্রাচীন ও আধুনিক যুগের ধর্মবেত্তাদের উদ্ধৃতি পাঠকের নজরে পড়বে। অবশ্য প্রসিদ্ধি ও আমার জানাশোনার ভিত্তিতে কখনো কখনো আমি তথ্যসূত্র উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিনি।

আল্লাহর অনুগ্রহে ১৪০০ ও ১৪০১ হিজরিতে আমি হাদিস অনুষদে 'ধর্ম ও মতবাদ' বিষয়ের অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেছিলাম। তখন আমার কাছে এ বিষয়ে বিস্তর তথ্য একত্রিত হয়েছিল, যার ওপর ভিত্তি করে ১৪০৯ হিজরিতে *ইয়াহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মের ইতিবৃত্ত* রচনা করেছি।

এরই ধারাবাহিকতায় এবার পরবর্তী অধ্যায়ে ভারতবর্ষের ধর্মসমূহ বিন্যস্ত করে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছি। আশা করছি, শিক্ষার্থী এবং মূর্তিপূজকদের মধ্যে দাওয়াত ও ইরশাদের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। মহান আল্লাহ আমাদের শান্তির পথ প্রদর্শন করুন এবং ইসলামের ওপর আমাদের মৃত্যু দিন।

মুহাম্মাদ জিয়াউর রাহমান আজমি

সংযুক্তি : ১৫ জুমাদাল উখরা ১৪১২ হিজরিতে গ্রন্থটির রচনা সমাপ্ত হয়েছিল। পুনর্পাঠান্তে বিভিন্ন সংশোধনীসহ সমাপ্ত করা হয় ২৫ জিলহজ ১৪১৬ হিজরিতে।

প্রথম অধ্যায়

ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান ও হিন্দুজাতির ইতিহাস

- ইতিহাসের আলোকে ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান
- হিন্দুসমাজের শ্রেণিবিন্যাস
- হিন্দু আচারবিধি বা আইনশাস্ত্র
- হিন্দুদের পারিবারিক বিধিবিধান
- হিন্দুদের উপদলসমূহ
- হিন্দু ধর্মমতে উপাসনা
- হিন্দুদের গুরুত্বপূর্ণ ধর্মবিশ্বাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইতিহাসের আলোকে ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান

বিস্তীর্ণ ভূমি, জনসংখ্যার আধিক্য ও সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক খনিজ ভান্ডারের বিবেচনায় ভারতকে একটি স্বতন্ত্র মহাদেশ হিসেবে গণনা করা যায়। ভারত বলতে আমরা হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত সেই ভূখণ্ডকে বুঝি, যা উত্তরে কাশমির থেকে ভূটান, দক্ষিণে কন্যাকুমারী, পশ্চিমে সিন্ধ ও পূর্বে মায়ানমার পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পুরো ভূ-ভাগকে ভারত নামে চেনা হলেও প্রাচীন ইতিহাসের গ্রন্থাবলির আলোকে জানা যায়, শুরুতে এত বিস্তীর্ণ অঞ্চল ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কাশমির থেকে অন্ধ্র প্রদেশের কিছু অংশ ও সিন্ধ থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত ছিল বৈদিক ভারতের বিস্তৃতি। বর্তমান ভারতের দক্ষিণাঞ্চল, মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্র প্রদেশের বৃহদংশ বৈদিক ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

এক. ভারতের প্রাচীন অধিবাসী

খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দে সিন্ধ অঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসীদের ইতিহাস বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে সন্নিবেশিত করা হয়নি। বর্তমানের মহেঞ্জোদারোর মতো প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারসমূহ থেকে সেখানকার তৎকালীন সমৃদ্ধ সভ্যতার ধারণা পাওয়া যায়। কতিপয় গবেষক বিশ্বাস করেন, এই আবিষ্কারগুলো থেকে এসব অঞ্চলে জাতি, বর্ণ এবং শারীরিক গঠনে সাদৃশ্যপূর্ণ একটি প্রজন্মের অস্তিত্বের ধারণা পাওয়া যায়। তারা মনে করেন, ইতিহাসে এরা 'দ্রাবিড়' নামে পরিচিত। এই জনগোষ্ঠী ছিল পাহাড়, জঙ্গল ও জলাশয়ের ধারে বসবাস করা স্থায়ী-অস্থায়ী অধিবাসী কোল-সম্প্রদায়—ইতিহাসে যাদের 'বর্বরজাতি' নামে পরিচিত এবং তুর্কিস্তানের বংশোদ্ভূত তুরানিজাতির সমন্বয়ে গঠিত। এই তুরানিজাতি খ্রিস্টপূর্ব কয়েক সহস্রাব্দ পূর্বে ভারতবর্ষে এসে কোলদের পরাভূত করে। কালপরিক্রমায় তারা

কোলদের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। একপর্যায়ে তাদের এই মেলবন্ধনের ফলে দ্রাবিড় নামের একটি নতুন জাতির আত্মপ্রকাশ ঘটে।

পরে দ্রাবিড়রা সিন্ধু উপত্যকায় কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। হড়প্পা ও মহেঞ্জোদারো শহর দুটি ছিল তাদের মূল নিবাস। আজকাল এই অঞ্চলে সে সময়ের বহু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের দেখা মিলছে এবং এসব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের আলোকে এখনো গবেষণা অব্যাহত আছে।

দ্রাবিড়রা ধীরে ধীরে সিন্ধুভূমি থেকে দক্ষিণ ভারতের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। দ্রাবিড়দের মধ্যে চারটি ভিন্ন ভিন্ন ভাষার প্রচলন ছিল : কন্নড়, মালয়, তামিল ও তেলেগু। ভাষাগত তারতম্যের সূত্র ধরে এবার দ্রাবিড়রা চারটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তারা কয়েক শতক ধরে তাদের চেয়ে বহুগুণে শক্তিমান ও উন্নত সভ্যতার অধিকারী আর্যদের বিরুদ্ধে সংঘাতে লিপ্ত ছিল। আর্যরা অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহারে তাদের চেয়ে সমধিক পারদর্শী ছিল। তারা সে সময়ের লোহার তৈরি আধুনিক অস্ত্র ব্যবহার করত; যখন দ্রাবিড়রা শুধু হাড়, কাঠ এবং পাথরের তৈরি অস্ত্রের ওপর নির্ভরশীল ছিল।

এই সময়ে খ্রিস্টপূর্ব দেড় হাজার বছর থেকে গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীর স্বামীর আত্মপ্রকাশ পর্যন্ত একদিকে যেমন ভারতবর্ষের গোত্রগুলোর মধ্যে ভয়াবহ অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হয়, অন্যদিকে দ্রাবিড় ও আর্যদের মধ্যে চলছিল রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ।

এ লড়াই শুধু রাজনৈতিক ও শাসনক্ষমতার দ্বন্দ্বেই সীমিত ছিল না। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতক পর্যন্ত ধর্মবিশ্বাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতির অঙ্গনেও এই সংঘাত চলমান ছিল। আর্যদের বিজয়ের মাধ্যমে এই দ্বৈরথের সমাপ্তি ঘটে। স্থানীয় অধিবাসীরা আর্যদের আনুগত্য গ্রহণ করে। পরে আর্যরা সমাজব্যবস্থাপনা ঢেলে সাজাতে শুরু করে। এভাবেই ভারতবর্ষের স্থানীয় অধিবাসীরা বৈদিক সমাজে প্রবেশ করে। আর্যরা ভারতের স্থানীয় অধিবাসীদের চারটি শ্রেণিতে বিন্যাস করে :

১. **ব্রাহ্মণ :** আর্য বংশোদ্ভূতরা এই শ্রেণিতে স্থান পেয়েছিল।
২. **ক্ষত্রিয় :** এরা ছিল যোদ্ধাশ্রেণি বা রাজপুত। তবে বিশুদ্ধ মতানুযায়ী এরাও আর্যদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরা মূলত এমন রাজন্যবর্গের উত্তরসূরি ছিল, যারা শুরুর দিকে ভারত বিজয়ে অবদান রেখেছিল।
৩. **বৈশ্য :** এরা ছিল কোল ও তুরানি গোত্রের অধিবাসী, যারা পরবর্তীকালে

দ্রাবিড় নামে পরিচিত হয়েছিল।

৪. **শূদ্র** : দ্রাবিড়দের সেসব জনগোষ্ঠী, যারা তত দিনেও আর্যদের বশ্যতা মেনে নিতে ও বৈদিক যুগে প্রবেশ করতে সম্মত ছিল না। আর্যরা এদের নিজেদের সেবাদাস হিসেবে গণ্য করত।

এই শ্রেণিবিভাজনের প্রতিটি স্তর নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা সামনে তুলে ধরা হবে।

এরপর আর্যরা গ্রন্থরচনা ও সংকলনে মনোযোগী হয়। এর পাশাপাশি তারা প্রাকৃতিক বিভিন্ন শক্তিকে নিজেদের প্রভু হিসেবে গ্রহণ করতে শুরু করে। ধর্মের নামে বিভিন্ন রীতিনীতি ও শ্লোক ইত্যাদির আবিষ্কার করে। একপর্যায়ে আর্যদের এসব ধর্মবিশ্বাস, মানুষদের মধ্যে শ্রেণিবিভাজন ও ধর্মীয় রীতিসমূহের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটে।

দুই. ভারতবর্ষে আর্যদের আগমন

সংস্কৃতভাষায় আর্য বলতে বুদ্ধিমান জনগোষ্ঠীকে বোঝানো হয়। এরা সাদা চামড়া ও কৃষ্ণ কেশের অধিকারী এমন সম্প্রদায়, যারা ছিল সংস্কৃত ভাষাভাষী। পরবর্তী সময়ে শব্দটি এমন জনগোষ্ঠীর ব্যাপারে ব্যবহার হতে থাকে, যাদের আদি বংশপরম্পরা নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। কেউ কেউ মনে করেন, এদের আদি নিবাস ছিল ইউরোপের দানিউব অঞ্চল।[১] বাস্তুসংকটের মুখোমুখি হয়ে এরা এশিয়া অভিমুখী হয়। নতুন গবেষণা থেকে জানা যায়, এদের গাত্রবর্ণ ছিল সোনালি রংয়ের কাছাকাছি। *ঋগ্‌বেদ* ও *যজুর্বেদের* বিবরণমতে, এটা ছিল তাদের দেবতা ইন্দ্রের পছন্দনীয় বর্ণ।[২]

ঋগ্‌বেদের প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছে, 'একজন সাধক প্রভুর দরবারে প্রার্থনা করেছিলেন, স্রষ্টা যেন তাকে একটি সন্তান দান করেন এবং সে যেন হয় স্বর্ণবর্ণ।' বর্ণগত এই মিলের কারণে গবেষকদের একটি অংশ মনে করেন, আর্যরা ইউরোপিয়ান বংশোদ্ভূত। এদিকে উত্তর ইউরোপে এমন কিছু প্রাচীন মাথার খুলি পাওয়া গেছে, আর্যদের মাথার খুলির সঙ্গে যার মিল পাওয়া যায়। তাদের মতে, এরা খাদ্যের অন্বেষণে নিজেদের আদি নিবাস দানিউব উপকূল ছেড়ে বসফরাস প্রণালীতে এসে পৌঁছায়। এরপর দার্দানেলিশ প্রণালী[৩] হয়ে ইরান-আফগানিস্তানের

[১] দানিউব নদীর তীরে হাঙ্গেরি ও অস্ট্রিয়া অবস্থিত। — অনুবাদক।

[২] তাদের দেবতা রুদ্র ছিলেন সোনালি বর্ণের।

[৩] উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় তুরস্কে অবস্থিত আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রাকৃতিক জলপথ। এটি

পথ ধরে তারা সিন্ধ অঞ্চলে পা রাখে। পথিমধ্যে প্রতিটি অঞ্চলে এদের বিভিন্ন অংশ থেকে যায়। এবার সিন্ধু অঞ্চলের স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে এরা সংঘাতে জড়ায়। স্থানীয়রা এদের যথাযথভাবে মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়নি। এই সংঘাত প্রায় হাজার বছর ধরে অব্যাহত থাকে। পরিশেষে সিন্ধুর অধিবাসীরা রণে ভঙ্গ দিয়ে পাহাড়-জঙ্গলে পালিয়ে যায়। আবার তাদের একটি অংশ উত্তর ভারতে পাড়ি জমায়। তবে শেষপর্যন্ত তারাও বৈদিকসমাজে প্রবেশ করে; আর দ্রাবিড়দের অবশিষ্টরা আর্যদের আজ্ঞাবহ দাসে পরিণত হয়।

গুস্তাভ লে বন (Gustave le Bon) মনে করেন, তাদের দেশান্তর হওয়ার দুটি পথ খোলা ছিল :

১. ইউরোপে পাড়ি জমানোর পথ।

২. ইরানের পথ।

আবার অনেক গবেষক মনে করেন, আর্যরা মূলত এশিয়ান বংশোদ্ভূত। তারা মধ্য-এশিয়ার তুর্কিস্তান অঞ্চলে জাইহুন নদীর[৪] উপকূলে বসবাস করত। অজ্ঞাত কোনো এক যুগে এই জাতির বৃহৎ একটি অংশ দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে একদল ইউরোপে ও অপর দলটি ইরান অতিক্রম করে ভারতে পৌঁছায়। অন্যদিকে গুস্তাভ লে বন মনে করেন, আর্যদের আদি নিবাস ছিল ইরান। তিনি তার *The Civilisations of India* গ্রন্থে বলেন, 'আমি এখানে আর্যদের আদি নিবাস নিয়ে নতুন গবেষণা তুলে ধরতে চাচ্ছি না। তবে আমি বলতে চাই, এসব প্রচলিত মতামতের বাইরেও বহু সম্ভাবনা রয়েছে। হতে পারে, আর্যরা ছিল ইরানের অধিবাসী। তাদের মধ্যে যারা ভারতের সীমান্তে অবস্থান করত তারা কয়েক ধাপে ভারতে প্রবেশ করেছিল, যেভাবে তাদের পূর্বপুরুষদের অনেকে ইউরোপে হানা দিয়েছিল। বহুল প্রচলিত মতামতের বিপরীতে আমার মনে হয়, বিজিত জাতিসত্তার মধ্যে এদের রক্তের প্রভাব খুব কমই প্রকট হয়েছিল।'[৫]

এর সঙ্গে আমি আরও যোগ করতে পারি, ভাষাতত্ত্বের দিক থেকেও প্রতীয়মান হয়, আর্যরা মূলত পারস্য বংশোদ্ভূত ছিল। আমি বলতে পারি, আর্যদের সংস্কৃত ভাষায় ফারসি ভাষার বহু শব্দ সন্নিবেশিত রয়েছে। এ ছাড়া ইতিহাসে এর কোনো প্রমাণ নেই যে, ভারতীয়রা কখনো পারস্যে পাড়ি জমিয়েছিল, যার ফলে তাদের

এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে মহাদেশীয় সীমানা তৈরি করে। — অনুবাদক।

[৪] আমু দরিয়া মধ্য-এশিয়ার দীর্ঘতম নদী। — অনুবাদক।

[৫] *ভারতীয় সভ্যতা* : ২৬০।

ভাষায় ফারসির এমন প্রভাব পড়েছিল। এ কারণেই ভাষাবিদগণ দৃঢ়ভাবে এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, সংস্কৃত ভাষাভাষী আর্য ও ফারসি ভাষাভাষীগণ একই ভূখণ্ডের বাসিন্দা ছিলেন।

উদাহরণস্বরূপ আমরা কিছু ফারসি ও সংস্কৃত শব্দ দেখতে পারি :

ফারসি শব্দ	সংস্কৃত শব্দ	অর্থ
আঙ্গাশত	আনকাশত	আঙুল
বাজু	বাহু	বাহু
দাস্ত	হাস্ত	হাত
চর্ম	চর্ম	চামড়া
জানু	জানু	রান
নর	নর	পুরুষ
পায়	পাও	পা
খুন	শুন	রক্ত
সার	শার	মাথা
আবরু	আভরু	ভ্রু
খাব	শাব	ঘুম
শব	শবা	রাত
পেদার	পিত্র	পিতা
মাদার	মাত্র	মা
বেরাদর	ভাত্র	ভাই
দুখতার	দুহতার	মেয়ে
খুসর	শ্বশুর	শ্বশুর
রোম	রোম	লোম
পাঞ্জ	পাঞ্জ	পাঁচ
হাফত	সপ্ত	সাত
হাফতম	সপ্তম	সপ্তম
শশম	ষষ্ঠম	ষষ্ঠ
নহম	নবম	নবম
দহম	দশম	দশম

য়েক	এক	এক
তারা	তারা	তারকা
হুর	সূর্য়া	সূর্য
মাহ	মাস	মাস
রোজ	রোয	দিন
শাম	শাম	বিকেল
মাহর	মাহর	সূর্য
হাওয়া	বায়ু	বাতাস
সরদ	শর্দ	ঠান্ডা
আব	আব	পানি
তিশনা	তৃষ্ণা	তৃষ্ণা
সিয়াহ	শিয়াম	কালো
সায়া	ছায়া	ছায়া
দিওয়ার	দিওয়ার	দেয়াল
জঙ্গল	জঙ্গল	বন/জঙ্গল
নাম	নাম	নাম
নও	নও	নতুন
জাল	জাল	জাল
গাও	গও	গাভি
শাখ	শাখা	শাখা

এখানে আমি উদাহরণস্বরূপ আকবর শাহ খান রচিত *আল-ফিদ ওয়া মাসআলাতু কিদামিহি* থেকে ফারসি ও সংস্কৃত ভাষার কিছু শব্দ তুলে ধরেছি।

তিনি আরও বলেন, এ ধরনের শব্দমালার তালিকায় হাজার হাজার শব্দের সন্নিবেশ করা সম্ভব। আমি এখানে উভয় ভাষার শব্দমালার তুলনা করতে শ-খানেক শব্দের তালিকা তুলে ধরেছি। এই ছোট তালিকা এ কথা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট যে, সংস্কৃত ভাষা ফারসি ভাষা থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে।*

মোটকথা, এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, সংস্কৃত ভাষাভাষী আর্যরা বস্তুত পারস্যের অধিবাসী ছিল।

* এখানে তার উল্লিখিত সবকটি শব্দ উল্লেখ করা হয়নি।

অধুনাকালের অভিনেশ চন্দ্র, স্বামী শংকরানন্দ ও রায় বাহাদুর রাম প্রসাদের মতো হিন্দু বিদ্বানগণ ও জার্মান পণ্ডিত জির মনে করেন, আর্যরা অন্য কোনো অঞ্চল থেকে আগমন করেনি। তারা মহেঞ্জোদারোর কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের বরাতে দাবি করেন, ভারতই ছিল আর্যদের আদি নিবাস।

কিন্তু বর্ণ ও শারীরিক কাঠামোর দিক থেকে ভারতের অন্যান্য অধিবাসীর চেয়ে ভিন্নতর আর্যদের সঙ্গে ইউরোপিয়ানদের সাদৃশ্য বেশি প্রতিভাত হয়। তাই বিশুদ্ধ মতানুযায়ী আর্যরা ইউরোপিয়ানদেরই বংশোদ্ভূত।[১]

ভেচ (Weech)-এর মতে, 'পাঞ্জাবে আমরা এমন জনগোষ্ঠীর দেখা পাই, যারা দীর্ঘকায়, শুভ্র বা এর কাছাকাছি বর্ণের সুচালো মুখাবয়বের অধিকারী। ভারতের স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে সাধারণত এ ধরনের মুখাবয়ব দেখা যায় না; যেখানে তুরানি ও দক্ষিণের স্থানীয় অধিবাসীদের মুখাবয়ব চ্যাপ্টা ধরনের; আবার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে আর্যদের গঠনের মানুষের দেখা মেলা ভার। একইভাবে আর্যদের বিরুদ্ধে দ্রাবিড়দের হাজার বছরের সংঘাতের ইতিহাস সর্বজনবিদিত। তারা পুরুষানুক্রমে এই দ্বন্দ্ব প্রবহমান রেখেছিল। আর্যরা যদি ভারতের স্থানীয় অধিবাসী হতো, তাহলে এমন হতো না।'

তিন. ভারতের অধিবাসীদের হিন্দু সমাজে একীভূত হওয়া

আর্যরা ভারতের তাবৎ অঞ্চলের দখল নেওয়ার পর ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থাকে নিজেদের অনুকূলে সাজানোর কাজে হাত দেয়। তারা ভারতের পুরো জনগোষ্ঠীকে নিজেদের ধর্মবিশ্বাসের অনুসারী বানানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত থাকে।

১. নতুন সভ্যতার আগ্রাসন

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের পর ভারতবর্ষ গ্রিক, মিসরীয়, ব্যাবিলনীয় ও চীনা সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত হতে শুরু করে। ফলে এসব সভ্যতার সঙ্গে বৈদিক সভ্যতার চরম দ্বন্দ্ব শুরু হয়। আর্য পণ্ডিতগণ তখন দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন। তাদের একটি অংশ এই নতুন সভ্যতা বুঝে দেওয়ার প্রয়াস চালান; আর অন্য একটি অংশ এই নতুন দর্শনের আলোকে বেদীয় দর্শন নতুনভাবে সংস্কারের কাজে নিবিষ্ট হন। এভাবেই হিন্দুসভ্যতা গ্রিক-দর্শন ও যুক্তিবিদ্যার দিকে ঝুঁকে পড়ে। খ্রিস্টপূর্ব

[১] প্রাচ্যবিদ বোজের মতে, মূলগতভাবে সংস্কৃতভাষা ইউরোপের ভাষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

তৃতীয় শতক পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত থাকে। এ সময়েই হিন্দুধর্মের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ *উপনিষদ* ও *ভগবত গীতার* সংকলন হয়।

২. হিন্দুধর্মের প্রবর্তক

ইতিহাসে এমন একক কোনো ব্যক্তির নাম পাওয়া যায় না, যাকে হিন্দুধর্মের প্রবর্তক হিসেবে অভিহিত করা যায়। ভারতের অন্য বড় ধর্মগুলোর অবস্থা এর বিপরীত। আমরা জানি, গৌতম বুদ্ধ বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক। মহাবীর স্বামী প্রবর্তন করেন জৈন ধর্ম; আর শিখধর্ম আত্মপ্রকাশ করে গুরু নানকের হাত ধরে।

ড. রাধা কৃষ্ণ বলেন,[১] হিন্দুধর্মকে আলাদা কোনো গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যায় না; বরং এটি হিন্দুত্বের দর্শনকে সমৃদ্ধ করা বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতার সমষ্টির নাম।

৩. হিন্দু ধর্মবিশ্বাসের জটিলতা

পৃথিবীর আধুনিক ও প্রাচীন প্রতিটি জাতি ও ধর্মের মৌলিক কিছু বিশ্বাস ও দর্শন থাকে, যার ওপর সে ধর্মের অনুসারীরা বিশ্বাস স্থাপন করে। এর আলোকে তারা নিজেদের সমস্যাবলির সমাধান করে। নিজেদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের উৎকর্ষ সাধন করে। গবেষকগণ এসব মূলনীতি অধ্যয়নের মাধ্যমে কোনো সংগঠন বা ধর্মের বাস্তবতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারেন। কোনো সংগঠন বা ধর্ম যদি এমন মৌলিক নীতিমালা বা আকিদা সংরক্ষণ না করে, তাহলে এটিকে নিষ্প্রাণ দেহের সঙ্গে তুলনা করা যায়। এ দিক বিবেচনায় হিন্দুধর্মের ব্যাপারে বলা যায়, এই ধর্মের নিজস্ব কোনো মৌলিক নীতিমালা বা ধর্মবিশ্বাস নেই।

হিন্দু ধর্মবেত্তাগণও তাদের ধর্মের মৌলিক আকিদা না থাকার বিষয়টি অনুধাবন করেন। এমনকি তারা এ নিয়ে গর্ববোধও করেন। হিন্দু ধর্মগুরু গান্ধি বলেন, 'হিন্দুধর্মের মৌলিক আকিদা না থাকা এর মহান হওয়ার একটি প্রমাণ। যদি এ ব্যাপারে আমাকে প্রশ্ন করা হয়, আমি বলব—গোঁড়ামি থেকে মুক্ত হয়ে সত্যের অন্বেষণ করে বেড়ানোই এ ধর্মের মৌলিক নীতি। এ ক্ষেত্রে স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করা বা না-করা উভয়টিই সমান। কোনো হিন্দুধর্মাবলম্বীর জন্য স্রষ্টার অস্তিত্বে

[১] ড. রাধা কৃষ্ণ : অধুনাযুগের হিন্দু দার্শনিকদের অন্যতম। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চাশের দশকে ভারতের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ধর্ম ও দর্শন নিয়ে তাঁর দেড় শতাধিক গ্রন্থ রয়েছে। তিনি কার্ল মার্ক্সের কমিউনিজম মতবাদের কট্টর সমালোচক ছিলেন।

বিশ্বাস করা আবশ্যক নয়। কেউ এতে বিশ্বাস করুক বা না-করুক, সে হিন্দু হিসেবেই গণ্য হবে।'

তিনি তার *হিন্দুধর্ম* নামক গ্রন্থে বলেন, 'হিন্দুধর্মের বিশেষত্ব হচ্ছে, এটি কোনো বিশেষ ধর্মবিশ্বাস লালন করে না। তবে অন্যান্য ধর্মের বিশ্বাস ও মৌলিক ধারণাগুলো এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।'

এ কারণেই হিন্দু পণ্ডিতগণ সব নতুন বিষয়কে পবিত্র জ্ঞান করেন। একেই নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মনে করেন। তারা সব সাধককেই আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ—মানবরূপী স্রষ্টা বলে ধারণা করেন। এমনকি হিন্দুত্ব লালন করে কিছু বিশ্বাসে তাদের বিরোধিতা করলেও তাকে অবতার মনে করতে দ্বিধা করেন না—যতক্ষণ পর্যন্ত সে হিন্দুত্ব ত্যাগ করে নিজেকে মুসলমান বা খ্রিষ্টান বলে দাবি না করে। এর মূল কারণ এটাই যে, হিন্দুধর্মের অনুসারীদের ধর্মবিশ্বাসের আলাদা কোনো পরিমাপক নেই—যে হিন্দুধর্মের অনুসারী, সে চিরদিনের জন্যই হিন্দুত্বের ধারক বলে বিবেচিত হয়।

৪. 'হিন্দু' শব্দের উৎপত্তি

হিন্দুধর্মে মৌলিক ধর্মবিশ্বাসের অনুপস্থিতি ও বহুবিধ বিকৃতির ফলে এর মূল নামটিও হারাতে বসেছে। এর মূল অভিধা বৈদিকধর্ম বা আর্যধর্মের পরিবর্তে এটি হিন্দুধর্ম নাম ধারণ করেছে—সংস্কৃত ভাষায় যার কোনো অস্তিত্ব নেই। এ নামটি পরবর্তীদের আবিষ্কার। প্রাচীন গ্রন্থাবলিতেও এর অস্তিত্ব নেই। হিন্দুধর্মকে প্রাচীনকালে 'আর্যধর্ম' বা 'সনাতন ধর্ম' বলে অভিহিত করা হতো।

'হিন্দু' শব্দটি 'সিন্ধ' থেকে অস্তিত্ব লাভ করেছে। পারসিক ও গ্রিকরা যখন সিন্ধু অববাহিকায় যাতায়াত করত, তখন তারা সিন্ধকে 'হিন্দ' উচ্চারণ করত; আর 'ইস্থান' (স্থান) শব্দটির উচ্চারণ তাদের জন্য কঠিন হওয়ায় তারা একে সহজ করে 'স্তান' উচ্চারণ করত। এভাবেই 'হিন্দুস্থান' শব্দটি উৎপত্তি লাভ করে; যার অর্থ, সিন্ধের অধিবাসীদের নিবাস। তারা এই অঞ্চলের অধিবাসীদের 'হিন্দু' নামে সম্বোধন করত। এদের ধর্মবিশ্বাসকে 'হিন্দুকিয়া' বা 'হিন্দুধর্ম' এবং এর অনুসারীদের 'হিন্দুসি' বা 'হিন্দুকি' নামে অভিহিত করত। 'হিন্দুস' বা 'হিন্দু বলতে' সামগ্রিকভাবে একটি গোত্রকে বোঝানো হয়।

তবে ইংরেজরা হিন্দকে পরিবর্তন করে ইন্ড (IND) উচ্চারণ করে; আর এর শেষে সম্বন্ধসূচক (IA) যোগ করে। ফলে INDIA শব্দের উদ্ভব ঘটে।

৫. হিন্দুধর্মের গ্রন্থসমূহের সংকলনের যুগ

আর্যরা ভারতে আসার পর স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে জড়িয়ে পড়ে। তখন তাদের পণ্ডিত ও বিদ্বান ব্যক্তিরা বিভিন্ন গ্রন্থ সংকলন ও রচনার কাজে মনোনিবেশ করেন। দীর্ঘ ১ হাজার বছর ধরে হিন্দুধর্মের মৌলিক রচনাবলির সংকলনের ধারা অব্যাহত থাকে।

এই সময়ের সংকলনগুলোর শ্রেণিবিন্যাস ছিল নিম্নরূপ

প্রথম যুগ : প্রাথমিক পর্যায়ে তৎকালীন বিদ্বান ব্যক্তিরা চারটি *বেদের** রচনার কাজ সম্পন্ন করেন। 'বেদ' শব্দটি সংস্কৃত শব্দ, যার অর্থ জ্ঞান ও বিদ্যা।

দ্বিতীয় যুগ : হিন্দু দার্শনিকদের যুগ। এ সময়ে হিন্দু দার্শনিকদের একটি দল *উপনিষদ* রচনায় নিবিষ্ট হন। এটি মূলত *বেদের* দর্শনসমূহের সংকলন ছিল। *উপনিষদ* গ্রন্থগুলোতে তাসাওউফ তথা সুফিবাদের প্রাথমিক ধারণাগুলো সন্নিবেশিত করা হয়।

প্রফেসর রয়েস (Royec) বলেন, 'সুফিবাদের যাবতীয় বিধান এসব গ্রন্থে সংকলন করা হয়।' একইভাবে *উপনিষদ* গ্রন্থাবলিতে আর্যসভ্যতা ও সাহিত্যের ওপরও আলোকপাত করা হয়েছিল।

তৃতীয় যুগ : হিন্দু ধর্মবেত্তাদের যুগ, যারা হিন্দুধর্মীয় রীতিনীতির সংকলন প্রস্তুত করেছেন। সেখানে তারা হিন্দু ধর্মমতে পবিত্রতা, ইবাদত তথা উপাসনা, লেনদেন, সম্পর্ক, বৈবাহিক বন্ধন, বিচ্ছেদসহ অন্যান্য নীতির সংকলন করেছেন।

এই ধর্মবেত্তাগণ এসব সংকলনের ক্ষেত্রে তাদের সাধু, তাপস ও পণ্ডিতদের উদ্ধৃতিসমূহের ওপর নির্ভর করেন। এদের এই প্রয়াসের ফলে *স্মৃতি* নামক গ্রন্থগুলো আলোর মুখ দেখে এবং এর সংখ্যা ৫০ অতিক্রম করে। এসবের মধ্যে *মনুস্মৃতি* সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চতুর্থ যুগ : ভারতবর্ষের অধিবাসীদের সঙ্গে আর্যদের সংমিশ্রণের ফলে আর্যদেবতারা বিস্মৃত হয়ে যেতে থাকে। আর্যরা ইন্দ্রকে বজ্রের দেবতা, অগ্নিকে আগুনের দেবতা, অরুণাকে আকাশের দেবতা ও উষাকে সকালের দেবতা হিসেবে উপাসনা করত। পরে এসবের স্থান দখল করে বিষ্ণু প্রতিপালনের দেবতা ও শিব ধ্বংসের দেবতা। এরপরই এসব নতুন দেব-দেবতার গুণকীর্তন করে বিভিন্ন

* চারটি বেদ হলো : ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ। প্রত্যেকটির আলাদা বিবরণ সামনে তুলে ধরা হবে।

রচনা সংকলনের ধারা চালু হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে *পুরাণ* গ্রন্থাবলি সংকলিত হয়। 'পুরাণ' শব্দের অর্থ, প্রাচীন ঘটনাবলি ও রূপকথা। গ্রন্থটির বিভিন্ন জায়গায় সৃষ্টির উপাখ্যান, পুনরুত্থান ও দুই মনুর মধ্যকার কাল তথা সৃষ্টিজগতের দুই ধ্বংসের মধ্যবর্তী সময়ের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। হিন্দু বিশ্বাসমতে, এই মহাবিশ্ব অবিনশ্বর। অসংখ্যবার এর বিনাশ হয়ে আবার তা নতুনভাবে সৃষ্টি হয়।

পঞ্চম যুগ : যুদ্ধবিগ্রহের বিবরণ-সংবলিত গ্রন্থাবলির সংকলন। এসব গ্রন্থে আর্য নেতাদের যুদ্ধবিগ্রহের আলোচনা এবং যুদ্ধে তাদের অর্জিত বিজয়গাথার বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। এগুলো মহাভারত, *গীতা* ও *রামায়ণ* নামে পরিচিতি পেয়েছে। কালপরিক্রমায় এসব গ্রন্থ হিন্দুদের কাছে গুরুত্ব অর্জন করে জাতীয় গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়।

পরবর্তী অধ্যায়ে এসব গ্রন্থ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ।

চার. হিন্দুদের মৌলিক উৎসগ্রন্থসমূহের ব্যাপারে সমীক্ষা

হিন্দুরা যেহেতু মৌলিক কোনো ধর্মবিশ্বাস লালন করে না, তাই তাদের জন্য আল্লাহর ওপর বিশ্বাসের সঙ্গে আল্লাহ ব্যতীত অন্য বহু প্রাকৃতিক শক্তিকে স্রষ্টা হিসেবে গ্রহণ করার পথে বাধা নেই। আর এ কারণেই তাদের উৎসগ্রন্থের ব্যাপারে তাদের ভিন্ন ভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। তাদের প্রত্যেক গোষ্ঠীরই আলাদা আলাদা মৌলিক ধর্মগ্রন্থ রয়েছে। যদিও সর্বজনীনভাবে তারা নিজেদের ধর্মগ্রন্থগুলোকে সম্মানের চোখে দেখে। এ জন্য এখানে তাদের বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের মৌলিক উৎসগ্রন্থ চিহ্নিত করব না। কেননা, যেসব গ্রন্থে তাদের কোনো দেব-দেবতার গুণকীর্তন বা ঈশ্বরের নৈবেদ্য করার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, সেসব গ্রন্থকে তারা সম্মান ও মর্যাদার চোখে দেখে। ধর্মীয় গ্রন্থাবলির সংকলনের যুগে যেসব গ্রন্থ রচিত হয়েছিল, এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইতিপূর্বে তুলে ধরেছি। নিচে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরা হলো।

১. বেদ (Veda)

'বেদ' অর্থ জ্ঞান। অতীতে সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, *উপনিষদ*সহ হিন্দুধর্মের সব ধর্মগ্রন্থকেই *বেদ* নামে অভিহিত করা হতো। পরবর্তীকালে চারটি গ্রন্থকে *বেদ* নামে নির্দিষ্ট করা হয়। এগুলো হচ্ছে : *ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ* ও *অথর্ববেদ*।

বেদ হিন্দুদের পবিত্র মহাগ্রন্থসমূহের অন্যতম ও বহুল পরিচিত। *বেদ* আলাদাভাবে অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে সাজানো কোনো একক গ্রন্থ নয়। এটি মূলত খ্রিষ্টপূর্ব অন্ধকার যুগের সাধু ও সন্ন্যাসীদের দীক্ষাসমূহের সংকলন। বেদ শব্দটি সংস্কৃত 'ওয়েদ' শব্দ (বেদ) থেকে নির্গত হয়েছে। এর অর্থ জ্ঞান। হিন্দু পন্ডিতগণ তাদের বিক্ষিপ্ত এসব দীক্ষা ও ধর্মবাণীসমূহ একত্রিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। শিক্ষার্থীদের এসব শেখাতে এবং পাথর বা চামড়ার পাতে তারা এগুলো সংরক্ষণ করতেন। যারা এসব মুখস্থ করত, তাদের 'শাস্ত্রী' নামে অভিহিত করা হতো।

হিন্দুরা দাবি করে পৃথিবী যেমন অবিনশ্বর, *বেদ*ও তেমনি অবিনশ্বর। মনু নামের এক ব্যক্তি এর সংকলন করেছেন।

হিন্দু ধর্মবেত্তা বিহারি লাল ভর্মা বলেন, '*বেদ* কোনো একক ধর্মগ্রন্থ নয়। এটি বহু হিন্দুধর্মীয় বিদ্বান ব্যক্তির দর্শনের সমাহার। 'ওয়েদ' শব্দের অর্থ জ্ঞানার্জন। অর্থাৎ, *বেদ* গ্রন্থসমূহে আধ্যাত্মিক বিভিন্ন জ্ঞানের সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছে। সেখানে ধর্মীয় বিভিন্ন শ্লোক ও মন্ত্রসমূহের সংকলনও করা হয়েছে।'

আরেক হিন্দু ধর্মবেত্তা পন্ডিত শ্রীরাম শর্মা *ঋগ্‌বেদের* ব্যাখ্যাগ্রন্থের ভূমিকায় বলেন, 'গ্রন্থটি ৩০০ জন সাধুর দর্শনের সমাহার।'

আবার গঠনগতভাবে *বেদ* দুভাগে বিভক্ত :

১. সংহিতা তথা মূল ভাষ্য।

২. ব্রাহ্মণ তথা ব্যাখ্যা।

হিন্দু ধর্মবিশারদ স্বামী দয়ানন্দ মনে করেন, 'এর প্রথম প্রকার ঐশী ও দ্বিতীয়টি ঐশী নয়।' আবার কেউ কেউ এখানে তৃতীয় একটি বিভক্তি বের করেন, যা 'আরণ্যক' নামে পরিচিত। এতে বনবাসী তপস্বীদের ঘটনাবলির আলোচনা করা হয়েছে।

আর এই তৃতীয় অংশের চয়িতাংশের মাধ্যমে সংকলিত পবিত্র গ্রন্থসমূহকে *উপনিষদ* নামে অভিহিত করা হয়। *উপনিষদের* সংখ্যা ১০৮টি। অবশ্য পন্ডিত শংকরাচার্যের[১০] বিবরণমতে, হিন্দুদের কাছে এর ১৬টি বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য।

[১০] শংকরাচার্য ১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে মালিবার অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাত্র আট বছর বয়সে সাধনার পাঠ নিতে শুরু করেন। ৩২ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে তিনি ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ নেতা। তিনিই প্রথম সর্বেশ্বরবাদের মতবাদের প্রতি আহ্বান করেন ও *বেদ* গ্রন্থসমূহ থেকে এর পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করেন। তিনি তার মতবাদের প্রসারের লক্ষ্যে ভারতব্যাপী 'মঠ' নামে বিশেষ শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিটি মঠে শংকরাচার্য উপাধি দিয়ে একজন সাধুকে নিয়োগ দেওয়া হতো। এটি ছিল হিন্দু সাধুদের সর্বোচ্চ উপাধি।

অবাক করার মতো ব্যাপার হচ্ছে, কিন্তু 'আরণ্যক' গৌতম বুদ্ধেরও বহু কাল পরে সংকলন করা হয়েছে। *আল-হাজারাতুল হিনদিয়া (ভারতীয় সভ্যতা)* গ্রন্থে এমনটিই দাবি করেছেন হিন্দু পণ্ডিত ধর্মানন্দ। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয়, হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থাবলির ইতিহাস অনেকটাই অন্ধকারাচ্ছন্ন।

যাইহোক, *বেদ* মূলত চারটি *বেদ* গ্রন্থের সম্মিলিত রূপ :

১. **ঋগ্‌বেদ (Rigveda) :** অর্থ গুণকীর্তন ও প্রার্থনা। কথিত আছে, এটিই সবচেয়ে প্রাচীন ও ব্যাপক মৌলিক গ্রন্থ। হিন্দু ধর্মবেত্তাদের মতে, এটি পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন সংকলন। কিন্তু তারা এর সংকলনের সুনির্দিষ্ট কোনো সময়ের ধারণা দিতে পারেন না। পশ্চিমা গবেষকদের মতে, খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ থেকে ১ হাজার সালের মধ্যে এটির সংকলন করা হয়েছে।

পশ্চিমা গবেষক মন্ত্রতান বলেন, 'এটি খ্রিস্টপূর্ব আড়াই হাজার সালে সংকলন করা হয়েছে।' এই মতটি হিন্দু পণ্ডিতদের অভিমতের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ।

তবে এর দ্বারা তাদের এই দাবির অসারতাও প্রমাণিত হয় যে, '*বেদ* পৃথিবীর মতোই আদি ও অবিনশ্বর'।

গ্রন্থটি ১০টি মণ্ডলে (অংশ) বিভক্ত, যা ৬৪টি অধ্যায় ও ১০১৮টি বৈদিক সূত্রের (শিরোনাম) সমন্বয়। *ঋগ্‌বেদে* মোট ১০,৫৫২টি ঋক বা মন্ত্র আছে। *ঋগ্‌বেদে* যেসব দেব-দেবতার আলোচনা এসেছে, এর মধ্যে আগুনের দেবতা অগ্নি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেননা, *বেদের* সংকলক 'বেদব্যাস' ছিলেন পারসিক ধর্মপ্রচারক জরথুস্ত্রের সামসময়িক। জরথুস্ত্র মানুষকে অগ্নিপূজার দিকে আহ্বান করত।

বেদব্যাস এই নতুন ধর্মপ্রচারকের সঙ্গে বিতর্কের মানসে পারস্যে গমন করেন। সেখানে তিনি নিজেই তার মতবাদে প্রভাবিত হয়ে পড়েন। তিনি জরথুস্ত্রের মতবাদে প্রভাবিত হয়ে ভারতে ফেরেন এবং জরথুস্ত্রের বহু দর্শন *বেদে* অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

ঋগ্‌বেদের ব্যাখ্যাকার পণ্ডিত শ্রী রাম শর্মা তার ব্যাখ্যাগ্রন্থের ভূমিকায় *ঋগ্‌বেদে* উল্লিখিত দেব-দেবীর একটি তালিকা উপস্থাপন করেন। এই তালিকায় দেব-দেবীর সংখ্যা দেড়শ ছাড়িয়েছিল, যার মধ্যে অন্যতম ছিল :

- **অগ্নি :** আগুনের দেবতা।
- **বায়ু :** বাতাসের দেবতা।
- **ইন্দ্র :** বজ্রের দেবতা।

- **অরুণা :** আকাশের দেবতা।
- **সূর্যা :** সূর্যের দেবতা।
- **উষা :** সকালের দেবতা।
- **জ্ঞান :** বিদ্যার দেবতা।
- **কাম :** কামনার দেবতা।

এর পরিপ্রেক্ষিতে কোনো কোনো গবেষক মন্তব্য করেন, হিন্দুরা প্রাকৃতিক বিভিন্ন শক্তিকে স্রষ্টা হিসেবে গ্রহণ করে। একইভাবে তারা বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য আলাদা আলাদা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে; আর এসব দেবতাদের তারা আল্লাহর আস্থাভাজন ও নৈকট্যপ্রাপ্ত মনে করে। ইসলামপূর্ব জাহিলিয়াতের মানুষদের বিশ্বাসও এমন ছিল।

এই হলো হিন্দুদের মূল ধর্মগ্রন্থ *ঋগ্‌বেদের* বিবরণ। হিন্দুরা এই গ্রন্থকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখে। তারা এর শ্লোক আবৃত্তি করে। নিজেদের সকাল-সন্ধ্যার উপাসনা ও বিয়ে ইত্যাদিতে এর মন্ত্র পাঠ করে। মৃতদেহ অগ্নিদাহের সময়ও এর শ্লোক পাঠ করে।

২. **যজুর্বেদ (Yajurveda) :** গ্রন্থটিতে পুরোহিতদের আহুতি দেওয়া ও তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটির পরিধি *ঋগ্‌বেদের* দুই তৃতীয়াংশের সমান। এটি গদ্যাকারে সংকলিত। এতে হিন্দু দেব-দেবতাদের নৈবেদ্যের পদ্ধতি তুলে ধরা হয়েছে। অবশ্য অনেক হিন্দু পণ্ডিত যজুর্বেদকে তাদের পবিত্র *বেদসমূহের* অন্তর্ভুক্ত করতে নারাজ।

৩. **সামবেদ (Samaveda) :** এর অর্থ প্রশান্তি ও নিরাপত্তা। গ্রন্থটিতে ১,৮১০ বা ১,৮১৫টি শ্লোক রয়েছে। তন্মধ্যে ৭৫টি শ্লোক ছাড়া বাকিগুলো *ঋগ্‌বেদে* সন্নিবেশিত রয়েছে। হিন্দুরা নিজেদের উপাসনা ও প্রার্থনার সময় এসব মন্ত্র আবৃত্তি করে থাকে। হিন্দি সংগীতের সাত স্বরের উদ্ভবও এই গ্রন্থ থেকে হয়েছে।

কোনো কোনো হিন্দু ধর্মবেত্তা মনে করেন, হিন্দি সংগীত ও মন্ত্রের ক্ষেত্রে *সামবেদের* মর্যাদা কোনো অংশেই *ঋগ্‌বেদের* চেয়ে কম নয়।

৪. **অথর্ববেদ (Atharvaveda) :** *অথর্ববেদ* হলো জাদুকরি মন্ত্র। এ গ্রন্থটি একগুচ্ছ শ্লোকের মাধ্যমে সংকলন করা হয়েছে। এর উনবিংশ ও বিংশ অধ্যায় *ঋগ্‌বেদ* থেকে নেওয়া হয়েছে। এই গ্রন্থে ভূত-প্রেত ও শয়তানদের বিদূরিত করার বিভিন্ন মন্ত্র ও শ্লোক উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি হিংস্র

প্রাণী থেকে বেঁচে থাকা এবং শান্তি, নিরাপত্তা ও প্রবৃদ্ধির মন্ত্রসমূহও উল্লেখ করা হয়েছে।

*বেদ*সমূহের ব্যাখ্যার দিক

*বেদ*সমূহের ব্যাখ্যাকারগণ ভিন্ন ভিন্ন তিনটি পন্থা অবলম্বন করেছিলেন :

১. **সিতারাম সায়ানের ব্যাখ্যা।** তিনি এমন প্রাচীন ব্যাখ্যাকারদের অন্তর্ভুক্ত, যারা তখনকার ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী চার *বেদের* ব্যাখ্যা করেছিলেন। একইভাবে তিনি *মহাভারতের* ঐতিহাসিক প্রমাণাদির মাধ্যমে *বেদের* ব্যাখ্যা করেন। হিন্দু ধর্মবেত্তারা তাকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখেন। তারা তাকে *বেদ*সমূহের মর্ম অনুধাবনকারী সেরা বিদ্বান হিসেবে জ্ঞান করেন। তারা বলেন, সিতারাম সায়ান না থাকলে আমরা *বেদের* গুপ্তরহস্য অনুধাবন করতে সক্ষম হতাম না।

ম্যাক্স মুলার (Max Muller) বলেন, 'যদি সিতারাম সায়ান আমাদের পথ সুগম না করতেন, তাহলে আমরা এই দুর্ভেদ্য দুর্গে প্রবেশ করতে পারতাম না।'

২. **ম্যাক্স মুলারের ব্যাখ্যা।** হিন্দুদের মধ্যে এই ইউরোপিয়ান পণ্ডিতের বেশ প্রভাব রয়েছে। কেননা, তিনিই প্রথমবারের মতো পশ্চিমাদের ধাঁচে *বেদ*সমূহের ব্যাখ্যায় হাত দেন এবং ইউরোপ-আমেরিকায় *বেদের* শিক্ষা প্রচারে ভূমিকা রাখেন। হিন্দুরা তাকে মুকেশ মুলার (চিত্তের অস্থিরতা থেকে মুক্তিদানকারী) উপাধিতে ভূষিত করে।

৩. **দয়ানন্দের ব্যাখ্যা।** তিনি একজন প্রসিদ্ধ হিন্দুধর্মবিশারদ, যিনি উনবিংশ শতকে ভারতে আর্যসভ্যতার পুনর্জাগরণের প্রতি আহ্বান করেছিলেন। প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা ধর্মরীতির বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদমুখর হয়েছিলেন। একইভাবে *বেদে* বর্ণিত ঐতিহাসিক তথ্যসমূহও তিনি অস্বীকার করেছেন। এভাবে তিনি সম্পূর্ণ নতুন একটি ধারার সূচনা করেন। তিনি স্রষ্টার একত্ববাদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক *বেদ* গ্রন্থসমূহে বহুল আলোচিত দেব-দেবীর আলোচনার ব্যাখ্যা করতেন। তার মতে, 'এসব স্রষ্টার একত্ববাদের পক্ষে তার কুদরতের প্রমাণ মাত্র।' তিনি আরও মনে করতেন, 'এসব তাঁর শক্তির অংশ। তাঁর অস্তিত্ব ছাড়া এসবের আলাদা কোনো অস্তিত্ব নেই।' তিনি *বেদ* গ্রন্থসমূহের ব্যাখ্যায় বহু রূপক ও সাদৃশ্যমূলক ব্যাখ্যার আশ্রয় নেন।

বর্তমানের হিন্দুসমাজে এই সাধকের বেশ প্রভাব রয়েছে। তাই এখানে একনজরে তার জীবনী নিয়ে আলোচনা করা সমীচীন মনে করছি।

দয়ানন্দ : (১৮২৪-১৮৮৩) তিনি 'আর্যসমাজ' নামক সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের মুম্বাইতে প্রতিষ্ঠিত একটি কট্টরপন্থি হিন্দু সংগঠন, যেটি *বেদ* ও তার ব্যাখ্যার আলোকে হিন্দুত্ববাদের পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

এই আর্যসমাজের একটি জঘন্যতম প্রকল্প ছিল—'শুদ্ধি' তথা পরিচ্ছন্নকরণ। এর মাধ্যমে তারা মুসলমানদের পুনরায় হিন্দুত্ববাদে দীক্ষা দেওয়ার প্রয়াস চালিয়েছিল। তারা ভাবত, হিন্দুধর্ম ছেড়ে ইসলাম বা খ্রিষ্টবাদ গ্রহণ করে তারা অপবিত্র হয়েছে, তাই তাদের পবিত্রীকরণ আবশ্যক।

ভারতের জমিয়তে আহলে হাদিসের সভাপতি প্রখ্যাত মুনাজির ও মুজাহিদ শায়খ সানাউল্লাহ অমৃতসরীর নেতৃত্বে মুসলমানগণ শক্তহাতে তাদের এই প্রকল্প রুখে দেন। এই মহান মনীষী আল্লাহপ্রদত্ত মেধা ও যোগ্যতার বলে মুসলমানদের নিজেদের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি আস্থাশীল করে তুলতে সক্ষম হন।

যদিও মুসলমানরা আর্যসমাজের ভয়াবহ পরিকল্পনা রুখে দিতে সক্ষম হয়েছিল; কিন্তু তারা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রয়াস থেকে বিচ্যুত হয়নি।

দয়ানন্দ প্রণীত *সত্যার্থ প্রকাশ* এই সমাজের মৌলিক গ্রন্থ। লেখক তার এই গ্রন্থে পরিচিত সব ধর্মের অসারতা প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। তিনি এই গ্রন্থে ১৪টি অধ্যায় রেখেছেন, যার ১৪ তম অধ্যায় শুধু ইসলামের বিরুদ্ধে লেখা হয়েছে। ভারতের জমিয়তে আহলে হাদিসের সভাপতি শায়খ সানাউল্লাহ অমৃতসরী এই গ্রন্থের জবাবে *হক প্রকাশ* রচনা করেন। অন্যদিকে শায়খ ইমামুদ্দিন রামনগরী এর মোকাবিলায় রচনা করেন, *দালায়িলুল কুরআন ফি ইফতিরায়ি দয়ানন্দ ওয়াল বুহতান।*

সত্যার্থ প্রকাশ গ্রন্থটি ভারত ও ইউরোপের ১০টিরও বেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে আর্যসমাজ এই গ্রন্থ সংকলনের শতবর্ষ উদযাপন করে। আহ! গ্রন্থটি সাধারণ মানুষকে কত ভাবেই-না বিভ্রান্ত করেছে।

আমরা এই সাধু দয়ানন্দ ও আর্যসমাজের কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই, তাদের *বেদের* বিশ্বাস কোথায়, যেখানে *বেদ* প্রাণী কুরবানির নির্দেশ দেয়; অথচ তারা একে পাপ মনে করে? দেব-দেবীর জন্য মন্দির তৈরির নির্দেশ দেয়; অথচ তারা একে পাপ মনে করে? *বেদ* বহু দেবতার উপাসনার প্রতি আহ্বান করে; আর তারা শুধু ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করে?

ঋগ্‌বেদে আছে, 'হে ইন্দ্র (বজ্রের দেবতা), বিষ্ণু (প্রতিপালনের দেবতা) তোমার জন্য মহিষের মাংসের আহার প্রস্তুত করেছে।'[১১]

অন্যত্র বলা হয়েছে, 'তারা গরু রন্ধন করে; আর তুমি তা আহার করো।'[১২]

অন্যত্র বলা হয়েছে, 'ইন্দ্রপূজারিদের জন্য স্বাস্থ্যবান গরু রান্না করো।'[১৩]

অন্যত্র বলা হয়েছে, ইন্দ্র বলেন, 'আমার জন্য ১৫টি বলদ রান্না করো, আমি তা খেয়ে স্বাস্থ্যবান হব।'[১৪]

আবার *যজুর্বেদের* ২২ তম অধ্যায় থেকে ২৫ তম অধ্যায় পর্যন্ত প্রাণী কুরবানির বহুবিধ আলোচনা এসেছে।

একইভাবে আর্যসমাজের অনুসারীরা এক ঈশ্বরের উপাসনাকে যথেষ্ট জ্ঞান করে; অথচ *বেদ* গ্রন্থসমূহে ইন্দ্র, অগ্নি, সোম, বরুন, রজাবতি, বিষ্ণু ও ভীমের মতো বহু দেব-দেবতার উপাসনার প্রতি আহ্বান করা হয়েছে। অবশ্য দয়ানন্দ এর প্রকাশ্য ও গোপন দু-ধরনের মর্ম ব্যাখ্যা করেছেন; কিন্তু অধিকাংশ হিন্দু তার এসব ব্যাখ্যা গ্রহণ করে না।

২. উপনিষদ (Upnishad)

এর অর্থ জ্ঞানার্জনের জন্য পণ্ডিতের সান্নিধ্য লাভ করা। এটি বস্তুত *বেদের* ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থসমূহের সংকলন, যাতে হিন্দু বৈরাগ্য গ্রহণকারী সাধু ও তাপসদের জ্ঞান এবং প্রজ্ঞাসমূহের সন্নিবেশ করা হয়েছে; যারা মহাবিশ্বের রহস্য উদ্‌ঘাটন ও দেহজগতের সমাপ্তির পর স্থায়ী শান্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মৃত্যুর বাস্তবতাকে অনুধাবনের জন্য পাহাড়, জঙ্গল ও গুহার অভ্যন্তরে সাধনায় থাকত।

এসব গ্রন্থের সরলতা ও অকৃত্রিমতা সমানভাবে হিন্দু ও ইউরোপিয়ানদের মুগ্ধ করেছিল। ফলে হিন্দু সুফিবাদ ও ইউরোপিয়ান বৈরাগ্যবাদ এসব গ্রন্থ দ্বারা বেশ প্রভাবিত হয়েছিল; কিন্তু এসব গ্রন্থের প্রকৃত অবস্থা সর্বদাই রহস্যঘেরা ও ঐতিহাসিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। কখনো এর রচয়িতা বা রচনাকাল সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়নি। এমনকি এটাও কথিত আছে যে, এসব গ্রন্থের একটির নাম ছিল *আল্লাহ উপনিষদ*, যেখানে ইসলামে স্রষ্টার ধারণা নিয়ে আলোচনা করা

[১১] ঋগ্‌বেদ: ৬/১১/১৭।

[১২] প্রাগুক্ত : ১০/২৮/৩০।

[১৩] প্রাগুক্ত : ১০/২৭/৩০।

[১৪] প্রাগুক্ত : ১০/৮৬/১৪।

হয়েছে। সেটি ভারতের বিখ্যাত সম্রাট জালালুদ্দিন আকবরের শাসনামলে রচনা করা হয়েছিল।

এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এসব গ্রন্থের রচনা আর্য আমলে শুরু হয়েছিল, যা মোগল শাসনামল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। একটি গ্রন্থের আর কীই-বা প্রবিত্রতা থাকতে পারে, যা ২ হাজার বছর ধরে সংকলনের ধাপ অতিক্রম করেছে।

আমরা যেহেতু আগেই দেখেছি, হিন্দুদের মৌলিক কোনো ধর্মবিশ্বাস না থাকায় তারা তাদের ধর্মের কথা বলে বা তাদের সাধু-পণ্ডিতদের অভিজ্ঞতালব্ধ সবকিছু অত্যন্ত পবিত্র বলে বিবেচনা করে। এসব গ্রন্থকে ইবনুল আরাবি প্রণীত *আল-ফুতুহাতুল মাক্কিয়া* বা *ফুসুসুল হিকামের* সঙ্গে তুলনা করলে খুব একটা বাড়াবাড়ি হবে না।

উপনিষদের সংখ্যা : মাদরাজের আদ্যার পাঠাগারের তালিকার হিসাব অনুযায়ী *উপনিষদ* গ্রন্থাবলির সংখ্যা প্রায় ১০৮টি। এই পাঠাগার *উপনিষদ* নামে আরও ৭১টি গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। এর মাধ্যমে *উপনিষদ* গ্রন্থের সংখ্যা হয় ১৭৯টি। একইভাবে বেরেলি[১৫] শহর থেকে পণ্ডিত শ্রী রাম শর্মার টীকাসহ *উপনিষদের* ১০৮টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি এসব গ্রন্থকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন :

১. জ্ঞানখণ্ড তথা জ্ঞানের অধ্যায়।
২. ব্রহ্মা বিদ্যাখণ্ড তথা ব্রহ্মার বিদ্যার অধ্যায়।
৩. সাধনাখণ্ড তথা পূজার জ্ঞানের অধ্যায়।

অবশ্য *উপনিষদের* মধ্যে ১২টি গ্রন্থ সমধিক পরিচিত :

১. ইশওয়াশিয়া (Ishvasya)
২. কেন (Ken)
৩. কঠ (Kath)
৪. প্রশ্ন (Prashana)
৫. মুন্ডক (Mundukya)
৬. মান্ডূক্য (Mandukya)
৭. ঐতরেয় (Etrey)
৮. তৈত্তরিয় (Teterey)

[১৫] ভারতের উত্তর প্রদেশের একটি শহর। —অনুবাদক।

৯. ছান্দোগ্য (Chandocya)

১০. বৃহদারণ্যক (Brihdaryak)

১১. কৌষিতকি (Koshtaki)

১২. শ্বেতাশ্বেতর (Shwetashwater)

পণ্ডিত শংকরাচার্য, রামানুজ, নিম্বার্ক, মাদয়া ও বালাব নিজেদের দর্শন ও মূলনীতি অনুযায়ী এসব উপনিষদের ব্যাখ্যা করেন।

ভারতীয় দার্শনিক ড. রাধা কৃষ্ণ মনে করেন, *উপনিষদসমূহের* রচনা শুরু হয় খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে। এসব গ্রন্থের রচনাকালের মধ্যে বিশাল ব্যবধান রয়েছে। প্রাচীন *উপনিষদসমূহে* সৃষ্টিরহস্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াস চালানো হয়েছিল। অন্যদিকে পরবর্তীকালের *উপনিষদসমূহে* ব্রহ্মার উপাসনা ও ধর্মীয় বিধান ইত্যাদি পালনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এসব *উপনিষদের* একটি হচ্ছে 'প্রশ্ন'। এতে ইসলামি যুগের হুসাইন ইবনু মানসুর হাল্লাজের[১৬] 'আনাল হক' (আমিই স্রষ্টা) ঘোষণার বাস্তবতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যাঁকে ৩১০ হিজরিতে বাগদাদে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। তিনি ভারতবর্ষে এসেছিলেন এবং পূজা, তন্ত্র-মন্ত্রসহ হিন্দুশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন।[১৭] এরপর তিনি বাগদাদে ফিরে যান এবং সেখানে 'আনাল হক' মতবাদ প্রচার করতে শুরু করেন।

ইবনু হাওকাল তাঁর সফরনামায় লেখেন, 'হাল্লাজের আবির্ভাব ঘটে পারস্যে, যিনি সুফিবাদ ও সাধনার দাবি করতেন। তিনি সাধনায় উৎকর্ষ লাভ করতে থাকেন। একপর্যায়ে তিনি মনে করেন, যে ব্যক্তি তার দেহকে সাধনায় প্রবৃত্ত করবে, আত্মাকে তপস্যায় লিপ্ত করবে, মনস্কামনা ও প্রবৃত্তির তাড়না থেকে ধৈর্য অবলম্বন করবে, সে পূর্ণ নৈবেদ্যের মর্যাদা লাভ করবে। সে মানবিক গুণাবলির ঊর্ধ্বে অবস্থান করবে; আর তখনই তার মধ্যে স্রষ্টার আত্মা প্রবেশ করবে, যেমনটি ইসা আ.-এর ক্ষেত্রে হয়েছিল। সে তখন হয়ে উঠবে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। সে যখন বলবে 'কুন' (হয়ে যাও), তখন তা হয়ে যাবে।'[১৮]

---

[১৬] মানসুর হাল্লাজ। পুরো নাম আবু আবদিল্লাহ হুসাইন ইবনু মানসুর আল হাল্লাজ। জন্ম : ২২৪—মৃত্যু : ৩০৯ হিজরি। তবে 'আনাল হক' নামেই তিনি বিশেষভাবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। ইতিহাসের আলোচিত একজন সুফিসাধক। তাঁর কথাবার্তা ও ধ্যান-সাধনা নিয়ে আলিমগণের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। কেউ বলেন দরবেশ, কেউ কাফির। তবে হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলি থানবির কল্যাণে উপমহাদেশের ধর্মপ্রাণ সাধারণ মুসলিমদের কাছে তিনি দরবেশ হিসেবেই প্রসিদ্ধ। নিজেকে 'আনাল হক' বলার কারণে ৩০৯ হিজরির ৯ জিলকদ তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। —*সম্পাদক*

[১৭] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১৪/৩১৮-৩১৯।

[১৮] প্রাগুক্ত : ১৪/৩৪৭।

অন্যদিকে ভারতের সাধক সারমাদ কাশানি ছিল একজন ইয়াহুদি ধর্মাবলম্বী, যে ইসলাম গ্রহণের দাবি করে। সে তার আদি নিবাস তুর্কিস্তান থেকে ভারতে এসেছিল। এখানে সে মুসলমানদের মধ্যে ইয়াহুদি ও হিন্দু-দর্শন প্রচার করত। সে নগ্ন অবস্থায় চলাফেরা করত ও সম্মোহনের দাবি করত। এমনকি মুখে কুফরি কথাও উচ্চারণ করত। তৎকালীন আলিমগণ তার ব্যাপারে সম্রাট আলমগিরের কাছে অভিযোগ করেন এবং তাকে এই সাধুর ভয়াবহ কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে সচেতন করেন। পরে তার ব্যাপারে মৃত্যুদণ্ডের ফাতওয়া দেওয়া হলে তা কার্যকর করা হয়।

মানসুর হাল্লাজ ও সারমাদ সাধনার যেসব স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন এবং ওয়াহদাতুল উজুদের[১৯] বিশ্বাস লালন করতেন, সেই একই দর্শন হিন্দুদের 'ওঁ' শব্দের ব্যাখ্যায়ও পাওয়া যায়।

কথিত আছে, তাদের ছয়জন সাধক নিজেদের গুরু পিপ্পালাদার (Pippalada) দরবারে গমন করে। তারা প্রত্যেকেই গুরুর সকাশে নিজেদের প্রশ্ন উত্থাপন করে। পঞ্চমজনের প্রশ্ন ছিল, 'একজন মানুষ যদি তার সারাটি জীবন স্রষ্টার উপাসনায় কাটিয়ে দেয়, তাহলে তার শেষ পরিণতি কী হবে?' উত্তরে গুরু বলেন, 'ওঁ' [সংস্কৃত, অ + উ + ম্]। শব্দটি তিনটি অক্ষর দ্বারা গঠিত। প্রথম অক্ষরে তোমার সামনে মানবজগতের রহস্য উন্মোচিত হবে। দ্বিতীয় অক্ষরে ঊর্ধ্বজগৎ ও শেষ অক্ষরে ব্রহ্মজগতের রহস্য উন্মেচিত হবে। তাই যে ব্যক্তি সাধনার সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করবে, তার সামনে 'ওঁ'-এর পূর্ণ বাস্তবতা ফুটে উঠবে। সে অবিনশ্বর ব্রহ্ম মর্যাদার অধিকারী হবে।'

পাঠক, মানসুর হাল্লাজের 'আনাল হক' ও *উপনিষদের* ভাষ্যমতে 'ওঁ'-এর সাযুজ্য অনুধাবনের একটু চেষ্টা করুন।[২০]

---

[১৯] ওয়াহদাতুল ওজুদ—'সর্বেশ্বরবাদ'। অর্থাৎ, সবকিছুর মধ্যেই আল্লাহ আছেন। সহজ ভাষায় বলতে পারেন—এই পৃথিবীতে যা কিছুর অস্তিত্ব আছে, সব দেখতে ভিন্ন ভিন্ন হলেও প্রকৃতপক্ষে সবকিছুর অস্তিত্ব এক। তাই স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য নেই। যিনি 'খালিক' (সৃষ্টিকর্তা, আল্লাহ), তিনিই 'মাখলুক' (যা কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে); আর যা সৃষ্টি, তা-ই স্রষ্টা। এই আকিদা বা বিশ্বাস গ্রিকদের হলেও এই আকিদার ওপর সবচেয়ে বেশি আমলকারী হচ্ছে হিন্দুরা। তাই তারা পৃথিবীর প্রায় সবকিছুরই পূজা করে থাকে। যেমন : গাছ, পাথর, মাটি, সাপ-বিচ্ছু, হনুমান, হাতি, পশুপাখি, নদী-সমুদ্র এমনকি নারী ও পুরুষ লিঙ্গের। কারণ, তাদের আকিদা অনুযায়ী স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। — অনুবাদক

[২০] সামসময়িককালে স্বামী রাম তীর্থ (১৮৭৩-১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দ) হাল্লাজের মতো আত্মহারা হওয়া ও বিমোহিত হওয়ার দর্শন লালন করতেন। তিনি লাহোরে অধ্যয়নকালে প্রসিদ্ধ দার্শনিক কবি মুহাম্মাদ ইকবালের সহপাঠী ছিলেন। তিনি গণিতশাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন; কিন্তু একসময় সব

৩. পুরাণ

এটি প্রাচীন কল্পকথার একটি বিবরণীগ্রন্থ। *বেদের* অনুধাবন এর ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় হিন্দুদের কাছে *পুরাণ* পঞ্চম *বেদ* হিসেবে বিবেচিত হয়। হিন্দু ধর্মবেত্তারা দাবি করেন, *বেদের* মতো *পুরাণও* আদি ও অবিনশ্বর। যে ব্যক্তি *বেদ* অনুধাবন করতে চায়, তার জন্য *পুরাণ* অনুধাবন করা আবশ্যক। কেননা, এতে *বেদে* বর্ণিত ইঙ্গিতসূচক ঘটনাবলিকে উদাহরণ ও গল্পের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

পুরাণের শিরোনামগুলো নিম্নরূপ :

১. ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকাহিনি।
২. ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তৃতি।
৩. মনু তথা স্রষ্টার বার্তাবাহকদের যুগ এবং তাদের প্রত্যেকের ঘটনাবলি।
৪. সূর্যবংশী ও চন্দ্রবংশী রাজাদের উপাখ্যান।

পুরাণ অধ্যয়নের মাধ্যমে অনুধাবন করা যায়, এটি প্রথমে ১৮টি অধ্যায়ে বিভক্ত ছিল। পরে এর প্রত্যেকটি নিয়ে আলাদা *পুরাণ* গ্রন্থ রচনা করা হয়। *পুরাণ* গ্রন্থসমূহের মূল উদ্দেশ্য ছিল অবতারের দর্শন তথা মর্ত্যে স্রষ্টার মানবরূপে অবতরণের ধর্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করা। এই আকিদার বিশ্লেষণ সামনে তুলে ধরা হবে।

পুরাণ গ্রন্থাবলির সংখ্যা ১০৮টির বেশি হলেও হিন্দুধর্মাবলম্বী পণ্ডিতদের কাছে এর ১৮টি বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য। এর মধ্যে ভগবত *পুরাণ* সমধিক প্রচলিত। হিন্দুরা প্রতিদিন প্রত্যুষে এটি অত্যন্ত ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে পাঠ করে।

এই গ্রন্থের রচয়িতা কে, তা নিয়ে হিন্দুদের মধ্যে বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। তাদের অধিকাংশের ধারণা, *বেদ* গ্রন্থসমূহের রচয়িতা বেদব্যাস *পুরাণ* গ্রন্থসমূহের রচয়িতা। তবে এ বক্তব্যের ভ্রান্তি খুবই স্পষ্ট। কেননা, একজন মানুষের পক্ষে এতগুলো গ্রন্থ রচনা করা অসম্ভব। আবার *পদ্মপুরাণে* ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দের শংকরাচার্য নামের একজন হিন্দু দার্শনিকের কথা উদ্ধৃত হয়েছে, যিনি নিশ্চিতভাবে বেদব্যাসের বহুকাল পরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাস-জীবন যাপন করতে শুরু করেন। তিনি ধ্যানমগ্ন হওয়ার মানসে হিমালয়ে যান। সেখানে দীর্ঘদিন হিমালয়ের গুহায় কাটান। তিনি চরমভাবে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলেন। পরে গঙ্গা নদীতে ডুবে তার মৃত্যু হয়।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে এই ভারতীয় সাধুর বেশ প্রভাব ছিল। তিনি সেখানে কয়েকটি সেমিনারে বক্তব্য দেন। সেখানে তিনি যোগ-ব্যায়াম ও ভারতীয় সাধনার প্রশিক্ষণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বলতেন, 'আমি রামের মধ্যে আর রাম আমার মধ্যে।' আত্মহারা অবস্থায় তিনি 'ওঁ ওঁ' জপ করতেন।

একইভাবে এসব গ্রন্থের ভাষ্যের মধ্যেও মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। যেমন : *শিব পুরাণে* শিবকে 'মহা ঈশ্বর' ও অন্য ঈশ্বরদের তার সেবাদাস হিসেবে দেখানো হয়েছে। অন্যদিকে ভগবত *পুরাণ* অনুসারীরা দেবীসত্তাকেই বিশ্বস্রষ্টা মনে করে; আর অন্য ঈশ্বরদের তার সেবাদাস মনে করে।

এসব কারণেই হিন্দু ধর্মবেত্তা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দৃঢ়ভাবে এই মত পোষণ করেন যে, *বিষ্ণু পুরাণ* ও *আমান পুরাণ* ছাড়া বাকি সব *পুরাণ* গ্রন্থই বিকৃত ও অবিশ্বাসযোগ্য।

আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ এসব *পুরাণ* গ্রন্থকে হিন্দুধর্মের মৌলিক উৎস থেকে উদ্গত হওয়ার ব্যাপারটি অস্বীকার করেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর। এ-ই ছিল *পুরাণ* গ্রন্থাবলির ব্যাপারে তাদেরই ধর্মীয় পণ্ডিতদের ভাষ্য। এবার আমরা সে-সকল হিন্দুর কাছে প্রশ্ন রাখছি, যারা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে সকাল-সন্ধ্যা *পুরাণ* পাঠ করে, বিয়েশাদিতে এর আবৃত্তি করে, এর মাধ্যমে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সূচনা করে—এসব কি ভ্রষ্টতা ও অন্ধতা নয়?

৪. মহাভারত

মহাভারত শব্দটি দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। 'মহা' তথা মহান ও 'ভারত' তথা হিন্দুস্থান। গ্রন্থটির নাম থেকেই এর আলোচ্যবিষয়ের ধারণা পাওয়া যায়। এতে ভারতবর্ষের বড় বড় যুদ্ধের আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে। গ্রন্থটি রচনায় তিনজন হিন্দু লেখক অংশগ্রহণ করেছিলেন—ব্যাস, বৈশম্পায়ন ও উগ্রশ্রবা।

প্রথমে গ্রন্থটির নাম ছিল *জয়*। পরে এটি *ভারত* নামে পরিচিত হয়। বহুল প্রচার ও প্রসিদ্ধির ফলে এটি *মহাভারত* নামে অভিহিত হতে থাকে।

গ্রন্থটি যেভাবে সংকলিত হয়েছিল, তা এখন তেমন পাওয়া যায় না। এতে বহু ধরনের বিকৃতি ঘটেছে। ধর্মবেত্তাগণ মনে করেন, গ্রন্থটি ২ হাজারের অধিক অধ্যায়ে ১ লাখ ২০ হাজার শ্লোকে বিন্যস্ত ছিল।

প্রখ্যাত হিন্দু ধর্মবিশারদ শ্রী পাল দেব তার *তারিখুল হাজারাতি ওয়াস সাকাফাতি ফিল হিন্দ* গ্রন্থে বলেন, 'প্রসিদ্ধ সূত্রমতে *মহাভারত* খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে রচিত হয়। এতে ১ লাখ শ্লোক রয়েছে।'

গ্রন্থটি রচনার প্রেক্ষাপট

ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি—আর্যরা খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতকে স্থানীয়দের

বিরুদ্ধে বিজয় নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়। এরপর তারা নিজেদের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন সুসংহত করতে প্রয়াস চালায়। এই পদক্ষেপের সূচনাতেই তারা হোঁচট খায় এবং তাদের নিজেদের মধ্যে বিরোধের সূচনা হয়। তারা ভিন্ন ভিন্ন তিনটি ধর্মীয় উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি দল ছিল ব্রহ্মার; আর দুটি ছিল বিষ্ণু ও শিবের। এসব উপদলের মতভিন্নতার ধরনগুলো সামনে আলোচনা করা হবে।

একইসময়ে বৌদ্ধ ও জৈন নামে নতুন দুটি ধর্মেরও উদ্ভব হয়। বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক ছিলেন গৌতম বুদ্ধ ও জৈনধর্মের প্রবর্তক ছিলেন মহাবীর স্বামী। তারা উভয়েই *বেদের* ধর্মবিশ্বাস ও আর্যসভ্যতার বিরুদ্ধে সমালোচনামুখর হয়ে পড়েন। যার পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু ধর্মবেত্তাগণ এমন একটি সর্বজনীন গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন অনুভব করেন, যা আর্যদের প্রত্যেক উপদলের কাছেই গ্রহণযোগ্য হবে। ফলে *মহাভারত* রচিত হয়, যেখানে আর্যদের তিনটি উপদলকে একীভূত করার পাশাপাশি *বেদান্ত* ও যোগ-দর্শন অন্তর্ভুক্ত করে। ফলে সকল হিন্দু এই গ্রন্থকে সাদরে গ্রহণ করে ও সম্মানের চোখে দেখে।

দ্রৌপদী নামের একজন নারীর জন্য একটি রাজপরিবারের মধ্যে সৃষ্ট সংঘাতের ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে গ্রন্থটি রচিত হয়েছে, যে ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে আমাদের ধারণা নেই। একটি পক্ষের বিজয়ের মাধ্যমে ঘটনাটির সমাপ্তি হয়। ঘটনাটির বিবরণের পাশাপাশি কৃষ্ণ নামের নায়কের ভাষায় বিভিন্ন ধর্মীয় দর্শন ও হিন্দু ধর্মমতে চারিত্রিক শিষ্টাচারের বিবরণ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। গ্রন্থটি বিশ্বব্যাপী অনেক ভাষায় অনূদিতও হয়েছে। আবদুল হামিদ নুমানি নামে একজন ভারতীয় মুসলমান এর আরবি অনুবাদ করেছেন। অবশ্য আমি এখন পর্যন্ত এর আরবি সংস্করণটি দেখিনি। এ কারণে এর উদ্ধৃতির জন্য এর মূল সংস্কৃত সংস্করণ ও হিন্দি অনুবাদের ওপরই নির্ভর করেছি।

৫. গীতা

গীতাকে হিন্দুধর্মের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। হিন্দু-দর্শনে এর গুরুত্ব অপরিসীম। এখানে বস্তুত হিন্দু মহানায়ক কৃষ্ণ কর্তৃক সেনাপতি অর্জুনের সামনে উপস্থাপন করা উপদেশাবলি সংকলন করা হয়েছে।

এই উপদেশমালার মধ্যে সেনাবাহিনীর করণীয় ও মাতৃভূমির প্রতিরক্ষা নিশ্চিতকরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যদিও এর জন্য একান্ত ঘনিষ্ঠজনের বিরুদ্ধে লড়তে হয়। সেটি 'পবিত্র যুদ্ধ' নামে পরিচিত। আরও রয়েছে, স্রষ্টার সত্তা নিয়ে গবেষণার

প্রয়োজনীয়তা। হিন্দুদের ধারণামতে, কৃষ্ণ ছিলেন ব্রহ্মার অবতার (অবতার—স্রষ্টা যখন মানবরূপে পৃথিবীতে অবতরণ করেন)। এতে আরও রয়েছে জ্ঞানার্জন, উপাসনা ও কর্ম—এই তিনটি উপায়ে মুক্তির পথ নিশ্চিত করার শিক্ষা।

জ্ঞান তথা এ কথার অনুধাবন করা যে, সকল সৃষ্টজীব উর্ধ্বজগতের আত্মার অংশ; আর উর্ধ্বজগতের আত্মা প্রতিটি সৃষ্টজীবের মধ্যেই বিদ্যমান। যখন কারও এই অনুভূতি অর্জিত হবে, তখন সে ধর্মীয় বিধিবিধানের উর্ধ্বে অবস্থান করবে। পাশাপাশি ইবাদত তথা ঈশ্বরের উপাসনা করা। তার উপাসনায় নিজেকে সঁপে দেওয়া। এ পথে নিজেকে বিভিন্ন কষ্ট-ক্লেশের মুখোমুখি করা। কর্ম তথা পৃথিবীত পরিণামের চিন্তা না করে ধর্মীয় আচার ও রীতিনীতি পালন করা। নিজেকে সব ধরনের বন্ধন থেকে মুক্ত করে উর্ধ্বজগতের প্রতি নিবিষ্ট করা। কেননা, সেখানে ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মা মিলিত হবে।

গীতার আরও কয়েকটি শিক্ষা

- মানবাত্মা আদি ও অবিনশ্বর। মানুষের কখনো জন্ম-মৃত্যু হয় না। যেভাবে মানুষ পোশাক পরিবর্তন করে, সেভাবে মানবদেহেরও পরিবর্তন হয়।
- ক্ষত্রিয় শ্রেণির বড় দায়িত্ব হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্রে নিবেদিত থাকা।
- মনস্কামনা দমনের লক্ষ্যে সাধনা করো। কখনো মনস্কামনার শিকারে পরিণত হয়ো না।
- মানুষ নিজেই নিজের শত্রু ও মিত্র।
- সাধকদের আত্মায় স্রষ্টার নিবাস।
- জ্ঞানের চেয়ে উত্তম কিছু নেই।

গ্রন্থটিতে ১৮টি অধ্যায়ে মোট ৭ লাখ শ্লোক রয়েছে। বস্তুত, *গীতা* গ্রন্থটি *মহাভারতেরই* একটি অংশ।

গীতা গ্রন্থটি হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থগুলোর মধ্যে জগৎ-জুড়ে খ্যাতি পেয়েছে। এই গ্রন্থে 'কর্মাদর্শন' তথা প্রতিদানের বিধি, সাধু-সন্ন্যাসীদের করণীয়, রাজনৈতিক জ্ঞান ও রাষ্ট্র পরিচালনার নীতির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। এর পাশাপাশি তাতে চিত্তের অস্থিরতা থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। এতৎসত্ত্বেও হিন্দু-ধর্মবিশারদগণ মনে করেন, এই গ্রন্থের চরিত্রগুলো কাল্পনিক ও রূপকার্থবোধক। তারা 'কৃষ্ণ' চরিত্রের অস্তিত্ব ও হিন্দুদের অভ্যন্তরীণ এসব

যুদ্ধের বিবরণ অস্বীকার করেন, যেগুলোতে অসংখ্য প্রাণ ও সম্পদহানি হয়েছিল, যেমনটি এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

ভারতের প্রখ্যাত হিন্দু নেতা গান্ধি বলেন, 'আমি কৃষ্ণের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না। কেননা, ইতিহাসের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।'

ডক্টর রাধা কৃষ্ণ বলেন, '*গীতার* দর্শনগুলো পরস্পর সাংঘর্ষিক। আমি এতে সঠিক জ্ঞান ও পথের দিশামূলক কিছুই পাইনি। এ গ্রন্থের সংকলনে বহু লেখক অংশগ্রহণ করেছিলেন।'

আধুনিক গবেষকদের অনেকেই এ কারণে গ্রন্থটির সমালোচনা করেছেন। কেননা, গ্রন্থটির কারণে ভারতবর্ষের মহাযুদ্ধ হয়েছিল। এ যুদ্ধ মানুষকে যুদ্ধবিগ্রহ ও সংঘাতের প্রতি উদ্‌বুদ্ধ করে। এটি হিন্দুধর্মের প্রসিদ্ধ দর্শন 'অহিংসা পরম ধর্ম'-এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ভারতের প্রখ্যাত হিন্দু নেতা গান্ধি এই মতবাদের বড় প্রবক্তা ছিলেন।

এ-ই হলো হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ *গীতা* ও তাদের মহামানব কৃষ্ণের বাস্তবতা। হিন্দুধর্মের এই মহামানব জগৎ-জুড়ে খ্যাতি পেয়েছেন। ভারতের যেকোনো মন্দির, রেলস্টেশন বা কোনো স্থাপনায় গেলে আপনি কৃষ্ণের ছবি ও উপাসনার লক্ষ্যে স্থাপিত তার মূর্তি দেখতে পাবেন।

৬. রামায়ণ

গ্রন্থটিতে রামের সঙ্গে লঙ্কার রাজা রাবণের ঐতিহাসিক যুদ্ধের ইতিবৃত্ত তুলে ধরা হয়েছে। রামের বিজয়ের মাধ্যমে এ দুজনের দ্বৈরথ শেষ হয়েছিল। কিন্তু গল্পটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দিঙ্‌নির্দেশ করে। সেটি হচ্ছে, ভালো ও মন্দের ঐতিহাসিক দ্বৈরথের উপাখ্যান। যদিও এই ঘটনা নিছক কাল্পনিক। তবে সৃষ্টির শুরুলগ্ন থেকে ভালো-মন্দের যে সংঘাত প্রবহমান, ঘটনা বিবরণীর মাধ্যমে এই গ্রন্থে সেটিই ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। তাই খ্রিষ্টপূর্ব যুগ থেকেই ভারতের আনাচে-কানাচে এ ঘটনার বিবরণ ছড়িয়ে পড়েছিল। হিন্দুধর্মের অনুসারীদের মধ্যে এসব ঘটনার ব্যাপক প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়। অন্যভাবে বলা যায়, এটিকে হিন্দুধর্মের জাতীয় গ্রন্থ হিসেবে অভিহিত করা হয়, যা সর্বজনীনভাবে হিন্দুদের কাছে সমানভাবে গ্রহণযোগ্য। গ্রন্থটি ভারতের বিভিন্ন ভাষায় যেভাবে অনূদিত হয়েছে, তেমনি ভারতের বাইরে ইন্দোনেশিয়া, বার্মা ও তিব্বত অঞ্চলের বিভিন্ন ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে।

রামায়ণ গ্রন্থটি হিন্দুদের কাছে *গীতার* চেয়ে অধিক পরিচিত। *গীতায়* এমন বহু সূক্ষ্ম দর্শন রয়েছে, যা সাধারণ পাঠকের বোধগম্যতার ঊর্ধ্বে, অন্যদিকে *রামায়ণে* ঘটনার বিবরণ অত্যন্ত সাবলীলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা সব পর্যায়ের পাঠককে মোহাবিষ্ট করে।

এখানে পাঠকের সামনে পুরো গল্পটি সংক্ষেপে উপস্থাপন করে পরে এর ঐতিহাসিক মূল্যায়ন তুলে ধরা হবে।

'দশরথ ছিলেন অযোধ্যার[১১] শাসক। তার তিনজন স্ত্রী ছিল। দশরথের বড় স্ত্রীর গর্ভে রাম, দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে ভরত ও কনিষ্ঠা স্ত্রীর গর্ভে লক্ষণের জন্ম হয়। দশরথ তার দ্বিতীয় স্ত্রীকে সর্বাধিক ভালোবাসতেন। কেননা, তার দ্বিতীয় স্ত্রী তাকে কোনো এক যুদ্ধে সহযোগিতা করেছিল। তখন আনন্দিত হয়ে সম্রাট তার আবদার পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। একবার সম্রাট তার বড় পুত্র রামকে সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী বানাতে চাইলে দ্বিতীয় স্ত্রী এতে বাধ সাধেন। তিনি সম্রাটের কাছে আবদার করেন, তার গর্ভে জন্ম নেওয়া ভরতকে যেন পরবর্তী সম্রাট হিসেবে মনোনীত করা হয় এবং দশরথের বড় পুত্র রামকে ১৪ বছরের জন্য বনবাসে পাঠিয়ে দেন। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সম্রাট তার আবেদন গ্রহণ করেন এবং পুত্র রামকে নির্বাসিত করে মেঝ ছেলে ভরতকে সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন।

এর পর রাম তার স্ত্রী সীতা ও ছোট ভাই লক্ষণকে সঙ্গে নিয়ে বনবাসে যান। সেখানে লঙ্কা-অধিপতি রাবণের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। রাবণ তখন রামের স্ত্রী সীতাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। রাম স্বীয় স্ত্রীর অপহরণের সংবাদ পেয়ে বানরদের নিয়ে সৈন্যসমাবেশ ঘটান এবং লঙ্কায় হানা দেন। বানরবাহিনীর প্রধান ছিল হনুমান, সে লঙ্কা জ্বালিয়ে দেয় এবং সীতাকে উদ্ধার করে রামের হাতে তুলে দেয়। এ যুদ্ধে লঙ্কার রাজা রাবণের মৃত্যু হয়।'

পরে এই যুদ্ধ নিয়ে যেসব গল্প তৈরি হয়েছে, তা হিন্দুদের সামনে রামকে অত্যন্ত সম্মানজনক অবস্থানে পৌঁছে দেয়।

এসব গ্রন্থে বলা হয়েছে, রাবণ সীতাকে অপহরণ করে নিজের সাম্রাজ্যে নিয়ে যায়। সংবাদ পেয়ে রাম বানরদের সাহায্যে নিজের বাহিনী গড়ে তোলেন; কিন্তু

[১১] এটিই সেই শহর, যেখানে ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ অবস্থিত। হিন্দু উগ্রবাদীরা রামমন্দির নির্মাণের দাবিতে ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দের ৬ ডিসেম্বর মসজিদটি ধ্বংস করে দেয়। ফলে ভারতজুড়ে ভয়াবহ দাঙ্গার সূত্রপাত ঘটে ও অসংখ্য মানুষ মৃত্যুবরণ করেন। (বর্তমানে এই মসজিদের জায়গায় ভারত সরকার রামমন্দির নির্মাণ করছে।— সম্পাদক।)

ভারত মহাসাগর লঙ্কার রাজ্যে হানা দেওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। রামের বাহিনী তিন দিন পর্যন্ত সমুদ্রের উপকূলে অবস্থান করে। এই অবস্থান দীর্ঘায়িত হলে রাম তার ভাই লক্ষ্মণকে একটি ধনুক নিয়ে আসতে বলেন। এরপর রাম সমুদ্রের বুকে একটি অগ্নিশর নিক্ষেপ করলে সমুদ্রের বুকে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে থাকে। শুকিয়ে যাওয়ার ভয়ে সমুদ্র রামের সামনে করজোড়ে নিবেদন করে, 'হে পবিত্র আত্মা, আমি আপনার ক্রোধে ভস্মীভূত হয়ে যাচ্ছি। আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার করণীয় নির্দেশ করুন। আমি আপনার সেবায় হাজির!'

রাম তখন মৃদু হেসে বললেন, 'আমাদের সমুদ্রপৃষ্ঠ অতিক্রম করার সুযোগ তৈরি করে দাও।'

প্রতিউত্তরে সমুদ্র বলল, 'হে পবিত্র আত্মা, আপনার বাহিনীতে নীল ও নাল নামের দুটি মহাশক্তিধর বানর রয়েছে। তারা বড় বড় পাহাড় বহন করে এনে সমুদ্রের বুকে স্থাপন করতে পারবে। আপনি তাদের নির্দেশ দিন, তারা যেন পাহাড় বহন করে সমুদ্রের বুকে বাঁধ তৈরি করে। এতে আপনারা সহজেই সমুদ্র পাড়ি দিতে সক্ষম হবেন!'

পরে রাম নীল ও লালকে এ মর্মে নির্দেশ দেন। তারা রামের নির্দেশ বাস্তবায়ন করে। ফলে পুরো বাহিনী সহজেই সমুদ্র পাড়ি দিতে সক্ষম হয় এবং তাদের হাতে লঙ্কা বিজয় হয়।

এ-ই হলো রামায়ণের ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ, যেখানে রামের জীবনচরিত তুলে ধরা হয়েছে। এটি রামকে মহান স্রষ্টার মর্যাদা দিয়েছে।

পাঠক হয়তো অবাক হয়ে লক্ষ করেছেন, এই মহান ঈশ্বর তার নিজের বাহিনীতে মহাশক্তিমান দুটি বানরের উপস্থিতির কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন এবং সমুদ্র পাড়ি দিতে ব্যর্থ হয়ে তিন দিন ধরে সমুদ্রের পাড়ে হতাশ হয়ে অবস্থান নিয়েছিলেন!

যাইহোক, এই কল্পকথার প্রসঙ্গ বাদ থাকুক, আমরা আলোচনায় আসি *রামায়ণ*-রচনার সময় নিয়ে। হিন্দু ধর্মবেত্তাদের মধ্যে *রামায়ণে*র রচনাকাল নিয়ে ভিন্নমত পরিলক্ষিত হয়। কেউ কেউ বলেন, *বেদ* সংকলনের কিছুকাল পরেই এটির রচনা করা হয়েছিল। আবার কেউ বলেন, এর রচনা হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ২০০—৫০০ খ্রিস্টাব্দে। একইভাবে এর রচয়িতা কোন যুগের ছিলেন, তা নিয়েও বিভিন্ন মত দেখা যায়। অবশ্য তারা সবাই এ কথায় একমত যে, *রামায়ণে*র রচয়িতার নাম বাল্মিকি। তাদের কেউ মনে করেন, বাল্মিকি ছিলেন রামের সামসময়িক ও তার

সহচর। আবার কেউ বলেন, রামের যুগের কয়েক শতাব্দী পর বাল্মিকি *রামায়ণ* রচনা করেন। অবশ্য বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত থেকে প্রতীয়মান হয়, *রামায়ণ* নির্দিষ্ট কোনো সময়ে রচনা করা হয়নি। বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন সময়ে এতে অনেক কিছু সংযোজন করেছেন। যেমন, এর প্রথম অধ্যায় 'বালকাণ্ড' তথা 'শিশুকাল' পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়েছিল।

পশ্চিমা গবেষকদের মতে, অশোক রাজবংশের কোনো এক ব্যক্তি *রামায়ণ* রচনা করেছিল। তখন গ্রন্থটিতে ১২ হাজার শ্লোক ছিল। হিন্দু ভিক্ষুকরা ভিক্ষার সময় এসব শ্লোকের মাধ্যমে ভিক্ষা করত। পরে তারা এতে নিজেদের ইচ্ছামতো সংযোজন করতে থাকে। এভাবে একপর্যায়ে *রামায়ণে*র আকার দ্বিগুণেরও বড় হয়ে যায়।

এর পর বাল্মিকির বিক্ষিপ্ত অংশগুলো বিন্যাসের কাজে হাত দেন, তবে প্রাচীনকালে গ্রন্থটি ততটা প্রসার লাভ করেনি। ষোড়শ শতাব্দীতে সম্রাট জালালুদ্দিন আকবরের শাসনামলে তুলসিদাস গোস্বামী (১৫৩২-১৬২৩ খ্রিস্টাব্দ) হিন্দি ভাষায় এর অনুবাদ করেন। এর পরই *রামায়ণ* ভারতব্যাপী পরিচিত হয়ে ওঠে। মানুষ তখন এর পাঠে উদ্‌বুদ্ধ হয়। তবে তুলসিদাস তার অনুবাদে যথাযথ বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে পারেননি। তিনি মনগড়াভাবে বাল্মিকির রচনা বিকৃত করেছেন। তিনি তার অনুবাদে রামকে মহান ঈশ্বরের মর্যাদা দিয়েছেন; অথচ বাল্মিকির উপাখ্যানে তাকে একজন বিচক্ষণ সাহসী মানুষ হিসেবে চিত্রায়িত করা হয়েছে। হিন্দু ধর্মবেত্তাগণ তুলসিদাসের এসব পরিবর্তন সহজভাবে নিতে পারেননি; তারা এর চরম সমালোচনা করেছেন। বিশেষত, নারীদের প্রহার ও অস্পৃশ্য মানুষদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার ব্যাপারগুলো তারা সহজে মেনে নিতে পারেননি; কিন্তু সময়ের বিবর্তনে *তুলসি রামায়ণ* হিন্দুদের কাছে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

গল্পের সমাপ্তি হয় এভাবে—রাম তার পিতার প্রতিশ্রুতি পূরণে বদ্ধপরিকর ছিলেন। তিনি দীর্ঘ ১৪ বছর বনবাসে থাকেন। তার ভাই ভরত—যাকে তার মা সম্রাট হিসেবে সিংহাসনে বসাতে চেয়েছিল—তিনি নিজেই সম্রাট হতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি বনবাসী রামকে ফিরিয়ে এনে তার হাতে সাম্রাজ্যের ভার তুলে দিতে প্রত্যয়ী হন; কিন্তু রাম তার পিতার দেওয়া বনবাসের সময়সীমা পূরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। ফলে ভরত তার পাদুকা নিয়ে শহরে ফেরেন এবং সিংহাসনে তার পাদুকা রেখে দেন।

রামের শহরে ফেরা পর্যন্ত তার প্রতিকী শাসন হিসেবে পাদুকাজোড়া এভাবেই থাকে। পরিশেষে রাম অযোধ্যায় ফিরে আসেন এবং অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণতার

সঙ্গে শাসনকাজ পরিচালনা করেন। হিন্দি-সাহিত্যে তার সময়ের ন্যায়পরায়ণতা প্রবাদতুল্য। ভারতীয় প্রসিদ্ধ নেতা গান্ধি এই শাসনকালের পুনঃপ্রবর্তনে প্রত্যয়ী ছিলেন। তিনি একে রামরাজ্য হিসেবে ঘোষণা করেন, যেখানে রামের প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থা প্রচলিত হবে।

৭. বেদান্ত

'বেদান্ত' অর্থ বেদের সারাংশ। হিন্দুরা একে দর্শন ও চরিত্রবিদ্যার গ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করে। এটি তুলনামূলক ছোট আকারের গ্রন্থ হলেও হিন্দু-দর্শন ও সুফিবাদের জন্য অন্যান্য গ্রন্থের চেয়ে বেশ প্রভাবশালী।

গ্রন্থটি *ব্রহ্মসূত্র* নামেও পরিচিত। কোনো কোনো হিন্দু পণ্ডিত দাবি করেন, এটি প্রসিদ্ধ লেখক বেদব্যাসের রচনা। অবশ্য পরবর্তী সময়ে তারা ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, গৌতম বুদ্ধ ও ইসা মাসিহের অন্তবর্তীকালীন লেখক বদরায়ণ এটি রচনা করেছেন। কেননা, তিনি গৌতম বুদ্ধের বহু বিচ্যুতি তথা ধর্মদ্রোহী বক্তব্যের সমালোচনা করেন।

ক. *বেদান্ত* চারটি অধ্যায়ে মোট ১৬টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত

১. প্রথম অধ্যায়ে ব্রহ্মার উপাসনা ও এর পদ্ধতির আলোচনা করা হয়েছে।

২. দ্বিতীয় অধ্যায়ে সর্বেশ্বরবাদের আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি ধর্মবিচ্যুত বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের মূলনীতির অসারতা প্রমাণ করা হয়েছে।

৩. তৃতীয় অধ্যায়ে মুক্তির উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মুক্তিলাভের উপায় দুটি—এক. পরিপূর্ণ নৈবেদ্য ও স্রষ্টায় বিলীন হওয়া। দুই. ঐশী উৎস থেকে জ্ঞানপ্রাপ্ত হওয়া।

৪. চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে উপাসকের প্রতিদান নিয়ে। এর পাশাপাশি এই অধ্যায়ে উর্ধ্বজগতের আত্মার ব্যাপারেও আলোচনা করা হয়েছে।

সংক্ষেপে বলা যায়, *বেদান্তে* হিন্দুধর্মের মৌলিক দর্শনাবলি-সংবলিত ১০টি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয়েছে। যথা : স্রষ্টার পরিচয়, আত্মা, চিত্তের অস্থিরতা, মৃত্যুপরবর্তী অবস্থা, পরিণতি, নিঃশর্ত উপাসনা, ঐশীজ্ঞান, মনস্কামনা ও মুক্তি।

একইভাবে গ্রন্থটিতে তিনটি চিরন্তন বাস্তবতার কথাও স্বীকার করা হয়েছে :

১. **পরমার্থক :** আত্মার আদি ও অবিনশ্বর হওয়া।

২. **ব্যবহারার্থক :** সৃষ্টিই স্রষ্টা; আর স্রষ্টা মানবরূপেই ধরা দেন। কেননা, মানবদেহই সুন্দর ও পরিমিত।

৩. **বরাতবাসক :** রূপকার্থের প্রকাশ ও বাস্তবতাকে গোপন করা।

খ. বেদান্তের ব্যাখ্যাকারদের মতভেদ

বেদান্তের ব্যাখ্যাকারগণ দুটি মতবাদে বিভক্ত হয়েছেন :

১. অদ্বৈতবাদ তথা ওয়াহদাতুল ওজুদ।

২. দ্বৈতবাদ তথা দ্বৈত সত্তার বিশ্বাস।

প্রথমোক্ত মতবাদের প্রবক্তা হচ্ছেন শংকরাচার্য; আর দ্বিতীয়টির প্রবক্তা হিন্দু পণ্ডিত রামানুজ।

গ. উভয় মতবাদের মৌলিক পার্থক্য

১. শংকরাচার্য ব্রহ্মার সত্তাগত ও গুণগত বৈশিষ্ট্যাবলিকে অস্বীকার করেন। তিনি তাকে নির্গুণ মনে করেন।[২২] অপরদিকে রামানুজ স্রষ্টার সত্তাগত গুণাবলিতে বিশ্বাস করেন। তিনি বলেন, 'গুণাবলি ব্যতীত স্রষ্টার কল্পনা করা যায় না, গুণাবলি ছাড়া তিনি অস্তিত্বহীন।'

২. শংকরাচার্য বলেন, 'আমরা চোখে যা দেখি, তার কিছুই বাস্তব নয়; বরং সবই ভ্রম। পুরো বিশ্ব স্বপ্নবৎ, বাস্তবে এর কোনো অস্তিত্ব নেই। এটি সেই রজ্জুর ন্যায়, অন্ধকারে মানুষ যাকে সর্পজ্ঞান করে। সব ভ্রম কেটে গেলে দেখা যাবে স্রষ্টার অস্তিত্ব ভিন্ন আর কিছুই নেই।'

তিনি আরও বলেন, 'মানুষকে এ কথা অনুধাবন করতে হবে, তার বাহ্য কাঠামো, যা কোনো ক্ষেত্রে অন্যের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ আবার কিছু ক্ষেত্রে বিসদৃশ। বস্তুত যার জন্ম-মৃত্যু আছে ও পানাহারের প্রয়োজন আছে, বাস্তবে সে উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। মানুষের দৃষ্টি থাকা উচিত তার সেই সত্তার প্রতি, যেটি স্রষ্টার অংশ। এ কারণে এটি বলা যথার্থ যে, তুমি মানুষও আবার ঈশ্বরও। একদিকে স্রষ্টা, অপরদিকে সৃষ্টি। একদিকে উপাসক, অপরদিকে উপাস্যও।'

[২২] তার এই মতবাদ অনেকটা জাহমিয়াদের মতবাদের অনুরূপ।

তিনি আরও বলেন, 'স্রষ্টাতত্ত্বের পূর্ণ অবগতি ও বস্তুজগতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা ছাড়া মানুষ ব্রহ্মা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। এসবের মাধ্যমেই সে স্রষ্টার মধ্যে বিলীন হতে পারে। চিরস্থায়ী সৌভাগ্য নিশ্চিত করতে পারে।'

তার দৃষ্টিতে কোনো ব্যক্তির এ ধারণা পোষণ করা যে, সে ঈশ্বরের পরিচয় জেনেছে—এটিই স্রষ্টার সঙ্গে শিরক করার নামান্তর। তার এই বক্তব্য দ্বৈতসত্তার প্রতি ইঙ্গিত করে। শংকরাচার্যের বক্তব্য আর ইবনুল আরাবির বক্তব্য দুটি একটু মিলিয়ে দেখুন। ইবনুল আরাবি বলেন, 'পবিত্রতা সেই সত্তার, যিনি বস্তুর প্রকাশ ঘটিয়েছেন অথচ সেটি তিনিই।'

তিনি আরও বলেছেন, 'আমার চোখ তাকে ভিন্ন কিছুই দেখে না; আর তার বাণী ছাড়া আলাদা কিছু শ্রবণ করে না।'[২৩]

অপরদিকে রামানুজ মনে করেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মার অংশ হলেও উভয়টি ভিন্ন ভিন্ন সত্তা। উভয়টি নিজস্ব আকারে পূর্ণরূপে অস্তিত্বশীল। প্রতিটি আত্মা কল্যাণ ও অকল্যাণের কাজে পুরোপুরি স্বাধীন; আর ব্রহ্মার সুদৃষ্টিই মুক্তির উপায়।

এই দুই মতের বাইরে *বেদান্তের* ব্যাখ্যায় আরও মত রয়েছে, তবে সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে তা ততটা খ্যাতি পায়নি। এসবের মধ্যে একটি হচ্ছে 'নিম্বার্ক মতবাদ'। এই মতবাদ অনুসারে জগৎ ও জীবই ব্রহ্মা। আরও একটি হচ্ছে, মধ্যাচার্য মতবাদ। এই মতবাদে ব্রহ্মা ও বিশ্ব উভয়কে অবিনশ্বর মনে করা হয়।

৮. যোগ বাশিষ্ঠ (Yoga Vasistha)

এই গ্রন্থকে হিন্দুধর্মের মূল গ্রন্থসমূহের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয়। হিন্দুদের অন্যান্য পবিত্রগ্রন্থের মতো এর রচয়িতাও অজ্ঞাত। এর রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের আশেপাশে, যে সময়টা হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোর রচনার কাল হিসেবে পরিচিত। তখন আর্যরা দীর্ঘদিনের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধবিগ্রহ সমাপনান্তে ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো গঠনে মনোযোগী হয়েছিল। এর পাশাপাশি তখন তাদের ধর্মীয় পণ্ডিতগণ আধ্যাত্মিক ঘটনাবলিকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় গ্রন্থ রচনার কাজে হাত দেন। সেসব গ্রন্থে ছিল ধর্মশাস্ত্রীয় দর্শন ও শিষ্টাচারের দীক্ষা।

গ্রন্থটিতে ৬৪ হাজার শ্লোক রয়েছে। এসব শ্লোক ছিল মূলত সেসব শিক্ষার সংকলন, ঋষি বাশিষ্ঠ তার অনুগত শিষ্য রামচন্দ্রকে যেসব ধর্মতত্ত্ব, আধ্যাত্মিক

[২৩] *আল-ফুতুহাতুল মাক্কিয়া* : ২/৬০৪।

জ্ঞান ও তপস্যা শিখিয়েছিলেন। যার মাধ্যমে মানুষ আত্মার জগতের সন্ধান পায়, উর্ধ্বজগতের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে, তাদের ধারণামতে ব্রহ্মার সঙ্গে মিলিত হতে পারে।

এই গ্রন্থে তপস্যার তিনটি পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে :

১. একক সত্তার বিশ্বাস তথা এ কথার বিশ্বাস পোষণ করা, এই বিশ্বচরাচরে ব্রহ্মাই একমাত্র অস্তিত্ব।

২. আত্মিক প্রশান্তি তথা চিত্তকে পরাভূত করে নিজের অনুগত করা। যার আত্মা প্রশান্ত আত্মায় (নাফসে মুতমায়িন্না) পরিণত হবে, তাদের ধারণামতে সে সব ধরনের পার্থিব দুঃখ-জরা থেকে নিষ্কৃতি পাবে।

৩. নাফসের বিরোধ।

এই গ্রন্থে দেখানো হয়েছে, মানবজীবন পাপরাশিতে পূর্ণ; আর মনস্কামনা মানুষকে ধ্বংস ও পতনের দিকে নিয়ে যায়। ফলে মানবজীবন দুঃখ-জরায় পূর্ণ থাকে। এ তিনটি পদ্ধতির কোনো একটি অবলম্বনের মাধ্যমে মানুষ এসব দুঃখ-জরা বিদূরিত করতে পারে। উর্ধ্বজগতের ব্রহ্মার সান্নিধ্যলাভের মাধ্যমে মানবজীবন স্থায়ী আনন্দ ও শান্তিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে।

ড. আহমাদ শালাবি প্রণীত *আদইয়ানুল হিনদিল কুবরা* থেকে আমি জেনেছি, গ্রন্থটি আরবিভাষায় অনূদিত হয়েছে। তিনি সেখানে এই গ্রন্থের কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন। আমি এখানে পাঠকের সামনে আহমাদ শালাবির গ্রন্থ থেকে সেসব উদ্ধৃতির কয়েকটি তুলে ধরছি :

- যে পৃথিবীতে প্রতিটি প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সেখানে সত্যিকারের কল্যাণ অর্জনের কোনো উপায় নেই। এই জগতের প্রতিটি বস্তুই পতনশীল। জগতের যাবতীয় আনন্দ ও সুখ ভ্রমমাত্র। আনন্দ-বেদনা একটি অপরটির সঙ্গে সম্পৃক্ত। হ্যাঁ, আমাদের দাসের মতো ক্রয় করা হয়নি, তবে অবশ্য আমরা অনুগত দাসের মতোই কাজ করি।
- মানুষের আকাঙ্ক্ষা সর্বদা অস্থির। চিত্ত কখনো পরিতৃপ্ত হয় না, নিজের অর্জনে সন্তুষ্ট থাকে না। সে সর্বদা এমন বিষয় হস্তগত করতে লোলুপ থাকে, যা তার সাধ্যের বাইরে। যখন কোনো কিছু অর্জন করতে সক্ষম হয়, তখন আরও বেশি অর্জনের পেছনে ছুটতে থাকে।
- দেহে কোনো মঙ্গল নেই। এটি রোগ-জরার আকর, যা ক্ষয়িষ্ণু। শিশুকাল

হলো অক্ষমতা ও দুর্বলতার সময়। তখন বাকশক্তিও থাকে না, এমনকি সামান্য জ্ঞানও থাকে না; আর যৌবনকাল কি দেখেছেন? এটি তো বিদ্যুতের চমক। আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, এরপর হারিয়ে যায়। এটা ক্রমে বার্ধক্যের দিকে আমাদের নিয়ে যায়, যা ব্যথা-বেদনাপূর্ণ।

- জীবন হচ্ছে খোলা স্থানে রাখা প্রদীপের মতো। বাতাসের ঝাপটা চতুর্দিক থেকে তাকে নিয়ে খেলতে থাকে; আর সব বস্তুর চাকচিক্য শুধুই বিদ্যুৎ-চমকের মতো, যা মুহূর্তে আলোকিত করে, এরপর হারিয়ে যায়।'

এ গ্রন্থটি এভাবেই জীবনকে নেতিবাচকভাবে চিত্রায়িত করে। তাতে এমন সব বর্ণনা রয়েছে, যা মানবাত্মাকে নিরাশা ও হতাশায় মুষড়ে দেয়। এটি ইসলামি দর্শনের সম্পূর্ণ বিপরীত। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

﴿قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ۗ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ﴾

বলুন, হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজেদের ওপর অবিচার করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [সুরা জুমার : ৫৩]

তাবে যাই হোক, বহু হিন্দু পণ্ডিত এই গ্রন্থ দ্বারা বেশ প্রভাবিত হয়েছেন। তাই তারা পার্থিব বন্ধন ছিন্ন করে গুহা-জঙ্গলে সাধনা ও তপস্যায় লিপ্ত হয়েছেন।

ঋষি স্বামী রামতীর্থ ছিলেন সাধনাজগতের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। তিনি তার শেষ জীবনে অনেকটা ভাবুক হয়ে পড়েছিলেন। তিনি দাবি করতেন, 'আকাশের ছায়াতলে *যোগ বাশিষ্ঠের* মতো কোনো গ্রন্থ রচিত হয়নি। তাই মহান আল্লাহর প্রজ্ঞাবান সিদ্ধান্ত ছিল, পূর্বের সব ধর্মকে রহিত করে কুরআনকে মানবজীবনের স্থায়ী নীতিমালায় পরিণত করা, যেন মানুষকে আর কখনো প্রাচীন জাহিলিয়াতে ফিরে যেতে না হয়।'

৯. ধর্মশাস্ত্র

এটি মূলত হিন্দুধর্মের বিধিবিধান-সংবলিত গ্রন্থসমূহের সমষ্টি। এসব গ্রন্থ *বেদান্তের* মূল ও তার নীতিমালার সমাহার। অবশ্য এসব গ্রন্থের অধিকাংশই কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। এসবের মাত্র ১৬টির সন্ধান মিলেছে। তন্মধ্যে *মনুস্মৃতি* তথা 'মনুর নীতিমালা' সমধিক পরিচিত।

ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত আলোচ্য বিষয়সমূহ

ধর্মশাস্ত্রের গ্রন্থগুলো তিনটি মৌলিক শিরোনামে সন্নিবেশিত :

১. মানবজীবনের চারটি স্তর তথা চতুরাশ্রমের বিধিবিধান। এর বিস্তারিত বিবরণ সামনে আলোচনা করা হবে।

২. বিচারিক শাস্তি ও দণ্ডবিধি।

৩. হিন্দু ধর্মাবলম্বীর ধর্মীয় বিধিনিষেধ লঙ্ঘনের শাস্তি।

এই মনু কে ছিলেন, তা নিয়ে হিন্দুদের বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে। তাদের কেউ কেউ মনে করেন, তিনিই ছিলেন মানবসম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দেওয়া মহাপ্লাবনের পর বেঁচে থাকা প্রথম মানব। তার হাত ধরেই আবার নতুন করে মানবজাতির বিস্তার ঘটেছে। কেউ কেউ বলেন, তিনি ছিলেন একজন ঋষি, যিনি নৈবেদ্য[১৪] গ্রহণ করতেন। তার সময় ছিল খ্রিস্টপূর্ব ১০০০-৬০০ সাল।

মনু রচিত ধর্মশাস্ত্র তথা *মনুস্মৃতি* ১২টি অধ্যায়ে ২,২৯৪টি শ্লোকে বিন্যস্ত। এখানে পাঠকের সামনে সংক্ষেপে শুধু অধ্যায়গুলোর আলোচ্য বিষয়ের বিবরণ তুলে ধরা হলো :

প্রথম অধ্যায় : এই অধ্যায়ে পৃথিবীর সৃষ্টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রাণের সৃজনের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। কিয়ামত সংঘটন ও পৃথিবীর ধ্বংস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : এই অধ্যায়ে মানবজীবনের প্রথম স্তর তথা ব্রহ্মচার্য আশ্রমের আচারবিধির আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় : এই অধ্যায়ে বিয়ের বিবরণ ও এর প্রকারসমূহ এবং বর-কনের কল্যাণের জন্য নৈবেদ্যের আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় : এই অধ্যায়ে গার্হস্থ্য আশ্রম তথা মানবজীবনের দ্বিতীয় স্তরের আচারবিধির আলোচনা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি *বেদান্তের* বিধিবিধানের আনুগত্য ও মন্দকাজ পরিহারের প্রতি উদ্‌বুদ্ধ করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় : এখানে স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব ও পতিব্রতা নারীর উত্তম পরিণতির আলোচনা করা হয়েছে।

[১৪] দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদনীয় দ্রব্য। — অনুবাদক।

ষষ্ঠ অধ্যায় : এই অধ্যায়ে বানপ্রস্থ আশ্রম তথা মানবজীবনের তৃতীয় স্তরের আলোচনা করা হয়েছে। বেদান্তের অধ্যয়ন ও তার অনুধাবনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায় : এই অধ্যায়ে শাসকের নীতিমালা, দণ্ডবিধি, সেনাপতির নীতিমালা ও মানবজীবনের দুঃখ-দুর্দশার বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায় : এই অধ্যায়ে বিচারব্যবস্থার নীতিমালা, গুজব রটনাকারীর শাস্তি ও সম্রাটের আনুগত্যের ধরনগুলোর আলোচনা করা হয়েছে।

নবম অধ্যায় : এই অধ্যায়ে নারী-পুরুষের বিধিবিধান ও সম্রাটের আচারবিধির আলোচনা করা হয়েছে।

দশম অধ্যায় : এই অধ্যায়ে হিন্দুসমাজের চারটি স্তরের দায়িত্ব ও কর্তব্যের আলোচনা করা হয়েছে। এর আলোচনা সামনে তুলে ধরা হবে।

একাদশ অধ্যায় : এই অধ্যায়ে সাধুদের বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা ও দরিদ্রতার বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

দ্বাদশ অধ্যায় : এই অধ্যায়ে মৃত্যুপরবর্তী পরিণতি ও চিত্তের অস্থিরতা থেকে মুক্তির উপায়ের আলোচনা করা হয়েছে।

এটিই হিন্দুধর্মের বিধিবিধান-সংবলিত গ্রন্থ মনুস্মৃতি। পাঠক, সামনের অধ্যায়গুলোতে এই গ্রন্থের বহু উদ্ধৃতি দেখতে পাবেন। এটি হিন্দুধর্মের বিধিবিধান সংকলন, যা বেদসমূহের মূলতত্ত্ব থেকে সংকলিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হিন্দুসমাজের শ্রেণিবিন্যাস

হিন্দু ধর্মবিশ্বাসের চরম আপত্তিকর বিষয়টি হচ্ছে, মানুষের মধ্যকার শ্রেণিবিন্যাস। আর্যধর্ম মানবসম্প্রদায়কে চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করে প্রতিটি শ্রেণির আলাদা নীতিমালা ও দায়িত্ব নির্ধারণ করে দিয়েছে। এই শ্রেণিবিভাজনে তারা ব্রাহ্মণদের সর্বাধিক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী সাব্যস্ত করেছে। ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠ মানবসম্প্রদায় হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তাদের বিশ্বাসমতে, এ সম্প্রদায় ঈশ্বর ব্রহ্মার সত্তা থেকে অস্তিত্ব লাভ করেছে। তিনি এ সম্প্রদায়ের উৎস, যারা একসময় উর্ধ্বজগতের সত্তায় একীভূত হয়ে যাবে। অন্যদিকে শূদ্রদের অস্পৃশ্য বিবেচনা করে মানবজাতির নিকৃষ্ট শ্রেণি হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এদের মানবিক মর্যাদা থেকে বিচ্যুত করে প্রাণিতুল্য বা এর চেয়েও নিকৃষ্টতম হিসেবে বিবেচনা করে। তারা গাভিকে পবিত্র ও সম্মানিত মনে করে, এর উপাসনা করে। অন্যদিকে শূদ্র সম্প্রদায়কে তুচ্ছজ্ঞান করে।

তাদের এই শ্রেণিভেদ মানবসম্প্রদায়ের জন্য জঘন্যতম অবিচার। এই সম্প্রদায়কে এই অবিচার থেকে বাঁচাতে ইসলামের মহানুভবতার প্রতি তাদের আহ্বান করতে হবে। এ ছাড়া কোনো উপায় নেই। কেননা, ইসলাম একমাত্র খোদাভীরুতাকেই মানুষের সম্মানের মানদণ্ড স্থির করেছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

> নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত, যে সর্বাধিক খোদাভীরু। [সুরা হুজুরাত : ১৩]

তাদের সম্মানিত গ্রন্থ ঋগ্বেদে মানবজাতির মধ্যে শ্রেণিবিভাজনের মূল উৎস। পরে মনুর নীতিমালায় এর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ তুলে ধরে প্রত্যেক শ্রেণির আলাদা দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে।

ঋগ্বেদে যা বলা হয়েছে, 'ঈশ্বর তার মুখমণ্ডল থেকে ব্রাহ্মণদের সৃষ্টি করেছেন।

ক্ষত্রিয়দের সৃষ্টি করেছেন তার বাহু থেকে। নিজের উরু থেকে সৃষ্টি করেছেন বৈশ্যদের; আর শূদ্রদের সৃষ্টি করেছেন নিজের পা থেকে।'[২৫]

এটাই হচ্ছে *ঋগ্‌বেদের* ভাষ্য। এটাই হিন্দুসমাজে শ্রেণিবৈষম্যের মূলতত্ত্ব। যত দিন হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থে এসবের দীক্ষা থাকবে, হিন্দুদের মধ্যে শ্রেণিবিভাজনের এই ধারাও চলমান থাকবে এবং তা মুছে ফেলার প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

হিন্দু পণ্ডিতরা শূদ্র সম্প্রদায়কে 'চণ্ডাল' তথা তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট মানব নামে অভিহিত করে। *উপনিষদ* গ্রন্থসমূহে বিভাজনের স্তরগুলোকে বলা হয়েছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও চণ্ডাল।

এমনকি হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহ বিভিন্ন জায়গায় শূদ্র সম্প্রদায়ের আলোচনা এমনভাবে এড়িয়ে যায়, যেন তারা মানবসম্প্রদায়ের অংশই নয়!

হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলো ব্রাহ্মণদের অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান দিয়েছে। তাদের সব ধরনের জবাবদিহিতার উর্ধ্বে রেখেছে, যেন তারা ঐশীসত্তা। *ঋগ্‌বেদের* একটি শ্লোকে বলা হয়েছে, 'ব্রাহ্মণ পুরুষই পৃথিবীপৃষ্ঠের নারীদের প্রকৃত স্বামী, যদিও সে কোনো ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের বিবাহিতা হয়!'[২৬] অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ ব্যক্তি পৃথিবীর যেকোনো নারীকে বিয়ে করতে পারে, এমনকি যদি সে নারী কোনো ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের বিবাহিতা হয়, তবুও। কেননা, ব্রাহ্মণ পুরুষই নারীকুলের প্রকৃত স্বামী!

এখানে শূদ্রদের অতি তুচ্ছজ্ঞান করে তাদের আলোচনা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। অপরদিকে ব্রাহ্মণ যেহেতু বিনা দ্বিধায় ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের স্ত্রীকে বিয়ে করতে পারে, শূদ্রের স্ত্রীকে আরও সহজেই বিয়ে করতে পারে।

শতপথব্রাহ্মণ গ্রন্থে বলা হয়েছে, সম্রাট শর্যাতির সুকন্যা নাম্নী কন্যা চ্যাবন (Chayawan) নামের জনৈক ঋষির বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি অন্য ব্রাহ্মণ পুরুষের বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হন।[২৭] একইভাবে রথবিতির কন্যা শায়াবৈশ্য নামের এক ব্যক্তির স্ত্রী ছিলেন। এরপর তিনি জনৈক ব্রাহ্মণের সঙ্গে বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হন।[২৮]

এভাবেই হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোতে আমরা দেখতে পাই, আর্যরা ব্রাহ্মণদের হাতে অন্যান্য শ্রেণির মানুষের নেতৃত্বের ভার অর্পণ করেছে এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের

[২৫] *ঋগ্‌বেদ* : ১০/৯০/১২।
[২৬] *অথর্ববেদ* : ৪/২৪-২৫।
[২৭] *শতপথ ব্রাহ্মণ* : ৪/১, ৫, ৭।
[২৮] *প্রহাদয়োতা* : ৫/৫০।

ব্যক্তিদের চরমভাবে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছে। তারা মানুষের মধ্যে এ কথার প্রচার করেছে যে, 'ব্রাহ্মণরা স্রষ্টা ব্রহ্মার বংশোদ্ভূত। কেউ তাদের সমালোচনা বা তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে পারবে না। এমনকি ব্রাহ্মণরা তাদের মর্যাদা-বহির্ভূত কোনো কাজ করলেও না।'

তবে মানবেতিহাসের সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হচ্ছে, বিজয়ী সম্মানের আসন নেবে আর বিজিত অস্পৃশ্য বিবেচিত হবে; অথচ ইতিহাস আমাদের এ কথার জানান দেয় যে, প্রায়ই বিজিতরা বিজয়ীদের ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে।

এবার হিন্দুধর্মের এই শ্রেণিবিভাজনে প্রতিটি শ্রেণির দায়িত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করা যাক, যাতে পাঠক সহজেই হিন্দুসমাজের অস্পৃশ্য সে-সকল মানুষের ব্যাপারে ধারণা পাবেন, ভারতজুড়ে যাদের সংখ্যা প্রায় ২০ কোটি।[২৯]

এক. ব্রাহ্মণ

মনুস্মৃতির (Manusmriti) ভাষ্যমতে ব্রাহ্মণদের করণীয় হচ্ছে :

- ব্রাহ্মণরা *বেদ* গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন এবং এর শিক্ষা ধারণ করবে।[৩০]
- ব্রাহ্মণরা হিন্দুসমাজের অন্যান্য শ্রেণির নেতৃত্ব দেবে।[৩১]
- ব্রাহ্মণরা সবসময় সম্মান ও স্রষ্টার আসনে অবস্থান করবে। এমনকি তারা নিজেদের মর্যাদা-বহির্ভূত কোনো কাজে লিপ্ত হলেও।[৩২]
- অগ্নি মহান ঈশ্বর হিসেবে যেভাবে গণ্য হন, তেমনি ব্রাহ্মণদেরও মহান স্রষ্টার সত্তা জ্ঞান করতে হবে।[৩৩]
- ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠ দায়িত্ব হচ্ছে *বেদের* জ্ঞান লাভ করা। ক্ষত্রিয়দের সেরা কাজ মাতৃভূমির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা; আর বৈশ্যদের উত্তম কাজ ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত থাকা।[৩৪]
- ব্রাহ্মণ ব্যক্তির কোনোকিছুর প্রয়োজন দেখা দিলে সে বিনা সংকোচে তা কারও কাছে চেয়ে নিতে পারবে। এটি দূষণীয় কিছু নয়। একইভাবে সে

[২৯] ২০১১ খ্রিষ্টাব্দের হিসাব অনুযায়ী।—অনুবাদক।
[৩০] দশম অধ্যায় : ১।
[৩১] প্রাগুক্ত : ৩।
[৩২] নবম অধ্যায় : ৩১৯।
[৩৩] প্রাগুক্ত : ৩১৭।
[৩৪] দশম অধ্যায় : ৮০।

নিজের প্রয়োজনে অন্যদের সম্পদও লুটে নিতে পারবে।[৩৫]

- ব্রাহ্মণ ব্যক্তির যদি সব শ্রেণির একাধিক স্ত্রী থাকে, তাহলে মৃত্যুর পর তার সম্পত্তি সাড়ে সাত ভাগে বণ্টিত হবে। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ স্ত্রী পাবে তিন ভাগ, ক্ষত্রিয় স্ত্রী পাবে দুই ভাগ, বৈশ্য স্ত্রী পাবে দেড় ভাগ আর শূদ্র স্ত্রী পাবে মাত্র একভাগ।[৩৬]
- ব্রাহ্মণ ব্যক্তি যত জঘন্য অপরাধেই লিপ্ত হোক, শাসক তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারবে না। তবে প্রয়োজনে তাকে নির্বাসিত করা যাবে; কিন্তু তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা যাবে না এবং তাকে কোনো কষ্ট দেওয়া যাবে না।
- শাসক ব্রাহ্মণ ব্যক্তির বরাদ্দ কমাতে পারবে না। এমনকি দুর্ভিক্ষ চলাকালেও না। অন্যথায় তার শাসন ধ্বংস হয়ে যাবে।[৩৭]
- ব্রাহ্মণ শিশু ১০ বছর বয়সে উপনীত হলে অন্যদের চেয়ে সম্মানিত বলে বিবেচিত হবে। এমনকি শতবর্ষী ব্যক্তির চেয়েও।[৩৮]

দুই. ক্ষত্রিয়

এই শ্রেণি রাজপুত নামেও পরিচিত। এরা প্রাচীন রাজপুত অঞ্চলের বংশোদ্ভূত। রাজপুত নামক বিশাল অঞ্চলটি সিন্ধ থেকে আগ্রা ও দক্ষিণে পাঞ্জাব থেকে গোয়ালিয়র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ভারতের অধিকাংশ রাজন্যবর্গ ছিলেন রাজপুত ঘরানার। এরা ছিল মরুভূমিতে বসবাস করা শক্তিমত্তার অধিকারী জাতি। এদের জীবন ছিল অনেকটা যাযাবরের মতো। এদের দখলে থাকা প্রসিদ্ধ শহরগুলো ছিল লাহোর, দিল্লি, কনৌজ ও অযোধ্যা। রাজপুতরা খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ শতকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল এবং সুলতান জালালুদ্দিন আকবরের (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রিষ্টাব্দ) আমলে তারা পরাজিত হয়।

আর্যরা ভারত বিজয়ের পর অভ্যন্তরীণ বিবাদ দমনের লক্ষ্যে রাজপুতদের শাসক হিসেবে নিযুক্ত করে এবং নিজেরা তাদের উপদেষ্টা ও মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করে। রাজপুতরা শারীরিক দিক দিয়ে সুঠামদেহী হলেও বুদ্ধিবিবেচনায় ছিল একেবারে দুর্বল। অপরদিকে আর্যরা তাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙেই ভারতজুড়ে আধিপত্য

[৩৫] প্রাগুক্ত : ১০৩-১০৪।
[৩৬] নবম অধ্যায় : ১৫১-১৫২।
[৩৭] প্রাগুক্ত : ৩১৩।
[৩৮] দ্বিতীয় অধ্যায় : ১৩৫।

বিস্তার করে এবং নিজেদের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে। তারা ক্ষত্রিয়দের জন্য কিছু ধর্মীয় দায়িত্ব নির্ধারণ করে, যা অনেকটা রাজকীয় আচারবিধির মতোই। তাদের জন্য যেসব আচারবিধি নির্ধারিত ছিল, সেগুলো দেখে নেওয়া যাক :

- ক্ষত্রিয়দের থেকেই সম্রাট নিযুক্ত হবেন।
- যাদের মধ্যে বেদের শিক্ষা স্থান লাভ করবে, তারা শাসক, সেনাপতি ও বিচারক হওয়ার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে।
- ব্রাহ্মণ ব্যক্তি উত্তরাধিকারীহীন মৃত্যুবরণ করলে সম্রাট তার সম্পদ রাজকোষে জমা নিতে পারবে না; কিন্তু অন্য শ্রেণির কেউ উত্তরাধিকারী না রেখে মারা গেলে তার সম্পদ রাজকোষে জমা নেওয়া হবে।
- সম্রাট চোরের হাত কেটে শূলে চড়ানোর নির্দেশ দেবেন।
- সম্রাট প্রথমবার চোরের আঙুল কাটার আদেশ দেবেন। আবারও চুরি করলে তার উভয় হাত-পা কাটার আদেশ দেবেন। তৃতীয়বার চুরি করলে তাকে হত্যার নির্দেশ দেবেন। চোরকে যে আশ্রয় দেবে, তার খাদ্য ও পোশাকের ব্যবস্থা করবে, চুরির মাল রক্ষণাবেক্ষণ করবে, তাকেও চোরের মতোই দণ্ড দেওয়া হবে।
- যে কর্মকর্তা ঘুস গ্রহণ করবে, তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হবে।
- সরকার বৈশ্যের বাণিজ্যিক সম্পদের অষ্টমাংশ ও কৃষিপণ্যের দশমাংশ আদায় করবে।

তিন. বৈশ্য

এদের তুরানিও বলা হয়। এরা তুর্কিস্তানের বংশোদ্ভূত। কয়েক হাজার বছর পূর্বে তারা যখন ভারতবর্ষে এসেছিল, তখন ভারতের স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। শেষে শারীরিকভাবে অপেক্ষাকৃত শক্তিমান ও সমরবিদ্যায় অগ্রসর এই জাতির সামনে ভারতের স্থানীয় অধিবাসীরা পরাজয় বরণ করে। এরপর আর্যদের সঙ্গে তুরানিদের সাক্ষাৎ হলে তারা রাজনৈতিক বিবেচনায় এদের সঙ্গে মিত্রতা করে। তারা দক্ষতাবিবেচনায় ব্যবসা ও কৃষিকাজের দায়িত্ব এদের ওপর অর্পণ করে। মনুর নীতিমালায় এদের জন্য নির্ধারিত দায়িত্বগুলো ছিল অনেকটা নিম্নরূপ :

- বৈশ্যরা কৃষি ব্যবস্থাপনা, বাণিজ্য ও পশুপালনের দায়িত্ব পালন করবে।
- কোনো বৈশ্য অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়লে সে শূদ্রদের অনুরূপ ব্রাহ্মণদের

সেবামূলক কাজে নিযুক্ত হতে পারবে। তবে একান্ত প্রয়োজন না হলে এমন কাজ এড়িয়ে চলবে।

- বিয়ের পর বৈশ্যদের জন্য তার নির্ধারিত দায়িত্ব ও পশুপালনের মাধ্যমে খাদ্যসংস্থান করা আবশ্যক। কেননা, ঈশ্বর যেভাবে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের কাছে সকল সৃষ্টজীবের দায়িত্ব দিয়েছেন, একইভাব বৈশ্যকে দিয়েছেন প্রাণিকুলের প্রতিপালনের দায়িত্ব।
- বৈশ্যকে অবশ্যই মণি-মুক্তা, হীরা, খনিজ পদার্থ, পোশাক, সুগন্ধি ও মসলাসামগ্রীর মূল্য সম্পর্কে জ্ঞান রাখতে হবে।
- একইভাবে তাকে বীজ বপন, জমির পরিচর্যা ও পরিমাপ সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে।
- এর পাশাপাশি তাকে মসলা সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখতে হবে। বাণিজ্যিক কলাকৌশল ও পশু প্রতিপালনের পদ্ধতি সম্পর্কেও জ্ঞান রাখতে হবে।
- তাকে বিভিন্ন কাজ ও সেবাদানের পদ্ধতি জানতে হবে। একইভাবে তাকে একাধিক ভাষায় পারদর্শী হতে হবে। লেনদেনের নীতিমালা জানতে হবে।
- তাকে বৈধ পদ্ধতিতে সম্পদবৃদ্ধি ও সকল সৃষ্টির খাদ্য জোগানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে।

চার. শূদ্র

এরা মূলত ভারতবর্ষের আদি অধিবাসী ও তুরানি সম্প্রদায়ের একটি অংশ। হাজার বছর ধরে তারা আর্যদের বিরুদ্ধে লড়াই শেষে পরাজিত হয়ে আর্যদের হাতে বন্দি হয়। আর্যরা তাদের ওপর ভয়াবহ নিপীড়ন চালায়। যারা বেঁচে গিয়েছিল, তারা বিভিন্ন পাহাড় ও জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাদেরই অপর একটি অংশ উত্তর-ভারতে পালিয়ে যায়। আর্যরা তাদের মন থেকে সম্মানজনক স্বাধীন জীবনযাপনের অভিলাষ মুছে দেওয়ার যাবতীয় চেষ্টা করেছিল। এ লক্ষ্যে মনুর নীতিমালায় আর্যরা তাদের জন্য বেশ কিছু ধর্মীয় দায়িত্ব-কর্তব্য চাপিয়ে দেয়। তবে দক্ষিণ ভারতে এ সম্প্রদায়ের সঙ্গে আর্যদের সংঘাত অব্যাহত থাকে।

পাঠকের সামনে এ শ্রেণির প্রতি আর্যদের বিদ্বেষ ও ঘৃণার কিছু নমুনা তুলে ধরা হলো :

- চণ্ডাল তথা শূদ্রশ্রেণির লোকেরা শহরের বাইরে বসবাস করবে। তারা মাটির পাত্র ব্যবহার করবে। পশুপালনে তারা শুধু গাধা ও কুকুর পালন

করতে পারবে। মৃতদের কাফনসদৃশ পোশাক ব্যবহার করতে পারবে। অলংকার হিসেবে শুধু লোহা ব্যবহার করতে পারবে। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করতে পারবে না। তারা শুধু নিজেদের মধ্যেই লেনদেন করতে পারবে এবং রাতে কোনো শহরে বা গ্রামে চলাফেরা করতে পারবে না।[৩৯]

- ব্রাহ্মণদের মনঃকষ্টের কারণ হওয়ায় শূদ্ররা নিজেদের প্রয়োজনের অধিক সম্পদ সঞ্চয় করতে পারবে না।[৪০]
- শূদ্রের যদি কোনো ব্রাহ্মণের সেবা করার সৌভাগ্য না হয়, তাহলে সে কোনো ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের সেবায় জীবন কাটিয়ে দেবে। তবে পরকালের মুক্তির জন্য কোনো ব্রাহ্মণের সেবা করা আবশ্যক। কেননা, এটি তার শ্রেষ্ঠ কাজ। শূদ্রের জন্য কোনো ধর্মীয় কাজে অংশগ্রহণ বৈধ নয়।[৪১]
- ব্রাহ্মণদের সেবার মধ্যেই শূদ্রের পরকালীন মুক্তি নিহিত।[৪২]
- যে শূদ্র ব্রাহ্মণের অধীনে জীবন কাটাবে, সে পরবর্তী জীবনে এর চেয়ে উন্নত শ্রেণিতে জন্মগ্রহণ করবে।[৪৩]
- যে শূদ্র ব্রাহ্মণের কাছ থেকে মুক্তি চাইবে, সে বিচারের মুখোমুখি হবে এবং তার ওপর কঠিন বিপদ আপতিত হবে।[৪৪]
- ব্রাহ্মণের শূদ্র স্ত্রীর গর্ভে জন্ম নেওয়া সন্তান উত্তরাধিকার লাভ করবে না।[৪৫]
- ঈশ্বর শূদ্রকে উপর্যুক্ত তিন শ্রেণির সেবা করার নির্দেশ দিয়েছেন, এতে সে কোনো সংকোচ অনুভব করতে পারবে না।[৪৬]

এই ছিল হিন্দুসমাজের চারটি শ্রেণির দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিবরণ। পাঠক সহজেই এ থেকে ভারতের স্থানীয় অধিবাসী শূদ্রদের ওপর হিন্দুদের নিপীড়নের চিত্র অনুধাবন করতে পেরেছেন। শূদ্ররা ছিল সেই জাতি, যারা আর্যদের মোকাবিলায় বুখে দাঁড়িয়েছিল। শত শত বছর ধরে তাদের সামনে সুদৃঢ় প্রাচীরের মতো

[৩৯] দশম অধ্যায় : ৫১-৫৪।
[৪০] প্রাগুক্ত : ১২৯।
[৪১] প্রাগুক্ত : ১২১-১২২, ১২৪।
[৪২] নবম অধ্যায় : ৩৩৪।
[৪৩] প্রাগুক্ত : ৩৩৫।
[৪৪] প্রাগুক্ত : ২৪৮।
[৪৫] প্রাগুক্ত : ১৫৫।
[৪৬] প্রথম অধ্যায় : ৯১।

অবস্থান করেছিল। তবে তাদের এই প্রতিরোধযুদ্ধ ব্যর্থ হয়; আর হানাদাররা বিজয় লাভ করে। স্থানীয়দের ওপর নেমে আসে চরম অত্যাচার। তাদের বীরত্ব ও সাহসিকতা সত্ত্বেও মুখোমুখি হতে হয় কঠিন শাস্তির।

আজও ভারতজুড়ে এই শ্রেণিবিভাজন নীতি অব্যাহত রয়েছে। অতীতে এই নিপীড়িত শ্রেণির প্রতি চরম বৈষম্যমূলক আচরণ করা হতো। আমি আমার মানসপটে দাগ কাটা একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রখ্যাত আইনপ্রণেতা ড. আম্বেডকর তাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী ভারতের সংবিধান-প্রণেতাদের একজন ছিলেন। অনেক পড়াশোনা ও গবেষণার পর অন্যদের তুলনায় ইসলামের প্রতি বেশ অনুরাগী হয়েছিলেন। তিনি ভারতের একটি হিন্দি দৈনিকে ঘোষণা দিয়েছিলেন, 'পৃথিবীপৃষ্ঠে ইসলামের চেয়ে উন্নত কোনো ধর্ম নেই; কিন্তু মুসলমানরা তাদের ধর্মকে বহুভাগে বিভাজন করে ফেলেছে। তাদের এক দল অপর দলকে ধর্মত্যাগী মনে করে। তাই ইসলাম গ্রহণেও আমাদের বিশেষ কোনো লাভ নেই। কেননা, তখনো আমরা আগের মতোই দ্বিধাবিভক্ত থেকে যাব।' পরে তিনি তার অনুসারীদের বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হওয়ার নির্দেশ দেন।[৫৭]

এরপর কী ঘটেছিল? চলমান শতকের (বিংশ শতক) আশির দশকের শুরুতে তামিলনাড়ুতে অস্পৃশ্যদের বড় একটি দল ইসলামে প্রবেশ করে। এতে ভারতজুড়ে চরম হইচই শুরু হয়। একনজরে সেসব ঘটনা দেখে আসি :

তামিলনাড়ু

তামিলনাড়ু : ভারতের দক্ষিণ সীমান্তে অবস্থিত একটি অঞ্চল।

জনসংখ্যা : তামিলনাড়ুর জনসংখ্যা প্রায় ৪ কোটি ৮০ লাখ।

মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৩০ লাখ। খ্রিষ্টান অধিবাসীদের সংখ্যা প্রায় ৩২ লাখ; আর অবশিষ্টদের মধ্যে ১ কোটি অস্পৃশ্য নিম্নশ্রেণির হিন্দু।

চলমান শতকের প্রথমার্ধে রামাস্বামী নাইকার (Ramaswami Naicker) অস্পৃশ্যদের অবস্থার ব্যাপক উন্নয়নের প্রকল্প হাতে নেন। এ লক্ষ্যে তিনি দ্রাবিড়ার কাজাগাম (Dravidar Kazhagam) নামের একটি সংগঠনের গোড়াপত্তন করেন। তার পরিকল্পনা সফল হয়। এতে দলিতরা খ্রিষ্ট, বৌদ্ধ ও ইসলাম সম্পর্কে অধ্যয়নের সুযোগ পায়। খ্রিষ্টান ও বৌদ্ধধর্মের বিপরীতে তাদের অনেকেই ইসলামের প্রতি অনুরাগী হয়ে ওঠে। কেননা, ইসলামে স্রষ্টার অস্তিত্বের

[৫৭] *জামানদার পত্রিকা* : ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দ।

ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা রয়েছে। এর পাশাপাশি ইসলাম সকল মানুষের মধ্যে সাম্যের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেছে। অবশ্য তাদের এই ইসলামগ্রহণ সংঘবদ্ধরূপে ছিল না। বিগত বছরগুলোতে আলিম ও দায়িগণ ব্যাপক পরিসরে দাওয়াত ও তাবলিগের কাজে মনোনিবেশ করেন। তারা তামিল ভাষায় ইসলামি অনেক গ্রন্থও প্রকাশ করেছেন। এর ফলে মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে শুরু করে। তাদের এভাবে দলে দলে ইসলামগ্রহণের সংবাদ ভারতজুড়ে ব্যাপক হইচই ফেলে দেয়।

চলুন, ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের চোখে এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া দেখে আসি,

১. তামিল সংবাদমাধ্যম

তামিলনাড়ুর *Daily Dina Malar* পত্রিকা ২৯ জুন ১৯৮১ 'মিনাকাশিপুরাম[৫৮] থেকে আমাদের প্রাপ্ত শিক্ষা' শিরোনামে লিখেছিল,

> *মিনাকাশিপুরামের জনসংখ্যা ৯৪৫ জন। তন্মধ্যে ৫৫৮ জন ইসলাম গ্রহণ করে। তাদের শিক্ষা-সংস্কৃতির মান অন্যদের চেয়ে উন্নত। তাদের মধ্যে দুজন ডাক্তার, একজন ইঞ্জিনিয়ার ও বেশ কয়েকজন প্রফেসর রয়েছেন। ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১ তারা তাদের গ্রামের নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম হিসেবে 'রহমতনগর' স্থির করে। তাদের বলা হয়েছিল, 'ভারত সরকার তোমাদের সব ধরনের সরকারি সুযোগ-সুবিধা বাতিল করে দেবে।' তখন তারা সমস্বরে বলেছিল, 'আমরা সম্মানের জীবনযাপনের জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমরা সব ধরনের সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে প্রস্তুত!'*

একই পত্রিকা ২৫ জুন ১৯৮১ সংখ্যায় লিখেছিল,

> *জনৈক সরকারি কর্মকর্তা ঘোষণা দিয়েছে, দলিতদের ইসলামগ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকার তাদের জন্য বরাদ্দকৃত সব সরকারি সুবিধা বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এসব সুবিধার মধ্যে রয়েছে—বিনা মূল্যে শিক্ষা, উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা, বিনা মূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ, সরকারি চাকরিতে ১৮% সংরক্ষিত কোটা। এর পাশাপাশি সরকারিভাবে তাদের কৃষিকাজ ও বাসস্থান নির্মাণের জন্য ঋণ প্রদান করা হয়। যারা ইসলাম গ্রহণ করবে, তারা এসব সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে।*

[৫৮] দক্ষিণ ভারতের একটি গ্রাম। এর অধিকাংশ অধিবাসী ইসলাম গ্রহণ করে। তাঁরা গ্রামটির নাম পরিবর্তন করে 'রহমতনগর' রাখেন।

পত্রিকাটি ২৭ জুন ১৯৮১ ইসলামে দীক্ষিত কিছু নওমুসলিমের সাক্ষাৎকার প্রকাশ করে। তাঁদের মধ্যে আহমাদ নামের একজন বলেছিলেন,

> *আমি গতকাল পর্যন্ত মুরুগান[৯] 'Murugan'-এর উপাসনা করতাম। আজ আমি এক আল্লাহর ইবাদত করছি, যাঁর কোনো অংশীদার নেই। তাঁর হাতেই জীবন-মৃত্যু। আমি নিয়মিত মসজিদে যাই এবং মুসলমানদের সঙ্গে সালাত আদায় করি। আমার ঘরে কেউ ইসলাম গ্রহণ করেনি; কিন্তু এ কারণে আমি কারও প্রতি বিরূপও নই।*

পত্রিকাটি আরও বলেছে, যারা ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে, তাঁরা নিজেদের সামাজিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছে। তারা নিজেদের ইসলামি প্রজন্মরূপে গড়ে তুলেছে।

ইসলামে দীক্ষিত জনৈক নওমুসলিম ভারত সরকারের পক্ষ থেকে তাদের ওপর আরোপিত এই অপবাদের চরমভাবে বিরোধিতা করে বলেছেন যে—তারা অর্থের জন্য ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে! তিনি বলেন, 'কেউ যদি এ কথার প্রমাণ করতে পারে, আমি ইসলামগ্রহণের বিনিময়ে কোনো ধরনের আর্থিক সাহায্য নিয়েছি, তাহলে আমি মৃত্যুদণ্ড মেনে নিতে প্রস্তুত।' তিনি আরও বলেন, 'ভারতবাসী যদি নিরাপত্তা ও শান্তিতে বসবাস করতে চায়, তাহলে তাদের ইসলামে দীক্ষিত হওয়া উচিত।'

এই হচ্ছে তামিল গণমাধ্যমের কিছু ভাষ্য।

২. উর্দু সংবাদমাধ্যম

কট্টর হিন্দু সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত উর্দু সংবাদপত্র *প্রতাপ* দলিতদের ইসলামগ্রহণের ধারা শুরু হওয়ার পর থেকেই মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা চালাতে শুরু করে। পাঠকসমীপে এখানে পত্রিকাটির কিছু ভাষ্য তুলে ধরা হচ্ছে :

১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দের ২ জুন পত্রিকাটি লিখেছিল,

> *দলিতদের ব্যাপকহারে ইসলামে দীক্ষিত হওয়া হিন্দু-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রের অংশ। আর্যসমাজের তিনজন বড় নেতা ভারত সরকারের কাছে আর্যদের মধ্যে ইসলাম-প্রসারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি করেছেন। অন্যথায় আর্যসমাজ এর বিরুদ্ধে নিজেরাই ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে। তারা দক্ষিণ-ভারতে নওমুসলিমদের মধ্যে ইসলামি শিক্ষার প্রচার নিয়ে কাজ করা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধের দাবি করেছেন।*

[৯] হিন্দু ধর্মমতে যুদ্ধের দেবতা কার্তিক। তামিল ভাষায় তাকে 'মুরুগান' নামে অভিহিত করা হয়।—অনুবাদক।

২৩ মে ১৯৮১ পত্রিকাটি 'মিনাকাশিপুরামে কী ঘটেছিল' শিরোনামে লিখেছিল,

> *মিনাকাশিপুরামে দলিতদের ইসলামগ্রহণ ভারতজুড়ে ব্যাপক শোরগোলের জন্ম দিয়েছে। হিন্দু সংগঠনগুলো এসব নওমুসলিমদের খোঁজখবর নিয়ে জানতে পেরেছে, এদের ইসলামগ্রহণের পেছনে বহিঃরাষ্ট্রের হিন্দুবিরোধী ষড়যন্ত্র কাজ করেছে। তারা বলেছে, 'আরব রাষ্ট্রগুলো দলিতদের ইসলামে দীক্ষিত করতে অঢেল সম্পদ ব্যয় করছে।' তারা আরও বলেছে, 'আমরা জানতে পেরেছি, হাজার হাজার হিন্দু নারী ইতিমধ্যে আরব দেশগুলোতে গৃহকর্মী হিসেবে নিযুক্ত হয়েছে। হয়তো তারাও অচিরেই ইসলামগ্রহণ করবে।'*

১৫ জুন ১৯৮১ পত্রিকাটি 'হিন্দুদের সচেতন হওয়া উচিত' শিরোনামে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করে। পত্রিকাটি সেখানে হিন্দুদের কাছে আবেদন করে, তারা যেন দলিতদের প্রতি ঘৃণার মানসিকতা পরিহার করে, অন্যথায় ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার প্রবণতা তাদের মধ্যে আরও বৃদ্ধি পাবে।

ভারতজুড়ে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা তৈরিতে *প্রতাপ* পত্রিকাটি এমন ঘৃণ্য মিথ্যাচারের আশ্রয় নেয়।

২১ জুন ১৯৮১ *হায়াত* নামক একটি সংবাদপত্র 'দলিতদের ইসলামগ্রহণ নিয়ে শোরগোল কেন' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে। পত্রিকাটি প্রশ্ন তুলেছিল,

> *ভারতজুড়ে দলিতদের অবস্থান কী পশুদের চেয়েও জঘন্য ছিল না? স্বাধীনতার পরে ভারত সরকার এদের অবস্থার উন্নয়নে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল? আর যখন এই দলিত শ্রেণি ধর্মীয় নিপীড়ন থেকে মুক্তি পেতে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে, তখন কেন চতুর্দিকে শোরগোল ও চ্যাঁচামেচি শুরু হয়েছে?*

জামায়াতে ইসলাম হিন্দ প্রকাশিত দৈনিক *দাওয়াত* পত্রিকা 'হিন্দুদের নিপীড়নের শিকার দলিতদের ইসলাম গ্রহণ' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে। সেখানে বলা হয়েছিল,

> *মিনাকাশিপুরামের নওমুসলিমরা তাদের অঞ্চলের নাম পরিবর্তন করে 'রহমতনগর' রেখেছে। আর্যসমাজের একটি দল এ-সকল নওমুসলিমের হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করতে বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে।*

৩. ইংরেজি গণমাধ্যম

মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত *ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের* একজন প্রতিনিধি ব্যাপকভাবে ইসলামে দীক্ষিত অঞ্চলগুলো ভ্রমণ করেন। ১৭ জুন ১৯৮১ দীর্ঘ এক প্রবন্ধে তিনি সেসব অঞ্চলের একটি চিত্র তুলে ধরেন। সেই প্রতিনিধির দেওয়া প্রতিবেদনের চুম্বকাংশ পাঠকের সামনে তুলে ধরছি :

> *নতুনভাবে ইসলামে দীক্ষিতরা বেশ জোরেশোরে এ কথার বিরোধিতা করেছে যে, তাদের জোরজবরদস্তি করে ইসলামে দীক্ষিত করা হয়েছে বা ইসলামগ্রহণের বিনিময়ে তাদের কোনো ধরনের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। তারা বলেছে, 'আমরা স্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছি এবং এটাও বুঝেছি যে, ইসলাম সত্যধর্ম। মানুষ অন্যান্য ধর্মের ধর্মীয় নিপীড়ন থেকে মুক্তি পেতে ইসলামের সাম্যের বাণী গ্রহণ করে। অসংখ্য স্রষ্টার উপাসনা থেকে মুক্তি পেতে এক ও অদ্বিতীয় স্রষ্টার কাছে নিজেকে সমর্পিত করে। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। খোদাভীরুতার মাধ্যমেই মানুষের মর্যাদা নিরূপিত হয়।'*

প্রতিবেদনটিতে আরও বলা হয়,

> *স্থানীয় মুসলমানরা নওমুসলিমদের সাদরে গ্রহণ করেছে। ফলে তাদের জীবনব্যবস্থা উত্তরোত্তর উন্নত হচ্ছে। অন্যদিকে এ অঞ্চলের অধিবাসীরা অচিরেই আরও ব্যাপকভাবে ইসলামগ্রহণ করতে পারে বলে হিন্দুরা শঙ্কিত হয়ে পড়েছে। হয়তো ভবিষ্যতে এখানে হিন্দুধর্মের অনুসারী খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হবে।*

প্রতিবেদনটিতে আরও বলা হয়েছে,

> *নওমুসলিমদের হিন্দু আত্মীয়স্বজনও এদের অবস্থার পর্যবেক্ষণ করছে। যদি ইসলামগ্রহণের পর এদের অবস্থার উন্নতি হয়, তাহলে অচিরেই হয়তো তারাও ইসলামে দীক্ষিত হবে।*

হিন্দু ধর্মগুরুরা যদিও এর পেছনে আর্থিক লোভ-লালসা বা ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগ তুলেছেন; কিন্তু সেই প্রতিবেদক তা মানতে নারাজ।

পত্রিকাটি ২১ ও ২৩ জুন ১৯৮১ প্রতিবেদনে বলেছে,

> *হিন্দু সংগঠনগুলো নতুনভাবে ইসলামে দীক্ষিত এ-সকল ব্যক্তির পুনরায় হিন্দুধর্মে প্রত্যাবর্তন করাতে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করছে।*

৩০ জুন ১৯৮১ পত্রিকাটি লিখেছে,

> *তামিলনাড়ুতে যা ঘটেছে, এ সবই ছিল দলিতদের প্রতি হিন্দুদের নিপীড়নের মন্দ প্রভাব। জনাব ভেলু নামের জনৈক দলিত নেতা ঘোষণা করেছেন, 'আরও ৫০ হাজারের মতো দলিত হিন্দু ইসলামগ্রহণের জন্য প্রস্তুত। তারা মনে করে, ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যা তাদের হিন্দুত্ববাদের অন্ধকার থেকে মুক্তি দিতে সক্ষম।'*

পত্রিকাটির প্রতিবেদক আরও বলেন,

> *আমরা বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে হিন্দুদের প্রতি দলিতদের চরম বিদ্বেষ দেখতে পেয়েছি। তাদের অনেকেই ইসলামগ্রহণের প্রত্যয় প্রকাশ করেছে। ধারণা করা হচ্ছে, এদের অনেকেই নিজেদের নেতৃবৃন্দের কারামুক্তির পর দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করবে।*

কলকাতা থেকে প্রকাশিত সানডে পত্রিকা ০৭ জুন ১৯৮১ তামিলনাড়ুতে ইসলামের ব্যাপক প্রসার নিয়ে একটি বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদনটিতে দলিতদের ইসলাম গ্রহণের কারণগুলো তুলে ধরা হয়।

হিন্দুস্থান টাইমস ০৫ মে ১৯৮১ তারিখে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে লিখেছে,

> *আর্যসমাজ দলিতদের ইসলামগ্রহণের পেছনে মুসলমানদের পক্ষ থেকে জোরজবরদস্তি করার অভিযোগ তুলেছে; কিন্তু ভারত সরকার এ অভিযোগের কোনো ভিত্তি খুঁজে পায়নি।*

পত্রিকাটি আরও বলেছে,

> *ভারত সরকারের হাতে এই মর্মে কোনো প্রমাণ নেই যে, তাদের জোরপূর্বক ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল।*

পত্রিকাটি আরও বলে,

> *এই নওমুসলিমদের যদিও বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলা করতে হচ্ছে। তবু তারা এ ব্যাপারে আস্থাশীল যে, তাদের পরবর্তী প্রজন্ম অচিরেই ইসলামের সুফল ভোগ করবে।*

এই ছিল ভারতের সংবাদমাধ্যমগুলোর প্রতিবেদনের নমুনা।

অপরদিকে এর প্রতিক্রিয়ায় হিন্দুরা ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮১ দিল্লিতে একটি হিন্দু মহাসম্মেলন আহ্বান করে। এতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লক্ষাধিক হিন্দু

অংশগ্রহণ করে। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরণ সিং। তিনি তার সূচনা-বক্তব্যে বলেন, 'হিন্দুদের এভাবে ধর্মান্তরিত হওয়া, বিশেষত ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার ফলে শীঘ্রই বিভিন্ন সমস্যার জন্ম দেবে।' তিনি তার ভাষণে এ কথা মানতে বাধ্য হন যে, হিন্দুরা দলিতদের মানবাধিকার প্রদানে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি এর জন্য দুঃখ প্রকাশ করে হিন্দুদের ঐক্য ও পারস্পরিক সৌহার্দ্যের আহ্বান জানান। নিজেদের মধ্যকার বিভেদ কমিয়ে আনতে ও হিন্দুসমাজের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার তাগিদ দেন।[৪০]

দলিত নেতা জগজ্জীবন রাম অভিযোগ করেন, 'ভারত সরকার উগ্রপন্থি সংগঠন আরএসএসকে এই হিন্দু মহাসম্মেলন আয়োজনের নির্দেশ দিয়েছিল।' তিনি আরও বলেন, 'আমি মনে করি না, ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার ফলে তাদের অর্থনৈতিক বা সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে; কিন্তু এর মাধ্যমে তারা হিন্দুসমাজের নিপীড়ন ও অত্যাচার থেকে মুক্তি পাবে।'[৪১]

আমি মনে করি, এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুত্ববাদ অব্যাহত রাখতে হিন্দুদের সচেতন করা। ভারত উপমহাদেশে হিন্দুত্ববাদের বিরুদ্ধে ইসলামের দাওয়াতি প্রভাবের ব্যাপারে জাগরূক করে তোলা। এ ক্ষেত্রে সম্মেলনটি বেশ সফলতা অর্জন করেছিল। এই সম্মেলনের পর নওমুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে বিভিন্ন উগ্র ধর্মীয় সংগঠনের জন্ম হয়, যারা ইসলামবিরোধী প্রচারণা অব্যাহত রাখে। এ লক্ষ্যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের হিন্দু ধর্মগুরুদের সমন্বয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কর্মযজ্ঞের আয়োজন করা হয়। এতে প্রায় ৩ হাজার হিন্দু পণ্ডিত নাম লেখান। এ সংখ্যা দিন দিন আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এ-সকল হিন্দু পণ্ডিত ও সাধু দলে দলে ভারতের বিভিন্ন বড় শহরে দলিতদের ইসলামগ্রহণে নিরুৎসাহিত করতে বের হন। তারা ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা থাকলেও দলিতদের সঙ্গে পানাহার করেন। এসবের মাধ্যমে তারা দলিতদের প্রতি হিন্দু ভ্রাতৃত্ববোধ ও মানবতাবোধের প্রমাণ উপস্থাপনের চেষ্টা চালিয়েছিলেন।

হিন্দুদের এসব পদক্ষেপ দলিতদের ব্যাপারে মুসলমানদের নতুন করে ভাবতে বাধ্য করেছে।

[৪০] দৈনিক আদ-দাওয়া : ২০/০৯/১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দ।
[৪১] প্রাগুক্ত : ২১/০৯/১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হিন্দু আচারবিধি বা আইনশাস্ত্র

হিন্দুজীবনের চার স্তরের আচারবিধি

হিন্দুধর্ম মানবজীবনকে গড়ে শতবর্ষের হিসাব করে চারটি স্তরে বিভক্ত করে। এর একেকটি স্তর ২৫ বছর নির্ধারণ করে প্রতিটি স্তরের জন্য আলাদা আচারবিধি ধার্য করেছে।

মনু তার আচার সংহিতায় বলেন, 'এখন আমি সাধকের আচারবিধি উল্লেখ করছি। এর চারটি স্তর রয়েছে। (একেকটি স্তরকে আশ্রম বলে অভিহিত করা হয়) :

প্রথম স্তর : ব্রহ্মচর্য আশ্রম তথা শিক্ষা ও দীক্ষার সময়।

দ্বিতীয় স্তর : গার্হস্থ্য আশ্রম তথা পরিজন-পোষণের কাল।

তৃতীয় স্তর : বানপ্রস্থ আশ্রম তথা শারীরিক ও আত্মিক সাধনার কাল।

চতুর্থ স্তর : সন্ন্যাস আশ্রম তথা বৈরাগ্যসাধনা কাল।'

এরপর আরও বলেন, 'চতুরাশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্য আশ্রম থেকেই অন্যগুলো মদদপুষ্ট। যেভাবে সব নদী সমুদ্রে গিয়ে মিলিত হয়, তেমনি চতুরাশ্রমের প্রতিটি গার্হস্থ্য আশ্রমের সঙ্গে মিলিত হয়।'[৪২]

প্রতিটি স্তরের আচারবিধিগুলো নিম্নরূপ :

এক. ব্রহ্মচর্য আশ্রম

- আট বছর বয়স থেকে ২৪ বছর পর্যন্ত এই আশ্রমের সময়। একজন বিদ্যার্থীর জন্য এ সময়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হচ্ছে, সুগন্ধির ব্যবহার থেকে বেঁচে থাকা এবং বাহ্যিক সাজসজ্জা ও নারীসঙ্গ পরিহার করা।

[৪২] ষষ্ঠ অধ্যায় : ৯০-৯৪।

- দয়ানন্দ বলেন, কোনো বিদ্যার্থী ব্রহ্মচর্যকালে বিয়ে করলে তার জন্য স্ত্রীসঙ্গ পরিহার করা আবশ্যক। সে একাকী রাতযাপন করবে।[৫৩]
- মনু বলেন, ব্রহ্মচর্য আশ্রম চলাকালে একজন বিদ্যার্থী প্রথম যে কাজ করবে সেটি হলো, নিজের মা, বোন, খালা বা কোনো নারীর কাছে এমন কিছু চাইবে, যা প্রত্যাখ্যান করা হবে না।[৫৪]
- ব্রহ্মচর্যকালে বিদ্যার্থী প্রতিদিন একবার আহার গ্রহণ করবে।[৫৫]
- বিদ্যার্থী তার গুরুর সামনে শাস্ত্রপাঠের শুরুতে ও অন্তে তাকে কুর্নিশ করবে। গুরুর সামনে বিনয়াবত হয়ে দাঁড়াবে, যেভাবে সালাত আদায়কারী আল্লাহর সামনে দাঁড়ায়। এর পর গুরুর কাছ থেকে বিদায় চাইবে।[৫৬]
- বিদ্যার্থী সব ধরনের মনস্কামনা পরিহার করবে। গুরুগৃহে রাত্রিযাপন করবে। ঈশ্বরের নৈবেদ্য দিতে প্রতিদিন একবার স্নান করবে।[৫৭]
- বিদ্যার্থীর জন্য মদপান, মাংস ভোজন, সুগন্ধি ব্যবহার, নারীসঙ্গ লাভ ও প্রাণিহত্যা নিষিদ্ধ। একইভাবে কামভাব সহকারে কোনো নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করাও মহাপাপ। এর মাধ্যমে সে নিজের বীর্য সংরক্ষণ করবে, এমনকি ঘুমের ভেতরও। এতৎসত্ত্বেও যদি তার বীর্যপাত হয়ে যায়, তাহলে সে স্নান করবে ও দীর্ঘ সময় সূর্যপ্রণাম করবে।[৫৮]
- বিদ্যার্থী *বেদের* শিক্ষা ধারণকারী পরিবার থেকে তার প্রয়োজনীয় বস্তু খুঁজে নেবে। সে তার বিশেষ পরিবার ও গুরুর পরিজনদের কাছ থেকে কোনোকিছু চাইবে না। অবশ্য যদি কারও থেকে কিছু না পায়, তাহলে এদের কাছে চাইতে পারবে।[৫৯]
- বিদ্যার্থী তার গুরুর পরনিন্দা শুনলে পরজনমে গাধা হিসেবে জন্মগ্রহণ করবে। যে গুরুর সমালোচনা করবে, সে শয়তানরূপে জন্ম নেবে; আর যে গুরুর সম্পদ নষ্ট করবে, সে কীটপতঙ্গরূপে জন্মগ্রহণ করবে।[৬০]

---

[৫৩] *সত্যার্থ প্রকাশ* : তৃতীয় অধ্যায় : ৬৮।
[৫৪] মনু, দ্বিতীয় অধ্যায় : ৫০।
[৫৫] প্রাগুক্ত : ৫৫।
[৫৬] মনু, তৃতীয় অধ্যায় : ৭১।
[৫৭] মনু, দ্বিতীয় অধ্যায় : ১৭৫-১৭৬।
[৫৮] প্রাগুক্ত : ১৭৭-১৮২।
[৫৯] প্রাগুক্ত : ১৮৩-১৮৪।
[৬০] প্রাগুক্ত : ২০১।

- শিষ্যের জন্য তার গুরুর সম্মানার্থে তার সঙ্গে গাড়িতে আরোহণ, একই বিছানায় উপবেশন, তার সামনে চেয়ারে বসা ও নৌকায় আরোহণ করা অন্যায়।[৬১]
- বিদ্যার্থী যদি সূর্যোদয়ের পূর্বে জাগতে না পারে, তাহলে সে দিন উপবাস করবে এবং সূর্যনমস্কার করবে; আর সূর্যাস্তের সময় যদি অবহেলায় কেটে যায়, তাহলে পরবর্তী দিন উপবাস করবে। সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের সময় ঘুম ও অবহেলায় কাটানো চরম অন্যায়। কেননা, এ দুটি সময় সূর্যের উপাসনার সময়।[৬২]
- শিষ্যের জন্য বেদের শিক্ষা পূর্ণরূপে অর্জনের জন্য গুরুর সান্নিধ্যে ৩৬ বছর অবস্থান করা উচিত। যদি এটি সম্ভব না হয়, তাহলে ১৮ বছর; আর যদি তা-ও সম্ভব না হয়, তাহলে কমপক্ষে ৯ বছর। এরপর সে গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করবে।[৬৩]
- মনু প্রথম আশ্রমে বিদ্যার্থীর আচরণবিধি বর্ণনার পর দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষভাগে বলেন, যে ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য আশ্রম চলাকালে এসব আচরণবিধির যথাযথ প্রতিপালন করবে, তার জন্য থাকবে স্বর্গ। তাকে পুনরায় আর পৃথিবীতে ফিরতে হবে না।[৬৪]

এ পর্যন্তই ব্রহ্মচর্য আশ্রমের আচরণবিধি, যা মনুর নীতিমালায় উল্লেখ করা হয়েছে।

একটি *উপনিষদ* গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণের ব্রহ্মচর্য আশ্রম মোট তিনটি স্তরে বিভক্ত :

১. **কনিষ্ঠ ব্রহ্মচর্য** : এর সময় ২৪ বছর বয়স পর্যন্ত।
২. **মধ্যম ব্রহ্মচর্য** : এর সমাপ্তি হয় ৪৪ বছর বয়সে।
৩. **উত্তম ব্রহ্মচর্য** : এর সমাপ্তি হয় ৮৪ বছর বয়সে।[৬৫]

দয়ানন্দ বলেন, 'বিয়ের উপযুক্ত বয়স ৪০ বছর। এ বয়সে শরীরের সুপ্ত শক্তি পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে। শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গও পরিণত হয়। বিদ্যার্থীর জন্য এই বয়সে উপনীত হওয়া পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে জ্ঞানার্জনে ব্রত থাকা উচিত।'

ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্য ব্রহ্মচর্য আশ্রমের সময় কি একই? এ প্রশ্নের উত্তরে

---

[৬১] প্রাগুক্ত : ২০৩-২০৪।
[৬২] প্রাগুক্ত : ২২০।
[৬৩] মনু, তৃতীয় অধ্যায় : ১-২।
[৬৪] প্রাগুক্ত : ২৪৯।
[৬৫] *শান্দুজিয়া উপনিষদ* : ৩/১৬।

দয়ানন্দ বলেন, 'না, ছেলেদের ২৫ বছরের বিপরীতে মেয়েদের ব্রহ্মচর্য আশ্রমের সময় হবে ১৬ বছর। ছেলেদের ৩০ বছরের বিপরীতে মেয়েদের হবে ১৭ বছর। ছেলেদের ৩৬ বছরের সমান হবে মেয়েদের ১৮ বছর। ছেলেদের ৪০ বছরের সমান হবে মেয়েদের ২০ বছর। ছেলেদের ৪৪ বছরের সমান হবে মেয়েদের ২২ বছর। ছেলেদের ৪৮ বছরের সমান হবে মেয়েদের ২৪ বছর। এর পরই ব্রহ্মচর্য আশ্রমের সমাপ্তি ঘটবে।'[৬৬]

ভারতীয় নেতা গান্ধি ব্রহ্মচর্য আশ্রম আমৃত্যু প্রলম্বিত করাকে উত্তম মনে করেন। তার মতে, 'বিয়ে করলেও তাদের জন্য উত্তম হবে দাম্পত্য আচরণের পরিবর্তে ভাই-বোনের মতো জীবন কাটিয়ে দেওয়া।'

দুই. গার্হস্থ্য আশ্রম (পারিবারিক জীবন)

হিন্দুসমাজে পারিবারিক জীবনযাপনের চেয়ে সংসারবিরাগী হওয়ার প্রতিই বেশি আগ্রহ দেখানো হয়। হিন্দু সাধুরা সর্বদা বস্তুবাদী জীবনের নিন্দা করেন। তারা তাদের অনুসারীদের পার্থিব বাঁধন ছিন্ন করার প্রতি উৎসাহিত করেন। একসময় হিন্দু ধর্মবেত্তারা হিন্দুসমাজে বৈরাগ্যের মন্দ প্রভাবের ব্যাপারে শঙ্কাবোধ করতে শুরু করেন, এ জন্য তারা গার্হস্থ্য জীবনের পক্ষে মুখ খুলতে শুরু করেন। মনুই প্রথম এই আশ্রমকে চতুরাশ্রমের চেয়ে মর্যাদাপূর্ণ বলে দাবি করেন। তিনি তার *মনুস্মৃতি* গ্রন্থে বলেন, 'গার্হস্থ্য আশ্রম চতুরাশ্রমের মধ্যে উত্তম।'[৬৭]

দয়ানন্দ বলেন, 'পরিজনপালনের এই গার্হস্থ্য আশ্রম সাধু ও বৈরাগীদের জন্য অনুদানের পথ তৈরি করে। যদি পারিবারিক এই জীবন না থাকত, তাহলে পৃথিবীপৃষ্ঠে বংশক্রম অব্যাহত থাকত না। যে এই আশ্রমের নিন্দা করবে, সে নিজেই নিন্দিত।'[৬৮]

জীবনের এই স্তরে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের করণীয় হচ্ছে, বিয়ে করা এবং নিজের ও স্ত্রী-পরিজনের জন্য বাস্তুসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

তিন. বানপ্রস্থ আশ্রম (শারীরিক ও আত্মিক সাধনার কাল)

মনু বলেন,

- মানুষ যখন বয়সের শেষপ্রান্তে উপনীত হয়, মাথার কেশে পাক ধরে, চেহারায়

[৬৬] *সত্যার্থ প্রকাশ*, তৃতীয় অধ্যায় : ৭০।
[৬৭] মনু, তৃতীয় অধ্যায় : ৭৮।
[৬৮] *সত্যার্থ প্রকাশ*, চতুর্থ অধ্যায় : ১৫৯।

ভাঁজ পড়ে যায় এবং তার নাতিপুতির জন্ম হয়, তখন তার জন্য পার্থিব জীবন পরিত্যাগ করে পাহাড়-জঙ্গলে চলে যাওয়া উচিত। প্রয়োজন হলে সে তার স্ত্রীকে সঙ্গে নেবে; অথবা তাকে নিজের পরিজনদের কাছে রেখে যাবে। জঙ্গলের ফলমূল ও শস্য দিয়ে নিজের আহার্যের প্রয়োজন মেটাবে। হরিণের চামড়ার পোশাক পরিধান করবে। প্রতিদিন স্নান করবে। মাথার চুল লম্বা করবে। দাড়ি-গোঁফ বড় করবে এবং হাতের নখ কাটবে না।[৬৯]
- সে কোনোরূপ শারীরিক প্রশান্তির আয়োজন করবে না। ব্রহ্মচর্য জীবনযাপন করবে। স্ত্রী-সম্ভোগ থেকে নিবৃত্ত থাকবে, এমনকি যদি স্ত্রীও তার সঙ্গে থাকে। গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নেবে। গাছের কাণ্ডেই রাত কাটাবে।[৭০]
- সে মদপান ও মাংস আহার থেকে বিরত থাকবে। শাক, ফুল, গাছের ফল ও জঙ্গলের শস্যের দ্বারা আহার সম্পন্ন করবে।[৭১]
- চাষাবাদকৃত শস্যের আহার তার জন্য পাপ, যদিও সে ক্ষুধার্ত হয়।[৭২]
- সে একদিন আহার করবে এবং একদিন উপবাস করবে; অথবা একদিন আহার করবে এবং দুইদিন উপবাস করবে; অথবা একদিন আহার করবে এবং তিনদিন উপবাস করবে।[৭৩]
- সে মাটিতে চিৎ হয়ে শয়ন করবে; অথবা পায়ের অগ্রভাগের ওপর ভর দিয়ে দিন কাটাবে।[৭৪]
- শরীরকে পরাভূত করতে ও শাস্তি দিতে প্রচণ্ড গরমে তপ্ত সূর্যের রোদে বসে থাকবে, বৃষ্টিতে খোলা আকাশের নিচে ভিজবে ও প্রচণ্ড শীতে ভেজা পোশাকে থাকবে।[৭৫]
- মনু বলেন, 'এরপর তার জীবনের এই তৃতীয় স্তর সমাপ্ত হবে, যা ৫০ বছর বয়স থেকে শুরু হয়েছিল এবং ৭৫ বছর বয়স পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এরপরই সে চতুর্থ স্তর অবলম্বন করবে।'

[৬৯] মনু, ষষ্ঠ অধ্যায় : ২, ৬।
[৭০] প্রাগুক্ত : ৮, ২৬।
[৭১] প্রাগুক্ত : ১৩।
[৭২] প্রাগুক্ত : ১৬।
[৭৩] প্রাগুক্ত : ১৯।
[৭৪] প্রাগুক্ত : ২২।
[৭৫] প্রাগুক্ত : ২২।

চার. সন্ন্যাস-আশ্রম (বৈরাগ্যসাধনা ও গুরুকাল)

মানবসন্তান তার জীবনের এসব স্তর অতিক্রম করে এবার নতুন এক জীবনে প্রবেশ করবে। এটি বৈরাগ্য অবলম্বন ও গুরু হিসেবে অন্যকে শিষ্য বানানোর সময়। মানুষের জন্য সে হবে যথাযথ গুরু ও অনুসৃত সাধক। সে তখন সব ধরনের বিধানের ঊর্ধ্বে অবস্থান করবে। সে জড়জগৎ থেকে স্থিতির জগতে প্রবেশ করবে। তখন সে ঈশ্বরের মতোই পূজনীয় বলে বিবেচিত হবে।

সুফিরা এই অবস্থানের ব্যাপারে বলেন, 'আল্লাহ থেকেই শ্রবণ করো এবং আল্লাহর কাছেই প্রত্যাবর্তন করো।' এ থেকেই সুফিগণ তাদের শায়খের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন ও তার আনুগত্যের কথা বলেন, যদিও তার নির্দেশাবলি শরিয়তবিরোধী হয়।

মনু বলেন, 'এই স্তরে এসে মানুষ মাথা মুণ্ডন করবে, দাড়ি-গোঁফ কেটে ফেলবে, নখ কাটবে এবং নিজের সঙ্গে একটি থলে বহন করবে।[৭৬] প্রতিদিন একবার করে ভিক্ষা করবে।'[৭৭]

দয়ানন্দ বলেন, 'এই স্তরে এসে সে সকল সৃষ্টি, ধনসম্পদ ও পরিবার-পরিজনের মায়া ত্যাগ করে ভিখারির মতো জীবনযাপন করবে। গূঢ় রহস্যের সন্ধানে সাধনায় মগ্ন থাকবে। সদা তপস্যায় বিভোর থাকবে, যা দ্বারা সে নির্বাণ (বার বার জন্মলাভ থেকে মুক্তি) লাভ করবে।'[৭৮]

সুফিগণের ভাষায় এটিই 'ফানা' তথা বিলীন হওয়ার স্তর।

পণ্ডিত দয়ানন্দ বৈরাগ্যের এই স্তরকে শুধু ব্রাহ্মণদের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। কেননা, তারাই সৃষ্টির সেরা; আর বৈরাগ্য মানবজন্মের শ্রেষ্ঠ কাজ। তাই এটি ব্রাহ্মণদের জন্যই নির্ধারিত থাকবে।[৭৯]

[৭৬] প্রাগুক্ত : ৫১।
[৭৭] প্রাগুক্ত : ৫৫।
[৭৮] *সত্যার্থ প্রকাশ*, পঞ্চম অধ্যায় : ১৮৫।
[৭৯] *ঋগ্‌বেদ* : ৫৩৪/৮/১০, ৮/১৮/১০।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হিন্দুদের পারিবারিক বিধিবিধান

এক. বিয়ে

আর্যসমাজে বিয়েশাদি তিনটি পদ্ধতিতে সম্পন্ন হতো :

প্রথম পদ্ধতি : পিতা কর্তৃক কন্যার জন্য পাত্রের ব্যবস্থা করা।[৮০]

দ্বিতীয় পদ্ধতি : জোরপূর্বক বিয়ে। যেমন, ক্ষমতাবান বা শক্তিমান কোনো ব্যক্তি কর্তৃক পিতার অমতে তার কন্যাকে জোরপূর্বক বিয়ের জন্য উঠিয়ে নিয়ে আসা।[৮১]

তৃতীয় পদ্ধতি : কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কোনো বিদ্বানের সামনে তার কন্যাকে পেশ করা।

কনের ঘরে বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হতো, যেখানে বর তার পরিজন ও বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে উপস্থিত থাকত। ঘরের পবিত্র কোনো স্থানে তখন প্রদীপ জ্বালিয়ে তাতে গাভির দুধের ঘি ঢালা হতো। এরপর বর-কনে উভয়ের পোশাকের কোণে গিঁট দেওয়া হতো এবং তারা কয়েকবার আগুনের চতুষ্পার্শ্বে প্রদক্ষিণ করত। ব্রাহ্মণ কোনো পণ্ডিত তখন বেদের শ্লোক পাঠ করত। এভাবেই বিয়ের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হতো।[৮২]

১. একাধিক বিয়ে

হিন্দুরা একাধিক বিয়েকে বৈধ মনে করে। হিন্দু মহান পুরুষদের বহুসংখ্যক স্ত্রী থাকত। যেমন, অর্জুনের দ্রৌপদী, সুভদ্রা[৮৩], চিত্রাঙ্গদাসহ একাধিক স্ত্রী ছিল। একইভাবে কৃষ্ণের ব্যাপারে কথিত আছে যে, তার ১৭ হাজার স্ত্রী ছিল; কিন্তু

[৮০] *ঋগ্‌বেদ* : ১৫/৮৫/১০।
[৮১] প্রাগুক্ত : ৮/৩৯/১০, ১৯/১১২/১।
[৮২] প্রাগুক্ত : ৫৩৪/৮/১০, ৮/১৮/১০।
[৮৩] অর্জুনের দ্বিতীয় স্ত্রী।—*অনুবাদক*।

বেদ এক স্ত্রী নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতেই উদ্‌বুদ্ধ করে।[৮৪] এ কারণে আমরা হিন্দুদের একাধিক স্ত্রী গ্রহণের জন্য বহুবিধ কৌশল অবলম্বন করতে দেখি।

২. বিধবা বিয়ে

বেদগ্রন্থে বিধবা বিয়ে-সংক্রান্ত কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। উপরন্তু বেদ বিধবা নারীদের মৃত স্বামীর সঙ্গে সহমরণের প্রতি উদ্‌বুদ্ধ করে। তাই হিন্দু নারীরা মৃত স্বামীর সঙ্গে চিতায় আরোহণ করত এবং আগুনে পুড়ে পুড়ে মারা যেত।

এটিকে হিন্দু নারীদের জন্য পুণ্য ও মর্যাদার কাজ বলে বিবেচনা করা হতো। প্রাচীন গ্রন্থগুলোতে দেখা যায়, মেঘনাদের স্ত্রী সুলোচনা তার স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর সঙ্গে চিতায় দগ্ধ হয়েছিলেন। মাদ্রী তার স্বামী পাণ্ডুর সঙ্গে সহমরণে গিয়েছিলেন। মহাভারতে উল্লেখ আছে, কৃষ্ণের কয়েকজন স্ত্রী তার সঙ্গে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মাহুতি দিয়েছিল।

গ্রিক ইতিহাসবিদদের খ্রিষ্টপূর্ব বিভিন্ন গ্রন্থের আলোচনা থেকে জানা যায়, এই নীতি পুরো ভারতজুড়েই পালিত হতো। তবে বর্তমানে ভারত সরকার এই জঘন্য প্রথা নিষিদ্ধ করেছে।

১৮১১ খ্রিষ্টাব্দে ভারতীয় দার্শনিক ও ব্রাহ্মণসমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায়ের ভাই মৃত্যুবরণ করেন। পরে তার ভাইয়ের স্ত্রীকে মৃতদেহের সঙ্গে জীবিত পোড়ানো হয়, যা দেখে রাজা রামমোহন রায় প্রভাবিত ও ব্যথাতুর হয়ে পড়েন। তিনি তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের কাছে সতীদাহপ্রথা নিষিদ্ধের দাবি জানান। ব্রিটিশ সরকার এতে সাড়া দেয়। ১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক (Lord William Bentinck) আইন করে এই জঘন্য প্রথা নিষিদ্ধ করেন।

সতীদাহপ্রথা নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে ভারতজুড়ে বিধবার সংখ্যা বাড়তে থাকে। এদের মধ্যে অনেকেই ছিল একেবারে অল্পবয়সি। প্রাচীন এক জরিপ থেকে জানা যায়, তখন হিন্দুদের মধ্যে ১৩ হাজার ৭৭৮ জন এমন বিধবা নারী ছিল, যাদের বয়স ছিল ৫ বছরের কম; আর ১০ বছরের কমবয়সি বিধবার সংখ্যা ছিল ৬ লাখ ৪৪ হাজার ৪০ জন। এর চেয়ে বেশি বয়সিদের সংখ্যা অনুমান করতেই চমকে যেতে হয়।

এসব বিধবাদের কঠোর বিধিনিষেধের আওতায় মানবেতর জীবনযাপন করতে হতো।

---

[৮৪] ঋগ্বেদ: ৮/১০৫/১, ২/৩৩/১০। অবশ্য অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায় ব্রাহ্মণ চারজন, ক্ষত্রিয় তিনজন, বৈশ্য দুজন ও শূদ্র একজন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে।

মনু বলেন, 'বিধবারা শাকসবজি খেয়ে জীবন কাটাবে। তারা নিজেদের দেহকে এমনভাবে নিস্তেজ করে রাখবে যে, অন্য স্বামীর কথা কখনো কল্পনাও করবে না।'[৮৫] এমনকি স্বামীসঙ্গ পাওয়ার আগেই কোনো নারী যদি বিধবা হয়, তাহলে তার জন্যও বাকি জীবনে বিয়ে নিষিদ্ধ ছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের জন্য এই নিয়ম ছিল আরও কঠোর। তবে পুরুষের জন্য তার স্ত্রীর মৃত্যুর পর পুনরায় বিয়ে করা বৈধ ছিল।[৮৬] অবশ্য দয়ানন্দ এটি মানতে নারাজ। তার মতে, 'পুরুষের জন্যও পুনরায় বিয়ে করা বৈধ নয়।'[৮৭]

৩. নিকটাত্মীয়দের বিয়ে করা নিষিদ্ধ

মনু বলেন, এমন নারীকে বিয়ে করা বৈধ, যার সঙ্গে পিতা বা মাতার দিকে স্বামীর সাত প্রজন্মের আত্মীয়তা না থাকবে।[৮৮]

৪. অল্প বয়সে বিয়ে

যে কন্যার বয়স ১০ অতিক্রম করে (যেটি ভারতীয় কন্যাদের প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার সময়) এবং তার পিতা বা বড় ভাই তার বিয়ে না দেয়, তাহলে সবাই নরকে যাবে।[৮৯]

আর মনুর ভাষ্যমতে, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিন বছর অতিক্রান্ত হওয়া বিয়ের জন্য শর্ত।[৯০]

দুই. শারীরিক সম্ভোগ

দয়ানন্দ বিধবাদের জন্য বিয়ে অন্যায় মনে করলেও পুরুষের সঙ্গে মিলনকে বৈধ মনে করেন। তার ভাষায়—'যে নারীর স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে, সে নিজের জন্য সন্তান ধারণের উদ্দেশ্যে অন্য পুরুষের সঙ্গে দুবার মিলিত হতে পারবে; আর চারজন পুরুষের সঙ্গে চারবার মিলিত হতে পারবে। একইভাবে স্ত্রীহারা পুরুষ বিবাহিত নারীর সঙ্গে দুবার সন্তান নেওয়ার উদ্দেশ্যে মিলন করতে পারবে; আর চারজন নারীর সঙ্গে চারবার মিলন করতে পারবে।'

---

[৮৫] মনু, পঞ্চম অধ্যায় : ১৫৭।

[৮৬] প্রাগুক্ত : ১৬৮।

[৮৭] সত্যার্থ প্রকাশ, চতুর্থ অধ্যায় : ১৬৭।

[৮৮] মনু, তৃতীয় অধ্যায় : ৫।

[৮৯] পরস্ত্রী, লাখু অধ্যায় : ৬/৭।

[৯০] মনু, নবম অধ্যায় : ৯০।

ঋগ্বেদের বিভিন্ন শ্লোকও এর বৈধতার ইঙ্গিত করে।[৯১] যেমন, 'হে ইন্দ্র, সে-সকল বিবাহিত রমণী ও বিধবাদের শক্তিশালী সন্তান দিতে তাদের সঙ্গে সঙ্গম করা তোমার কর্তব্য। বিবাহিত নারীর সন্তান হবে ১০টি। একইভাবে হে বিবাহিত রমণীরা, তোমাদেরও সে-সকল পুরুষের সঙ্গে মিলন করা আবশ্যক, তাদের দশ দশটি সন্তান উপহার দেওয়ার জন্য।'[৯২]

তিন. পর্দা

প্রচলিত অর্থে হিন্দু নারীদের জন্য পর্দার বিধান নেই। তারা বিয়ে-অনুষ্ঠান ও পূজা-পার্বণে পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারে। একইভাবে নারীদের জন্য দেব-দেবীর সন্তুষ্টিলাভের মানসে তাদের সামনে নৃত্য পরিবেশন করাও বৈধ।

চার. ঋতু চলাকালে নারীসঙ্গ পরিহার করা

মনু বলেন, 'ঋতু চলাকালে পুরুষের জন্য স্ত্রীসঙ্গ পরিহার করা আবশ্যক। সে তখন স্ত্রীর সঙ্গে ঘুমাবে না, তার সঙ্গে সঙ্গম করবে না। যদি এটি করে, তাহলে তার শারীরিক শক্তি, যৌনশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কমে যাবে। একইভাবে তার আয়ুও কমে যাবে।'[৯৩]

[৯১] ঋগ্বেদ : ৪৫/৮৫/১০।

[৯২] সত্যার্থ প্রকাশ, চতুর্থ অধ্যায় : ১৬৪-১৬৫।

[৯৩] মনু, চতুর্থ অধ্যায় : ৪০-৪১।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হিন্দুদের উপদলসমূহ

হিন্দুদের মধ্যে বহু উপদল রয়েছে। ভারতজুড়ে পরিচিত দুটি উপদলের বিশ্বাস তথা বিষ্ণুধর্ম ও শৈবধর্মের আলোচনা এখানে তুলে ধরা হলো।

এক. বিষ্ণুধর্ম ও শৈবধর্ম

বিষ্ণুধর্ম : বিষ্ণু হিন্দুধর্মের একজন দেবতা। বেদ গ্রন্থসমূহে তার নাম উল্লেখ হয়েছে। এই উপদলের সদস্যরা বিষ্ণুকে পুরো ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা এবং ব্রহ্মার যাবতীয় গুণের ধারক মনে করে। তারা বিশ্বাস করে, তিনি তাদের সব বিপদাপদ থেকে নিরাপদে রাখেন।

এই মতবাদে বিশ্বাসীদের বৈশিষ্ট্য হলো, এরা বিষ্ণুর উপাসনাকে শ্রেষ্ঠ কাজ মনে করে। কালপরিক্রমায় বিষ্ণুর অনুসারীরা কৃষ্ণের উপাসনা করতে শুরু করেছে। তারা মনে করে, কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার। কেননা, বিষ্ণু মানুষের উপকারার্থে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মানবরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তাদের মতে, বিষ্ণু মোট ১০টি অবতারে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। তন্মধ্যে রাম ও কৃষ্ণ বেশি পরিচিত। এই দলের অনুসারীরা দুটি উৎসব পালন করেন। রামের স্মরণে দশহরা ও কৃষ্ণের স্মরণে কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী।

ভারতজুড়ে এই দলের অনুসারীদের বহু উপাসনালয় রয়েছে, যেখানে উপাসনার জন্য বিষ্ণুর মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে।

দুই. বিষ্ণুর গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা

১. সব ব্যাপারে ঈশ্বরের ইচ্ছাই বাস্তবায়িত হয়।
২. মানবজীবনের তৃতীয় ও চতুর্থ স্তরে প্রবেশ করা ব্যতীত দ্বিতীয় স্তর তথা গার্হস্থ্য আশ্রমেই আত্মার মুক্তি মিলতে পারে।

৩. যে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ নিতে পেরেছে, সে অন্যের ওপরও নিয়ন্ত্রণ নিতে সক্ষম।
৪. একই আত্মা সকল সৃষ্টিতে বিরাজমান।

শৈবধর্ম : সিন্ধু অঞ্চলে শিবের অনুসারীরা এই মতবাদে বেশি পরিচিত। ঋগ্‌বেদে রুদ্র নামে তার আলোচনা এসেছে, যিনি পরবর্তী সময়ে 'শিব' নাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি 'ধ্বংস' ও 'বিনাশে দক্ষ' এবং 'মহাশক্তিধর' হওয়ায় তাকে 'মহাদেব' উপাধি দেওয়া হয়েছে। তিনি শক্তিমত্তায় অন্যান্য দেবতা; আর জ্ঞানগরিমায় অন্যান্য সাধু ও ঋষিদের বিরুদ্ধে বিজয়লাভ করেন।

এই মতবাদে বিশ্বাসীরা শিবের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে। তারা মনে করে, শিবের অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব কিছুই নেই; বরং তিনি সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত।

এরা পরিতৃপ্ত ভোজনের চেয়ে ক্ষুধার্ত থাকাকে প্রাধান্য দেয়। যদি কখনো আহারের প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন মানুষের মাথার খুলিতে আহার করে। তারা একাকিত্বে জীবন কাটাতে অভ্যস্ত। এর পাশাপাশি তারা কিছু সময় শ্মশানে অবস্থান করতেও পছন্দ করে।

এই মতবাদের অনুসারীরা অন্যান্য স্থানের চেয়ে ভারতেই বেশি প্রসার লাভ করেছে। ভারতজুড়ে তাদের বেশ কিছু মন্দির রয়েছে, যার কতেক খ্রিষ্টপূর্ব সময়ে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে।

চীনা পর্যটক হিয়ুন সিয়ানিজ ষষ্ঠ শতকে ভারত ভ্রমণ করেন। তিনি দেখেছেন, ভারতজুড়ে অন্যান্য দেবতার তুলনায় শিবের পূজা বেশি করা হয়। একই সময়ে হিন্দু ইতিহাসবিদদের আলোচনায়ও আমরা দেখেছি, তারা শিবকে বেশি সম্মানের চোখে দেখত এবং অন্যদের উপাসনার চেয়ে শিবের উপাসনাকে প্রাধান্য দিত। পরবর্তী সময়ে বিখ্যাত পর্যটক আলবেরুনির আমলে তিনি দেখেন, শিবের স্থান দখলে নিয়েছিল শক্তি, সূর্য, ব্রহ্মা, ইন্দ্রা, অগ্নি ও কবিরার মতো দেবতারা।

তিন. মূর্তিপূজা

নিশ্চিত করে এ কথা বলা যায় না যে, ভারতবর্ষে কখন থেকে মূর্তিপূজার প্রচলন শুরু হয়েছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষকগণ মহেঞ্জোদারো ও হড়প্পা সভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক খনন থেকে অসংখ্য মূর্তি পেয়েছেন। এসব মূর্তির অধিকাংশই ছিল নগ্ন, পোশাকহীন, যা এ কথার ইঙ্গিত বহন করে—এসবের পূজারিরা মনে করত, মানুষ যত দিন পার্থিব জীবনের প্রতি অনুরাগী থাকবে, সুস্বাদু খাবার ও

পোশাকের প্রতি আকৃষ্ট থাকবে, তত দিন তার মুক্তি মিলবে না।

আবার বিভিন্ন স্থানে আকর্ষণীয় পোশাক ও অলংকারসজ্জিত মূর্তিরও দেখা পাওয়া যায়। নিঃসন্দেহে এসব মূর্তি বিষ্ণুধর্মের অনুসারীদের, যারা তাদের মতবাদের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করতে বাহ্যিক সাজসজ্জা গ্রহণের প্রতি গুরুত্বারোপ করে। একইভাবে লিঙ্গ ও যোনিপূজারও প্রচলন ছিল। কেননা, শিব ও তার স্ত্রী পার্বতীর প্রতিকৃতি হলো লিঙ্গ ও যোনি। এতদুভয়ের মিলনের ফলেই বিশ্বের সৃজন হয়েছে। তাই স্বভাবতই ভারতের অধিবাসীরা লিঙ্গ ও যোনির পূজায় লিপ্ত হয়েছে, যা দ্বারা সৃষ্টির সূচনা হয়েছে এবং এখনো এ ধারা অব্যাহত রয়েছে।

মহেঞ্জোদারোর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাবলিতে লিঙ্গ ও যোনি-আকৃতির বেশ কিছু পাথর পাওয়া গেছে।

ইতিহাসবিদ মি. ভার্ত (Mr. Varth) বলেন, 'অতি প্রাচীনকাল থেকেই হিন্দুরা প্রকৃতিতে তাদের দেব-দেবীদের খুঁজে বেড়াত। একপর্যায়ে তারা লিঙ্গ ও যোনি-আকৃতির পাথরের দেখা পায়। এরপর তারা লিঙ্গ ও যোনির পূজা করতে শুরু করে। এ কারণে হিন্দুধর্মের অনুসারী—যারা মানব ও গরুরূপী ঈশ্বরের উপাসনা করতে দ্বিধা করত না—তাদের জন্য লিঙ্গ ও যোনি-আকৃতির প্রস্তরখণ্ডের পূজা করা অস্বাভাবিক ছিল না। অন্যান্য প্রাকৃতিক উপাদানের মতো এটাকেও উপাস্যরূপে গ্রহণ করা তাদের অভিরুচির সঙ্গে সাযুজ্য ছিল।'[২৪] তবে আর্যরা তাদের পবিত্র *বেদ* গ্রন্থে লিঙ্গপূজার আলোচনায় এর সমালোচনা করতে ভোলেনি।

ঋগ্‌বেদে বলা হয়েছে, 'তিনি ইন্দ্র, যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে সুকৌশলে কর্মসম্পাদন করেন। তিনি তার শত্রু সত্রী দেবীর কাছ থেকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হাতিয়ে নেন, যদিও এসব সম্পদ শতদ্বারে সুরক্ষিত ছিল। তিনি এমন দুষ্ট আত্মাসমূহ বিতাড়িত করতেন, যারা লিঙ্গের পূজা করত।'[২৫] একইভাবে *রামায়ণে*ও লিঙ্গের আলোচনা পাওয়া যায়। লঙ্কার রাজা রাবণ সবসময় তার সঙ্গে সোনার তৈরি লিঙ্গ রাখত।

প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষক স্যার জন মার্শাল (Sir John Marshall) লিঙ্গের আকৃতিতে পাওয়া বেশ কিছু মূর্তির পরিমাপ ও যে ধাতু খোদাই করে তা প্রস্তুত করা হয়েছে, এর বিস্তারিত বিবরণ নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন।[২৬]

---

[২৪] *Religion of India* : 261
[২৫] ঋগ্‌বেদ: ২১/৫/৯।
[২৬] *Momon Jodoa in Indus Civilisation.*

ভারতজুড়ে খ্যাতি লাভ করা মূর্তিগুলোর মধ্যে 'মাতৃদেবী' তথা 'দেশের মাটি' অন্যতম। এ ছাড়া বেলুচিস্তান অঞ্চলে মাতৃদেবীর কিছু মূর্তি পাওয়া যায়।

বেদ গ্রন্থসমূহে 'ভূমি' নামে এর পূজার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা, ভূমিই মানবশিশুর প্রথম আশ্রয় এবং এটিই মানুষের শেষ বিশ্রামস্থল। তাই এই মাতৃদেবীকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করা হিন্দুদের জন্য খুবই স্বাভাবিক ছিল।

মহেঞ্জোদারোর প্রত্নতাত্ত্বিক খননে শিবেরও বেশ কিছু মূর্তি পাওয়া যায়, যাতে তিনটি মুখ রয়েছে। তাতে দেখা যায় কাষ্ঠাসনে চিন্তামগ্ন হয়ে তিনি কোমরে হাত রেখে যোগাসনে বসে আছেন। তার পাশে বেশ কিছু প্রাণীর মূর্তিও রয়েছে। শিবের কিছু মূর্তিতে সাপের চিত্র খোদাই করা আছে, যেন সেটি তার কাঁধে ফণা তুলে আছে। তাই হিন্দুরা একে ঈশ্বরের প্রাণী মনে করে।

ধর্মতত্ত্ববিদগণ মনে করেন, আর্যরা মূর্তিপূজা সম্পর্কে অবগত ছিল না। ভারতবাসীর সঙ্গে মেশার পর তাদের অনুকরণে আর্যরা নিজেদের স্রষ্টাদের মূর্তি তৈরি করতে শুরু করে। এভাবে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও আর্যসভ্যতার মেলবন্ধনে নতুন এক ধর্মের আবির্ভাব ঘটে, যেটি 'হিন্দুধর্ম' নামে পরিচিত। তখন দেখা যেত, আর্যদের ইন্দ্র, বরুন ও অগ্নির মতো দেবতারা ভারতবাসীর বিষ্ণু ও শিবের মতো দেবতাদের চেয়ে প্রাধান্য পেত অনেক সময়; আবার কখনো ভারতবাসীর দেব-দেবী আর্যদের দেব-দেবীর চেয়ে সম্মানিত হতো।

এই ধারা খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীর স্বামীর আগমন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। তারা দুজন হিন্দুধর্মের ওপর বেশ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন। তখন থেকে হিন্দুধর্ম হয়ে পড়ে আর্যদের ধর্মবিশ্বাস, ভারতবাসীর কুসংস্কার, গৌতম বুদ্ধের শিক্ষা ও মহাবীর স্বামীর ধর্মীয় আচারবিধির সমন্বিত রূপ।

চার. গো-পূজা

গাভি হিন্দুসমাজে অত্যন্ত উঁচু মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী। কেননা, এটি ছিল আর্যদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। তাই তারা এর প্রতিপালন ও এর প্রতি সদয় আচরণ করতে বাধ্য ছিল। এর মাধ্যমে তাদের বহুবিধ উপকার সাধিত হতো। এ জন্য তারা তাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহে এর সম্মানে কয়েকটি শ্লোকের অবতারণা ঘটায়। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে,

- গরু এমন সকল মহানায়কের মাতা, যারা শত্রুকে পরাভূত করেন। এটি

ঈশ্বরের কন্যা ও ঈশ্বর অদিতের পুত্রগণের বোন। এটি জীবনের আধার। তাই আমি আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন পুরুষদের কাছে নিবেদন করছি, তারা যেন একে জবাই না করে।[৯৭]

- যে গরুকে পদাঘাত করবে, সে শাস্তির উপযুক্ত বিবেচিত হবে।[৯৮]
- আমরা গাভিকে জ্ঞানের আধার করেছি; আর গরু ইন্দ্রের সেবা করবে।[৯৯]

বেদ গ্রন্থসমূহে গরুর সম্মানবোধক আরও বিভিন্ন শ্লোক পাওয়া যায়। তাই হিন্দুরা এর পূজা করে ও এর গোবরকে পবিত্র জ্ঞান করে।

কৃষ্ণ নামের হিন্দু মহাপুরুষ গরুর প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। তিনি গরুর প্রতিপালন করতেন। তাই তাকে গো-পাল তথা গরুর প্রতিপালনকারী উপাধি দেওয়া হয়।

গো-দানকে হিন্দুসমাজে বিশেষ পুণ্যকাজ বলে মনে করা হয়। এমনকি বিয়ে-শাদিসহ ধর্মীয় উৎসবগুলোতে গরু দান করা সবচেয়ে পবিত্র দান বলে বিবেচিত হয়।

ভারতীয় হিন্দু নেতা গান্ধি গো-পূজার অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন। তিনি একে অত্যন্ত পবিত্র মনে করতেন এবং মুসলমানদেরও তা জবাই করতে বাধা দিতেন। তিনি হিন্দুত্বের চেতনাবোধ জাগরূক করে বলতেন, 'পৃথিবীপৃষ্ঠে তত দিন হিন্দুত্ববাদ অবশিষ্ট থাকবে, যত দিন হিন্দুরা গো-মাতাকে রক্ষা করে যাবে।'

কিন্তু গান্ধিকে যদি বলা হতো, 'আপনি কি গরুর চামড়া দিয়ে বিছানা ও এর হাড় দিয়ে অস্ত্র তৈরি করতে সম্মত হবেন, যেমনটি আর্যরা করত?'[১০০]

আমি মনে করি তিনি এতে সম্মত হতেন না। কেননা, তিনি বিভিন্নভাবে গো-মাতাকে নিজের মায়ের চেয়ে-উত্তম মনে করতেন।

[৯৭] ঋগ্বেদ : ১৫/১০১/৮।
[৯৮] অথর্ববেদ : ৪৬/৯/১৩।
[৯৯] ঋগ্বেদ : ১/১৭৩/১।
[১০০] প্রাগুক্ত : ১১/৭৫/৬, ৯/১২১/১, ২৬/৪৭/৬।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

হিন্দু ধর্মমতে উপাসনা

হিন্দু ধর্মমতে উপাসনা দু-ধরনের :

এক. যজ্ঞ

ঈশ্বরের ভালোবাসা অর্জন ও পাপমুক্তির জন্য নির্দিষ্ট স্থানে আগুন জ্বালিয়ে *বেদ* ও *উপনিষদের* বিশেষ মন্ত্রসমূহ পাঠ করার মাধ্যমে এটি সম্পন্ন হয়। বিভিন্ন উপলক্ষ্য ও পদ্ধতিতে যজ্ঞের আয়োজন করা হয়। যেমন : সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখা এবং ঈশ্বরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও আনুগত্য প্রকাশ। প্রায়ই যজ্ঞের পদ্ধতিতে বিভিন্ন পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা হয়; আর যজ্ঞ সম্পন্ন করতে হয় ব্রাহ্মণের মাধ্যমে। কেননা, সে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যকার বাহক।

এভাবেই যজ্ঞ প্রত্নতাত্ত্বিক ও সম্রাটদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নিয়েছে। ব্রাহ্মণরা বহুকাল যাবৎ যজ্ঞ-সম্মোহনের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এবং এর পদ্ধতি-সংক্রান্ত অনেক গ্রন্থ রচনা করেছে।[১০১]

দুই. পূজা

এটি ঈশ্বরের গুণকীর্তন ও স্তুতিপাঠের পর তার সামনে ফুল, ফল ও জাফরান মিশ্রিত পানীয়জলের মাধ্যমে নৈবেদ্য অর্পণের নাম।

প্রত্যেক দেব-দেবীর সামনে ফুল-ফল ও জলের নৈবেদ্য অর্পণের ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় রীতি রয়েছে। কারও সামনে হাতের তালু থেকে জল ঢেলে অর্ঘ্যপ্রদান করতে হয়; আবার কারও সামনে বৃহদাকার শঙ্খ থেকে জল ঢেলে নিবেদন করতে হয়।[১০২] গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় এসবের বিস্তারিত বিবরণ এড়িয়ে যাওয়া হলো।

[১০১] শাহারাস্তানি তাঁর *আল মিলাল ওয়ান নিহাল* গ্রন্থে এর কয়েকটি পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন : ২/২৬১

[১০২] *আল-কামুসুল হিন্দুসি* : ৪১২।

তিন. উপবাস

হিন্দু ধর্মগুরুরা ভালো করেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, মানবিক আত্মাকে সংযমী করা, পাশবিক প্রবৃত্তির দমন ও শারীরিক শক্তি বৃদ্ধির উত্তম উপায় হচ্ছে উপবাস। তাই তারা ধর্মীয় ব্যক্তি, সাধু ও তাপসদের জন্য উপবাসের বাধ্যবাধকতা রেখেছেন। উপবাসের বেশ কয়েকটি পন্থা রয়েছে। যেমন : অনির্দিষ্টসংখ্যক দিবারাত্রি পানাহার থেকে নিবৃত্ত থাকা। খাদ্য গ্রহণ থেকে নিবৃত্ত থেকে প্রয়োজন পরিমাণ জল ও দুধের ওপর নির্ভর করা। লাগাতার কয়েকদিন শুধু দুপুরে খাদ্য গ্রহণ করা এবং সূর্যাস্তের পর পানাহার করা।

অপরদিকে কিছু জঙ্গল ও হিমালয় পর্বতে কতেক সাধু ও সন্ন্যাসীর দেখা মেলে, যারা লাগাতার উপবাস করেন। তারা কখনো পানাহার করে না। একপ্রকার গুল্মের রস তাদের কণ্ঠনালীতে নিংড়ে দেওয়া হয়। শুধু গলা ভিজিয়ে এভাবেই আমৃত্যু তারা মৃতের মতো পড়ে থাকে।[১০৩]

[১০৩] এটিই হিন্দু দর্শনমতে যোগ বা য়োগা। যোগী ব্যক্তি মানসিক ও আত্মিক সাধনার মাধ্যমে বাহ্য উপকরণ ব্যবহারের উর্ধ্বে উঠে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের চমকে দিয়ে নিরাবরণ অবস্থায় বরফঠান্ডা জলাধারের ওপর বসবাস করতে পারে। কাচের চূর্ণের ওপর স্বাভাবিকভাবেই শুয়ে থাকতে পারে। এ ব্যাপারে সবার স্পষ্ট ধারণা রাখা চাই—যোগ হিন্দু ধর্মবিশ্বাসের একটি অংশ। হিন্দু ধর্মমতে তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির মাধ্যম। এর ধরনগুলো *বেদ* গ্রন্থসমূহ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, যদিও সরাসরি এই শব্দটি *বেদ* গ্রন্থসমূহে উল্লেখ করা হয়নি। এর সঙ্গে সাধু-সন্ন্যাসীদের অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটিয়ে এতে যথেষ্ট উন্নতি সাধন করা হয়েছে, যা চমকে দেওয়ার মতো অসাধারণ ফল বয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে।

বৈদিক যুগে যোগের ধারণা সবার কাছে স্পষ্ট ছিল। ধর্মীয় ব্যক্তিগণ ধর্মের গূঢ় রহস্য ও *বেদ* গ্রন্থসমূহের মর্মার্থ অনুধাবনের জন্য যোগ-সাধনা করতেন। যোগদর্শন একটি বিশুদ্ধ ব্রাহ্ম হিন্দু ধর্মদর্শন, যা দ্বারা মানবসত্তার ওপর কর্তৃত্বলাভ করা যায়।

একটি আন্তর্জাতিক পত্রিকায় হিন্দুধর্মবেত্তা চন্দ্র স্বামীর একটি বক্তব্য দেখেছিলাম, তাতে তিনি বলেন, 'বিভিন্ন রাষ্ট্রের বড় বড় নেতা ও সরকারি কর্মকর্তারা তার শিষ্য। তারা তার কাছে দাসতুল্য। তিনি যেভাবে ইচ্ছা তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করেন; আর তা সম্ভব হয়েছে যোগের মাধ্যমে।'

বর্তমানে দুজন ব্যক্তি যোগ-প্রশিক্ষণে প্রসিদ্ধ হয়েছে : একজন আচার্য রাজনেশ; আরেকজন মহেশ যোগী।

আচার্য রাজনেশ ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে এবং কয়েক বছর পূর্বে মৃত্যুবরণ করে। সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করত না, কোনো আসমানি গ্রন্থে বিশ্বাস করত না। এমনকি স্বর্গ-নরকসহ অদৃশ্যের কোনো বিষয়াশয়েও বিশ্বাস করত না। সে বিশ্বাস করত, মানবসত্তা অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী। কোনো মানুষ যখন এটি পুরোপুরি আয়ত্ত করতে পারবে, তখনই সে অসাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শনে সক্ষম হবে। সে শুধু যোগ ও সুফিবাদি আধ্যাত্মিক দর্শন প্রচার করত এবং বাবা ফরিদ গঞ্জেশকরের গুণমুগ্ধ ছিল। ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে সে নিজের সিদ্ধিলাভের দাবি করে। অর্থাৎ, সে তখন আত্মা ও দেহের মধ্যকার সম্পর্কের ব্যাপারে অবগতি লাভ করেছে। চাইলেই সে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একীভূত হতে পারে। ৬৭৪ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের পুনে শহরে সে 'রাজনেশ আশ্রম' নামে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে সেখানে

আর সাধারণ হিন্দুরা নির্দিষ্ট কিছু দিনের উপবাস করে। যেমন : কেউ নিজের জন্য চন্দ্রমাসের নির্দিষ্ট দিন উপবাসের জন্য নির্ধারণ করে। কেউ কৃষ্ণ, রাম বা প্রহ্লাদের জন্মদিন অথবা চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের সময় উপবাসের জন্য নির্ধারণ করে। আবার কেউ তাদের স্মরণীয় বিজয়—যেমন, রাবণের বিরুদ্ধে রামের বিজয়লাভের দিনকে উপবাসের জন্য নির্দিষ্ট করে। তবে এসব উপবাস তাদের জন্য আবশ্যক নয়; বরং তাদের ইচ্ছানির্ভর।

চার. তীর্থযাত্রা

সম্মানিত ব্যক্তি বা পবিত্র স্থানের পরিদর্শনকে (জিয়ারত) 'তীর্থযাত্রা' নামে অভিহিত করা হয়। যাত্রার শাব্দিক অর্থ নদী পাড়ি দেওয়া।

সম্মানিত ব্যক্তিদের পরিদর্শন বলতে বোঝানো হয়, তাদের উপদেশ শ্রবণ ও সান্নিধ্যলাভ; আর পবিত্র স্থানের জিয়ারত বলতে বোঝানো হয় এসব স্থানে গিয়ে তথায় স্থাপিত মূর্তির উপাসনা করা।

এমন স্থান মূলত চারটি :

১. দ্বারকা (Dwarka)
২. জগন্নাথপুরী (Jagannathpuri)

প্রতিদিন যোগশাস্ত্রের পাঠদান করত। এরপর ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে সে যুক্তরাষ্ট্রে গমন করে এবং সেখানে যোগ-সাধনার কয়েকটি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে।

বিভিন্ন বিষয়ে তার দেওয়া দৈনিক লেকচারগুলো হিন্দি ও ইংরেজি ভাষায় প্রায় শতাধিক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়গুলো ছিল যোগব্যায়াম ও আধ্যাত্মিক সাধনাবিষয়ক। তার মৃত্যুর পর তার অনুসারীরা এটি বিশ্বাস করেনি। তারা মনে করে, সে জনসাধারণের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে এবং বিশ্বজগতের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। বেদান্তের ভাষ্যমতে যেখানে সে কখনো ধ্বংস হবে না।

দ্বিতীয়জন হচ্ছে মহেশ যোগী। সে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমায়। মানুষের সামনে সে নিজেকে অত্যন্ত দুনিয়াত্যাগী সন্ন্যাসী হিসেবে প্রকাশ করলেও চরম অর্থলোভী ছিল। সে মানুষকে যোগ-সাধনার প্রতি আহ্বান করত এবং তাদেরকে মহর্ষি আচরণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করত। সে দাবি করত, ঈশ্বর তাকে পাঠিয়েছেন মানবসভ্যতাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে। তাদের এমন চিরস্থায়ী জীবনের সন্ধান দিতে, যা কখনো ধ্বংস হবে না; যেন মানুষ চিরস্থায়ী শান্তিলাভের যোগ্য হয় এবং নির্বাণ লাভ করে। এভাবে তার আহ্বানে প্রভাবিত হয়ে মাত্র ৪০ বছরেরও কম সময়ে তার আশেপাশে বহু আমেরিকান একত্রিত হয়ে যায়। তবে শেষ মুহূর্তে তার গোপন রহস্য প্রকাশিত হয়ে পড়ে। সে যে বড় ধরনের একজন চোর, সেটা সবার সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়। ফলে সে আমেরিকা ছাড়তে বাধ্য হয়। মার্কিন সরকার তার বিশাল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে। পরে সে ভারতে পালিয়ে আসে। এর পর থেকে লোকলজ্জার ভয়ে সে গোপন জীবনযাপন করতে থাকে।

৩. বাদরিকাশ্রম (Badrikashrama)
৪. রামেশ্বর (Rameshwar)

এর পাশাপাশি হিন্দুরা বেনারস ও এলাহাবাদের পবিত্র গঙ্গা ও যমুনা নদীতেও যাত্রা করে। তাদের এই যাত্রার পদ্ধতি হলো :

১. যাত্রাকারী ব্যক্তি পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাত্রা করবে। যাত্রাকালে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে না বা তাদের কথা ভাববে না।
২. নিজের বাসগৃহ থেকে এক কিলোমিটার দূরে পরিধেয় পোশাক খুলে স্নান করবে এবং গেরুয়া বর্ণের একটি লম্বা কুর্তা ও লুঙ্গি পরিধান করবে। একটি বাঁশের দণ্ডের মাথায় পানির বিশেষ পাত্র বেঁধে তা হাতে রাখবে। এরপর 'হরে কৃষ্ণ, হরে রাম' পাঠ করে বেরিয়ে পড়বে। তবে যাত্রায় পদব্রজে বেরোনো উত্তম।

ব্রাহ্মণের জন্য এসব যাত্রায় বেরোনো আবশ্যক এবং অন্যদের জন্য ইচ্ছাধীন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

হিন্দুদের গুরুত্বপূর্ণ ধর্মবিশ্বাস

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, হিন্দুদের মৌলিক কোনো ধর্মবিশ্বাস নেই। এতৎসত্ত্বেও কিছু বিশ্বাস এমন রয়েছে, যা সর্বজনীনভাবে সকল হিন্দু লালন করে, যদিও এসবের মধ্যে পরস্পরবিরোধী কিছু বিশ্বাসও রয়েছে। এসব ধর্মবিশ্বাসের পরস্পরবিরোধের ব্যাপারটি সামনে আলোচনা করা হবে। এ জন্য বেশ কিছু বিষয় এমন রয়েছে, হিন্দুদের প্রতিটি উপদলই যেগুলোর ওপর বিশ্বাস করে। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হচ্ছে :

১. হিন্দু ধর্মবিশ্বাসমতে জগতের সৃষ্টি;
২. অবতারের দর্শন;
৩. জন্মান্তরবাদের বিশ্বাস;
৪. কর্মাদর্শন;
৫. নির্বাণের বিশ্বাস

এক. হিন্দু ধর্মবিশ্বাসমতে জগতের সৃষ্টি

১. পরমেশ্বরের পানি ও বীর্য থেকে জগতের সৃষ্টি

মনু তার সংহিতার প্রথম অধ্যায়ে (এই অধ্যায়টি সৃষ্টিজগতের বিবরণ-সংবলিত) বলেন, 'এই জগৎ ছিল লুক্কায়িত, এর কোনো খোঁজ ছিল না। এতে পৌঁছানোরও কোনো উপায় ছিল না। তখন সৃষ্টির ক্ষমতা নিয়ে পরমেশ্বরের আত্মপ্রকাশ ঘটে। তিনি তার নিজের সত্তা থেকে সৃষ্টিজগৎ বিনির্মাণের ইচ্ছা করেন, তখন তিনি পানি সৃষ্টি করেন এবং তাতে বীর্য ঢেলে দেন। এই বীর্য থেকে ডিমের জন্ম হয়। পরে ডিম দু-ভাগে বিদীর্ণ হয় ও ব্রহ্মার জন্ম হয়। এরপর ব্রহ্মার এক ভাগ থেকে স্বর্গ ও অন্য ভাগ থেকে আকাশ, জমিন এবং এতদুভয়ের মধ্যকার সকল বস্তু,

আট দিক ও উত্তাল সাগর তৈরি করেন। এরপর ব্রহ্মার মুখমণ্ডল থেকে ব্রাহ্মণ, তার বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য ও পা থেকে শূদ্রশ্রেণি বের করেন। যত দিন ব্রহ্মা জাগ্রত থাকবেন, তত দিন জগৎ অবশিষ্ট থাকবে; আর যখন তাকে নিদ্রা স্পর্শ করবে, তখন মহাপ্রলয় সংঘটিত হবে।'

মনু আরও বলেন, 'এভাবেই ঈশ্বর জগৎ এবং আমাকে সৃষ্টি করেছেন। মহাপ্রলয়ের পর তিনি একের পর এক এই সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি করবেন। তিনি নিদ্রামগ্ন হলে প্রলয় হবে; আর যতক্ষণ জাগ্রত থাকবেন, সৃষ্টির ধারা অব্যাহত থাকবে। এটিই স্রষ্টার জগদ্‌বিধি।'[১০৪]

এই কল্পকথা থেকে আমরা যেসব তথ্য পেয়েছি, তা হচ্ছে :

- ব্রহ্মা একটি সৃষ্টি, পরমেশ্বর যাকে সৃষ্টির ক্ষমতা নিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তবু হিন্দুরা তাকে অবিনশ্বর স্রষ্টার আত্মা মনে করে। তার সঙ্গেই নিম্নজগতের আত্মাসমূহ মিলিত হয়।
- এই সৃষ্টিই পরে স্রষ্টার রূপ নিয়ে স্বর্গ, আকাশ, জমিন ও এর মধ্যকার সবকিছু নির্মাণ করেছেন।
- পরমেশ্বরের সৃষ্ট ব্রহ্মা চারটি শ্রেণি তৈরি করেছেন; কিন্তু আমরা জানতে পারিনি অন্যান্য সৃষ্টির স্রষ্টা কে?
- এই ব্রহ্মাই বিশ্বজগতের ব্যবস্থাপক; কিন্তু ব্রহ্মার স্রষ্টা পরমেশ্বরের এখন কী কাজ, তা জানা যায়নি।
- প্রলয় পর্যন্ত এই সৃষ্টির ধারা অব্যাহত থাকবে। এরপর এর সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি হতে থাকবে। আমরা জানি না, কখন তার সমাপ্তি ঘটবে।

এবার দেখে নেওয়া যাক এ সম্পর্কে মনু কী বলেন?

মনু বলেন, 'আমরা সৃষ্টির সপ্তম পর্বে অবস্থান করছি। আমাদের পূর্বে আরও ছয়জন মনু অতিবাহিত হয়েছেন। তারা সবাই নিজেদের পর্বের সৃজন করেছিলেন। তারা নিজ নিজ সময়ে জগতের ব্যবস্থাপনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

এরপর তিনি দিন ও রাতের বিভাজন করেন। সে হিসাবমতে ১৮ নিমিষে হয় এক কাষ্ঠা। আর ৩০ কাষ্ঠায় হয় এক কলা। ৩০ কলায় এক মুহূর্ত; আর ৩০ মুহূর্তে এক অহোরাত্রি।[১০৫] এ ছাড়া তিনি সূর্যকে পরিণত করেন দিন-রাতের বিভাজকে।

[১০৪] মনুস্মৃতি, প্রথম অধ্যায় : ৫১-৫২।
[১০৫] হিন্দু ধর্মমতে সময়ের বিভাজনের এককসমূহ নিমিষ, কাষ্ঠা, কলা, মুহূর্ত ও অহোরাত্রি। আধুনিক

রাতকে নির্ধারণ করেন নিদ্রার জন্য; আর দিনকে কাজের জন্য।[১০৫]

এরপর মনু বলেন, 'এবার শোনো, ব্রহ্মার দিন-রাত সমান ৪ হাজার অহোরাত্রি, যা এক সত্যযুগ। ৪ হাজার সত্যযুগে হয় এক সন্ধ্যাযুগ। আর ৪ হাজার সন্ধ্যাযুগে হয় এক সন্ধ্যাংশযুগ।[১০৬] অর্থাৎ, ১৮ × ৩০ × ৩০ × ৩০ × ৪০০০ × ৪০০০ × ৪০০০।

দিন-রাতের এই হিসাব শুধু সৃষ্টির এক পর্বের। মনু সংহিতায় দিন-রাতের হিসাবের আরও কিছু গণনা আছে, গণিত শাস্ত্রমতে যা বোঝানো কষ্টসাধ্য।

২. জাগতিক আত্মার 'আমি' থেকে মানবের সৃষ্টি

বিশ্বজগতের সৃষ্টির ব্যাপারে আরেকটি বর্ণনা দেখুন, যেখানে জাগতিক আত্মা মানবাকৃতি ধারণ করে। এরপর সে আশেপাশে তাকালে নিজেকে ছাড়া কাউকে দেখতে পায়নি। এতে তার অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে পড়ে—'আমি'। সেখান থেকে 'আমি' শব্দের উৎপত্তি হয়। এ কারণে তখন থেকে মানুষ নিজের ব্যাপারে বলতে 'আমি' বলে ব্যক্ত করে। সেই জাগতিক আত্মা বা প্রথম মানুষ এবার নিজের একাকিত্বে ভীতি অনুভব করে। ফলে আজ পর্যন্ত মানুষ সেটা অনুভব করে। সে নিজেকে বলে, 'আমি কেন ভয় পাচ্ছি? এখানে তো আমি ছাড়া কেউ নেই।।' কেননা, মানুষ সাধারণত অন্যকে ভয় পায়; কিন্তু সে কোনোভাবেই একাকী স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছিল না। এ কারণে এখনো মানুষ একাকিত্বে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না। তাই সে নিজের সঙ্গী তৈরির প্রতি উদ্‌বুদ্ধ হয় এবং নিজেকে দু-ভাগে বিভক্ত করে। একটি অংশ তারই থাকে আর দ্বিতীয় অংশটি নারীতে পরিণত হয়। পরে সেই নারী হন তার স্ত্রী। তখন থেকেই মানবজন্মের ধারা শুরু হয়।[১০৭]

সৃষ্টির সূচনা-সংক্রান্ত আরও একটি বর্ণনা রয়েছে, যাতে বলা হয়েছে, হিন্দু ধর্মমতে বিষ্ণু মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী; আর স্ত্রী লক্ষ্মী তার শক্তির প্রতীক। চাঁদের মধ্যে যেভাবে আলো প্রবিষ্ট হয়, তিনিও সেভাবে বিষ্ণুর মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন। তবে এর ভিন্ন ভিন্ন দুটি বিবেচনা রয়েছে :

১. তিনি বিষ্ণুর ইচ্ছাশক্তির প্রতীক।

হিসাবের দিন-রাতের ২৪ ঘণ্টা সমান এক অহোরাত্রি।—অনুবাদক।

[১০৬] প্রথম অধ্যায় : ৬১-৬৫।

[১০৭] প্রাগুক্ত : ৭৬-৮৬।

[১০৮] বর্ণনাটি আমি ড. আহমাদ শালাবি প্রণীত *মুকারানাতুল আদইয়ান* : ৫২ থেকে উদ্ধৃত করছি। মূল গ্রন্থ আমি সংগ্রহ করতে পারিনি। সেটি হলো, *আল-আসাতিরুল হিন্দিয়া আনিল কাওনি ওয়া খালকিহি* : ৩৪।

২. তিনি এই জাগতিক অস্তিত্বের পাঁজরের হাড়স্বরূপ। তার থেকেই সৃষ্টির সূচনা। বিষ্ণু যখন গভীর নিদ্রা থেকে জাগ্রত হন—যার ব্যাপ্তি ছিল অজ্ঞাত সময় এবং তিনি লক্ষ্মীকে নিদ্রা থেকে জাগিয়ে তোলেন—তখন বিষ্ণু ছয়টি সত্তাগত গুণ ধারণ করেন। যথা : জ্ঞান, সামর্থ্য, বিশ্বজনীন, জীবন, শক্তি ও প্রতাপ।

আর এসব গুণের সমন্বয়ে বাসুদেবের সৃষ্টি হয়। বাসুদেবের উৎসর্গের ফলে তিনটি সত্তার উদ্ভব হয়। যথা : জ্ঞান ও বিশ্বজনীনতার প্রতীক শংকর; শক্তি ও সামর্থ্যের প্রতীক প্রবীণ এবং জীবন ও প্রতিপত্তির প্রতীক নিরোধ। এই তিন সত্তাই পৃথিবীর সব কর্মের ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করেন।

এবার পাঠকের সামনে সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে হিন্দুধর্মের মৌলিক গ্রন্থসমূহের পরস্পরবিরোধী তথ্যগুলো তুলে ধরছি, যা দ্বারা পাঠক হিন্দুধর্মের মৌলিক বিষয়াদির মধ্যে মতবিরোধের একটি ধারণা পেয়ে যাবেন।

প্রখ্যাত হিন্দু দার্শনিক ড. তারাচন্দ্র তার *Influence of Islam on Indian Culture* গ্রন্থে সৃষ্টিজগৎ সম্পর্কে বৈদিক-দর্শন তুলে ধরে বলেন, 'নিশ্চয়ই জীবের বলিদান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎকর্ষের প্রমাণ। এটি স্রষ্টার শক্তিবৃদ্ধির মাধ্যম। কেননা, তিনি যখন সৃষ্টি হতে ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং তার শক্তি রহিত হয়ে পড়ে, তখন ঈশ্বরের দূতেরা পশুবলির মাধ্যমে এই শক্তি ফিরিয়ে দেন। এর দ্বারা বৃষ্টিপাত হয়, এর প্রভাবেই সূর্যোদয় হয় ও তুফান হয়। এটিই একমাত্র এমন উপায়, যার মাধ্যমে স্রষ্টার বাসনা পূর্ণ হয়।'[১০৯]

বিষ্ণু দর্শনমতে, বিষ্ণুই দ্বিতীয় ঈশ্বর। তিনিই আসমান-জমিনসহ তাতে যা কিছু আছে, তার স্রষ্টা। তিনিই সকল বস্তুর রক্ষাকর্তা। সবকিছুই তার দৃষ্টিগোচরে রয়েছে এবং সব দিকেই তার মুখমণ্ডল রয়েছে। তার বহু হাত-পা রয়েছে। তিনি একক, তার কোনো অংশীদার নেই।[১১০]

তিনি একক সত্তা। তিনিই পরম-পুরুষ। তার হাজার হাজার মস্তক, চোখ ও হাত-পা রয়েছে। তিনি জগতের চেয়ে ভিন্ন, তবে পুরো বিশ্বকে অন্তর্ভুক্তকারী। পৃথিবীতে যা কিছু হয় বা হবে, সবই তার আদেশে হয়। তিনিই অবিনশ্বর জীবনের স্রষ্টা। তার কোনো কাজের জবাবদিহি করতে হয় না। তার সব কাজই কল্যাণকর।

[১০৯] *Influence of Islam on Indian Culture : 30*

[১১০] ঋগবেদ : ১০/৮১/২-৪।

৩. বেদান্তের দর্শন

হিন্দু ধর্মবেত্তা বিবেকানন্দ[১১১] বলেন, 'স্রষ্টার ইচ্ছাতেই এই ধরা অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এসেছে। জগতের মূল, আত্মা ও স্রষ্টা এর সবকিছুই চিরন্তন ও অবিনশ্বর। তিনি নতুনত্ব ও সময় পরিক্রমার ঊর্ধ্বে। স্রষ্টা যেমন চিরন্তন, জীবনও তেমন চিরন্তন। একইভাবে প্রকৃতিও চিরস্থায়ী। অবশ্য সময়ের সঙ্গে এতে বিবর্তনও হয়। আর স্রষ্টা, তিনি সকল স্থান ও কালে অস্তিত্বশীল। তিনি সবকিছুর ব্যাপারে পরিজ্ঞাত। তার বাহ্য কোনো আকার নেই। কোনো মানবসন্তান কখনো তার উচ্চতায় পৌঁছতে পারে না। কেউ যদি নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করে, তবে সে ঈশ্বরকে অস্বীকার করল।'[১১২]

৪. পুরাণ-দর্শন

হিন্দুধর্মাবলম্বীদের মতে, *পুরাণ* পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহের অন্তর্ভুক্ত। *পুরাণের* অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থ অসংখ্য, যার সবই বেদব্যাসের রচনা। *পুরাণ* গ্রন্থসমূহে জগতের সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হয়। সেখানে এ-সংক্রান্ত বিভিন্ন অশ্লীল ও হীন গল্পগাথার আলোচনা করা হয়েছে। পাঠকের সামনে এর একটি নমুনা তুলে ধরা হচ্ছে।

পুরাণ দেবী ভগবতের (Devi Bhagawat) ভাষ্যমতে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন শ্রীপুরের (Shripur) শ্রী (Shri) নামের জনৈক নারী। তিনি ব্রহ্মা (সৃষ্টির দেবতা), বিষ্ণু (খাদ্যের দেবতা) ও মহেশ (প্রাণনাশের দেবতা) নামীয় হিন্দুদের প্রসিদ্ধ তিন দেবতাকে তৈরি করেছেন। এই নারী যখন এই জগৎ সৃষ্টির মনস্থ করেন, তখন তিনি তার এক হাতের ওপর আরেক হাত স্থাপন করেন। এভাবে ব্রহ্মার সৃষ্টি হয়। এর পর এই নারী ব্রহ্মাকে বলেন, তাকে বিয়ে করতে; কিন্তু ব্রহ্মা তার জন্মদাত্রীকে বিয়ে করতে অস্বীকৃতি জানান। এতে তিনি রাগান্বিত হয়ে তাকে ভস্মীভূত করে দেন। এরপর তিনি একইভাবে বিষ্ণুকে সৃষ্টি করে তাকেও বিয়ে করতে বলেন। বিষ্ণুও এতে অস্বীকৃতি জানান। এবারও তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে বিষ্ণুকে ভস্মীভূত করে দেন। পরেরবার তিনি মহেশকে সৃষ্টি করে

[১১১] বিবেকানন্দ [জন্ম : ১৮৬৫, মৃত্যু : ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দ] ছিলেন রামকৃষ্ণের অন্যতম শিষ্য। তিনি হিন্দু ধর্মীয় লেকচারের জন্য আমেরিকাজুড়ে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি মনে করতেন, বিবেক ও যুক্তির নিরিখে ধর্মের বিচার করা যায় না। ধর্মের জন্য প্রয়োজন হয় আধ্যাত্মিক পর্যবেক্ষণ ও মনস্তাত্ত্বিক সাধনার। তিনি সর্বেশ্বরবাদের দর্শনকে অস্বীকার করতেন।

[১১২] *হিন্দুইজম* : ৬১-৬৪।

তাকে বলেন, তিনি যেন শ্রীকে বিয়ে করেন। মহেশ এতে সম্মত হন। তবে এ জন্য তিনি শর্তারোপ করে বলেন, 'প্রথমে শ্রীকে ভিন্নরূপ ধারণ করতে হবে। এরপর তার উভয় ভাইকে পুনরায় জীবিত করতে হবে।' তিনি এতে সাড়া দেন এবং তাদের পুনরায় জীবিত করেন। পরে তাদের উভয়ের জন্য দুজন নারীকে সৃষ্টি করতে বলেন। তিনি এসব শর্ত পূরণ করলে তাদের সবাই বিয়ে করেন; আর এই তিন দেবতাই এই জগৎ সৃষ্টি করেন। তারাই এর ব্যবস্থাপনা করেন।[১১৩]

হিন্দুরা তাদের পবিত্র গ্রন্থসমূহে তাদের দেবতাদের ব্যাপারে এমন বহু কথার বিবরণ দিয়েছে, একজন সাধারণ মানুষও নিজেদের ব্যাপারে যা বলতে সংকোচবোধ করে।

মহান আল্লাহ তাদের এসব বিবরণ থেকে পরিপূর্ণভাবে মুক্ত।

দুই. অবতারের দর্শন

সংস্কৃতভাষায় 'অবতার' অর্থ অবতরণ করা। *গীতার* ভাষ্যমতে ও হিন্দুদের পরিভাষায় মানবজাতির কল্যাণসাধনে মানবাকৃতিতে স্রষ্টার অবতরণকে 'অবতার' বলা হয়।

কৃষ্ণ বলেন, 'সজ্জনদের নিরাপত্তা, দুষ্টদের বিনাশ ও ধর্মের বিধান সমুন্নত করতে আমি বার বার অবতরণ করব।'

তিনি অন্যত্র বলেন, 'যেখানেই ধর্মবিধি পালনে বিচ্যুতি দেখা দেবে ও নাস্তিকতা ছড়িয়ে পড়বে, তখনই আমি প্রকট হব।'[১১৪]

তিনি আরও বলেন, 'যখন মিথ্যার সামনে সত্য দুর্বল হয়ে পড়বে, পুণ্যকামীদের বিরুদ্ধে পাপাচারীরা শক্তিমান হয়ে উঠবে, তখন সত্যকে সমুন্নত করতে ও সজ্জনদের নিরাপদে রাখতে স্বয়ং ভগবান ধরায় নেমে আসবেন।'

অবতারের ব্যাখ্যায় শ্রী দয়াল কোবিন্দ বলেন, 'অবতার অর্থ অদৃশ্যের জগৎ থেকে প্রকাশ্যে আবির্ভূত হওয়া।'

ভগবত *গীতায়* অবতারের চারটি উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে :

১. পাপাচারীদের বিরুদ্ধে সদাচারীদের বিজয়ী করা।

[১১৩] *সত্যার্থ প্রকাশ* : ১১।

[১১৪] *গীতা অশ্লোক* : ৭।

২. প্রবঞ্চকদের ধ্বংস করে পৃথিবীতে সফলতা অর্জন।
৩. জগৎ থেকে পাপের বোঝা হালকা করা।
৪. সবার জন্য উত্তম চরিত্রের নমুনা উপস্থাপন করা।

১. অবতারের প্রকারভেদ

অবতার চার ধরনের :

১. **পূর্ণ অবতার :** অর্থাৎ, ঈশ্বরের পূর্ণরূপে অবতরণ করা। পূর্ণ অবতারের জন্য ব্রহ্মার মতো অসীম ক্ষমতাবান হতে হয়। যেমন, রাম ও কৃষ্ণের অবতার। তারা দুজন স্রষ্টার অবতার, যারা পাপিষ্ঠ ও দুষ্টদের দমনে মানবরূপে অবতরণ করেছিলেন।

রামায়ণ গ্রন্থের আলোচনায় রামের গল্প তুলে ধরা হয়েছিল। এখন পাঠক সমীপে হিন্দু ধর্মগ্রন্থের আলোকে কৃষ্ণের সেই গল্পটির বিবরণ তুলে ধরা হচ্ছে।

হিন্দু ধর্মমতে হাজার বছর পূর্বে 'কংস' নামে মথুরার[১১৫] এক রাজা ছিল। রাজার বোনের নাম ছিল দেবকি। বাসুদেব নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল। জ্যোতিষীগণ রাজা কংসকে জানিয়েছিলেন, তার অষ্টম ভাগনে তাকে হত্যা করে তার রাজ্য ছিনিয়ে নেবে। তাই কংস তার বোন ও ভগ্নিপতিকে কারারুদ্ধ করে রাখে।

কারাগারে এই দম্পতির পর পর ছয়টি সন্তানের জন্ম হলে কংস তাদের প্রত্যেককেই হত্যা করে। সপ্তম সন্তানটি কৌশলে বেঁচে যায়। কৃষ্ণের জন্ম হলে তার বাবা তার প্রাণ বাঁচাতে তৎপর হয়ে ওঠেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, জ্যোতিষীদের বক্তব্য সত্য হবে এবং এই সন্তান তাকে মুক্তি দেবে। তাই তিনি তাকে নিয়ে রাতের আঁধারে বেরিয়ে পড়েন। কৃষ্ণের অলৌকিক শক্তিতে কারাগারের দ্বার খোলা ছিল ও দ্বাররক্ষীরা ছিল গভীর ঘুমে মগ্ন। পরে তার পিতা তাকে নিয়ে যমুনার অপর তীরে গোকুল[১১৬] শহরে চলে যান। সেখানে 'নন্দা' নামে তার এক বন্ধু ছিল। সে রাতেই তার একটি কন্যাশিশুর জন্ম হয়েছিল। কৃষ্ণের বাবা কৃষ্ণকে নন্দার কাছে রেখে তার কন্যাসন্তানকে নিয়ে কারাগারে ফিরে আসেন।

প্রত্যুষে রাজা কংসকে দেবকির গর্ভে কন্যাসন্তানের জন্মের সংবাদ দেওয়া হলে সে জ্যোতিষীদের ওপর রাগান্বিত হয় ও তাদের তিরস্কার করে। কেননা, তারা

[১১৫] মথুরা হিন্দু ধর্মমতে একটি পবিত্র নগরী।

[১১৬] ভারতের উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের মথুরা জেলার অন্তর্গত একটি শহর। — অনুবাদক।

তাকে বলেছিল, দেবকির গর্ভে পুত্রসন্তান জন্ম নেবে, যে তাকে হত্যা করবে। এবার কংস সেই কন্যাকে নিয়ে মাটিতে আছাড় দেয়। শিশুটি তখন বলে ওঠে, 'তোমার হত্যাকারী জীবিত আছে, সে মরবে না।'

কৃষ্ণ নন্দার কাছে বড় হতে থাকে। সেখানে সে মেয়েদের সঙ্গে খেলাধুলা করত, গরু চরাত এবং গরুর দুধ পান করত।

তিনিই ব্রহ্মার অবতার কৃষ্ণ, যিনি পরবর্তীকালে অত্যাচারী রাজা কংসকে হত্যা করেছিলেন ও জনগণকে তার নিপীড়ন থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন।

২. **অনশান অবতার :** যে অবতারকে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যসাধনে পাঠানো হয়। এদের ক্ষমতা প্রথমোক্ত অবতারের চেয়ে কম হয়ে থাকে। যেমন : নৃসিংহের অবতার; যিনি হিরণ্যকশিপুকে হত্যার উদ্দেশ্যে অল্প সময়ের জন্য আগমন করেছিলেন।

নৃসিংহকে কেন্দ্র করে যে কল্পকথা প্রচলিত রয়েছে, তা নিম্নরূপ :

হিরণ্যকশিপু দৈত্যদের[১১৭] রাজা ছিলেন। প্রহ্লাদ নামে তার এক পুত্রসন্তানের জন্ম হয়, যে বিষ্ণুর উপাসক ছিল। প্রহ্লাদের বিষ্ণুভক্তিতে হিরণ্যকশিপু ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। কেননা, সে বিষ্ণুকে ঈশ্বর মানতে নারাজ ছিল এবং এর পরিবর্তে নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করত। সে বিভিন্ন কৌশলে নিজের পুত্রকে হত্যার চেষ্টা করে। একবার সে তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে, আরেকবার হাতির পায়ের নিচে ফেলে দেয়। পরিশেষে তাকে আগুনে নিক্ষেপ করে; কিন্তু ঈশ্বর বিষ্ণু প্রতিবারই তাকে রক্ষা করেন। এতে বিষ্ণুর প্রতি প্রহ্লাদের ভক্তি আরও বেড়ে যায়। এবার সে সকাল-সন্ধ্যা বিষ্ণুর গুণকীর্তন গাইতে শুরু করে।

পুত্রকে কোনোভাবে তার ধর্মবিশ্বাস থেকে নিবৃত্ত করতে না পেরে ক্রুদ্ধ হিরণ্যকশিপু একটি স্তম্ভ দেখিয়ে প্রহ্লাদকে জিজ্ঞেস করে, 'তার বিষ্ণু সেখানেও আছেন কি না?' প্রহ্লাদ উত্তর দেয়, 'তিনি সেখানেও আছেন।' হিরণ্যকশিপু স্তম্ভটিতে পদাঘাত করলে এটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। তখন তা থেকে বিষ্ণু নৃসিংহের আকারে আবির্ভূত হন। তাকে নর আর সিংহ মিলে নৃসিংহ নাম এ জন্য দেওয়া হয়েছিল যে, তার শরীর ছিল মানুষের মতো; আর মুখ ছিল সিংহের মতো। তিনি নৃসিংহকে নিজ জঙ্ঘার ওপর রেখে নখরাঘাতে হত্যা করেন।

এভাবেই সেই পাপিষ্ঠ রাজার ভবলীলা সাঙ্গ হয়। গল্পের শেষে দেখা যায়, নৃসিংহ

[১১৭] অসুরের পাশাপাশি দানবদের একটি জাতি। — অনুবাদক।

প্রহ্লাদকে বলেন, 'যা ইচ্ছা, তা যেন সে প্রার্থনা করে।' প্রহ্লাদ তখন তার কাছে কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত রাখা ও তার পিতাকে ক্ষমা করে দেওয়ার প্রার্থনা করেন। নৃসিংহ তার প্রার্থনা মনজুর করেন। এভাবে নৃসিংহ তার কর্তব্যপালনের পর অদৃশ্য হয়ে যান।

হিন্দুরা এই গল্পকে মানবিক ভালোবাসার উদ্দীপক মনে করে। কেননা, এতে পিতার প্রতি পুত্রের ভালোবাসার চিত্র ফুটে ওঠে। একইসঙ্গে হিন্দু দর্শনমতে ভালো ও মন্দের চিরন্তন সংঘাতের বিবরণও চিত্রায়িত হয়েছে। সময়ের পরিক্রমায় হিন্দুরা নিজেদের অভ্যাসমতো এই সাধু-পুরুষকে ঈশ্বর হিসেবে গ্রহণ করে তার উপাসনা করতে থাকে।

এই গল্পটি ভগবত *গীতার* সপ্তম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. **কলা অবতার :** যে অবতারের মর্যাদা অনশান অবতারের চেয়ে নিচের। যেমন, মনু কশ্যপ অবতার।

মনু সংহিতায় এই অবতারের বিবরণ এভাবে দেওয়া হয়েছে, 'ব্রহ্মা একবার নিজের সত্তা থেকে এমন এক সত্তা সৃষ্টি করতে চাইলেন, যার মাধ্যমে তার থেকে সৃষ্টিকুলের সূচনা হবে। এই লক্ষ্যে তিনি পর পর চারটি পুত্র সৃষ্টি করেন। তাদের কেউই এই দায়িত্ব গ্রহণে ইচ্ছুক ছিল না। পঞ্চম পুত্রের নাম ছিল সনক।

এই পঞ্চম পুত্র সর্বদা পঞ্চবর্ষীয় সন্তানের মতো ছিল। এভাবেই সে চিরকাল থাকবে। এরপর ব্রহ্মা ষষ্ঠ পুত্র তৈরি করেন, তার নাম ছিল মনু কশ্যপ। তার মাধ্যমেই সৃষ্টির সূচনা হয়।'

৪. **অধ্যকারি অবতার :** এমন অবতার, যাকে সাময়িকভাবে ব্রহ্মার মতো ক্ষমতা দেওয়া হয়। পরে এই ক্ষমতা রহিত হয়ে যায়। যেমন, *বেদ* ও *পুরাণ* রচনাকালে বেদব্যাস এই ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং একপর্যায়ে এই ক্ষমতা ফিরিয়ে নেওয়া হয়। অবশিষ্ট জীবন তিনি সাধারণ মানুষের মতোই কাটান।

হিন্দু ধর্মমতে অবতারের সংখ্যা ২৪ জন। এর মধ্যে যাদের আলোচনা করা হলো, তারা বেশি প্রসিদ্ধ।

আধুনিককালের বিভিন্ন হিন্দু গবেষক স্রষ্টার অবতরণ অসম্ভব মনে করে অবতারের ব্যাখ্যায় রিসালাত ও নবুওয়াতের মতো বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তারা *বেদ* ও *পুরাণ*কে নতুন আঙ্গিকে ব্যাখ্যা করার কাজও শুরু করেছেন।

দিল্লি থেকে প্রকাশিত ইসলামি ম্যাগাজিন *কান্তির* প্রবন্ধলেখক সত্যপ্রকাশের হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহে রিসালাতের দর্শন-সংবলিত আলোচনাগুলোর কয়েকটি উদ্ধৃতি পাঠকের সামনে তুলে ধরছি :

তিনি বলেন, '*ঋগ্বেদের* দ্বাদশ অধ্যায়ে এসেছে 'আকনং দোতং ওরি মা হি।'

অনুবাদ : আমি অগ্নিকে রাসুলরূপে নির্বাচিত করেছি।

অগ্নি : রাসুলের নাম।

দোতং : রাসুল।

ওরি : আমি নির্বাচিত করেছি।

প্রাচীন পণ্ডিতেরা এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলেন, 'দোতং অর্থ ঈশ্বর; আর অগ্নি অর্থ আগুনের ঈশ্বর।'

অবশ্য *বেদেরই* আরেক শ্লোক এই ব্যাখ্যার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। যেখানে বলা হয়েছে, 'মনু শিয়াসু কনমন'।

অনুবাদ : অগ্নি একজন মানুষ।

এই হিন্দু পণ্ডিত এসব উদ্ধৃতির মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন, হিন্দুধর্মে অবতারের দর্শন বিকৃত হয়েছে। সঠিক বিশ্বাস হচ্ছে, অন্যান্য আসমানি ধর্মের মতো রিসালাত ও নবুওয়াতের দর্শন।

তিন. পুনর্জন্মবাদ বা আত্মার পরিভ্রমণ

হিন্দিতে একে আগমন (Awagaman) বা পুনর্জনম (Punarjanm) বলা হয়। কোনো কোনো গবেষক এই দর্শনকে জন্মান্তরবাদ নামেও অভিহিত করেছেন।

পুনর্জন্ম : মানুষ এই জগতে কর্মের বিবেচনায় মৃত্যুর পর তার আত্মা অন্য দেহে পরিভ্রমণ করা। কখনো মানুষের আত্মা কোনো প্রাণী বা কীটপতঙ্গের দেহে পরিভ্রমণ করে; আবার কখনো এর উলটোও হয়। *পুরাণের* ভাষ্যমতে, মানুষ যখন তার জীবনের লক্ষ্য (স্রষ্টার উপাসনা) হারিয়ে ফেলে, তখন ৭৪ লাখ বছর পশুপাখি ও কীটপতঙ্গের দেহে পরিভ্রমণ করে। এরপর মানবদেহে গমন করবে।

কোনো এক পণ্ডিত বলেন, 'পুনর্জন্ম বা জন্মান্তরবাদের কারণ হলো :

১. যখন কোনো আত্মা দেহ ত্যাগ করে, তখন তার এমন কিছু কামনা-বাসনা থেকে যায়, যা এখনো পূরণ হয়নি।

২. যখন কোনো আত্মা অন্যের বহু ঋণ কাঁধে নিয়ে দেহ থেকে বের হয়, তার জন্য এই দায় মেটানো আবশ্যক থাকে। তখন তাকে অন্য জনমে তার কামনা চরিতার্থ করতে হয়; আর পূর্বের জনমের কৃতকর্মের ফল ভোগ করে।[১১৮]

হিন্দুরা ঈশ্বর, আত্মা ও সৃষ্টির মৌলিকতাকে অবিনশ্বর মনে করে। এটা থেকেই তাদের এই পুনর্জন্ম মতবাদের উদ্ভব। তাদের মতে, আত্মার কখনো ক্ষয় হয় না, যখন তা কোনো দেহ থেকে আলাদা হয়, অন্য দেহ ধারণ করে। মহাপ্রলয় পর্যন্ত এভাবেই আত্মা বিভিন্ন দেহে বিচরণ করে।

মহাপ্রলয় : হিন্দু শাস্ত্রমতে পৃথিবীর আয়ুকে চারটি যুগে বিভক্ত করা হয়েছে :

১. সত্যযুগ তথা পুণ্য ও সততার যুগ।
২. ত্রেতাযুগ।[১১৯]
৩. দ্বাপরযুগ তথা স্বেচ্ছাচারিতার যুগ।
৪. কলিযুগ তথা অন্ধকার যুগ।

এর প্রতিটি যুগেরই আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে :

- সত্যযুগে যারা জন্মগ্রহণ করে, তারা শুধু ধর্মকে ভালোবাসে।
- ত্রেতাযুগে যারা জন্মগ্রহণ করে, তারা ইহকাল ও পরকাল উভয়টির অনুরাগী হয়।
- দ্বাপরযুগে যারা জন্মলাভ করে, তারা ইহকাল ও পরকালের পাশাপাশি কামনা-বাসনার অনুরাগ লালন করে।
- কলিযুগে যারা জন্মলাভ করে, তারা শুধু মনস্কামনা ও লালসার পেছনে ছুটে।

এর প্রতিটি যুগ মিলিয়ন বছরের হয় :

- সত্যযুগ ৪,৮০০ ঈশ্বরীয় বছর।
- ত্রেতাযুগ ৩,৬০০ ঈশ্বরীয় বছর।
- দ্বাপরযুগ ২,৪০০ ঈশ্বরীয় বছর।
- কলিযুগ ১,২০০ ঈশ্বরীয় বছর।

আর এক ঈশ্বরীয় বছর সমান আমাদের হিসাবে ৩৬০ বছর।

[১১৮] *সাকাফাতুল হিনদ ও বিজহাতিহার রুহিয়াহ* : ৪৩।
[১১৯] তিন ভাগ পুণ্য ও এক ভাগ পাপের যুগ।— অনুবাদক।

এই যুগগুলোর সমাপ্তির পর এই জগৎ আবার সত্যযুগ থেকে শুরু করে কলিযুগ পর্যন্ত অসংখ্যবার এর পুনরাবৃত্তি করবে। এর পর মহাপ্রলয় ঘটবে। জগতের এই পালা-পরিবর্তন থেকে আত্মা মুক্তি পাবে এবং উর্ধ্বজগতের সঙ্গে মিলিত হবে।[১২০]

তাদের ভাষ্যমতে এর কারণ হলো, আত্মার তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে :

- **সত্ত্ব গুণ :** এই গুণসম্পন্ন মানুষ জ্ঞান ও গবেষণার প্রতি অনুরাগী হয়।
- **তমঃ গুণ :** এই গুণসম্পন্ন মানুষ জ্ঞান থেকে দূরে থাকে ও মূর্খতার প্রতি অনুরাগী হয়।
- **রজঃ গুণ :** এই গুণসম্পন্ন মানুষ কল্যাণ ও অকল্যাণের প্রতি অনুরাগী হয়।

আত্মার এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অধম থেকে উত্তম স্তরে পৌঁছতে আত্মার এই পরিভ্রমণ হয়ে থাকে। যে আত্মা সত্ত্বগুণ ধারণ করে, সে মুক্তি পেয়ে যাবে। অন্যথায় এটি ধারণ করার জন্য তার পরিভ্রমণ অব্যাহত থাকবে।

আত্মা অবিনশ্বর—এই মূলনীতির ওপর নির্ভর করে হিন্দু গবেষকগণ জন্মান্তরবাদের ওপর যৌক্তিক প্রমাণাদি পেশ করেন। এর কয়েকটি এমন :

প্রথম প্রমাণ : বিশ্বচরাচর জন্মান্তরবাদের দর্শনকে সাব্যস্ত করে। সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র প্রতিটির উদয়াস্ত হয়। কখনো দৃশ্যমান হয়, আবার কখনো অদৃশ্য। তারকারাজি কখনো এই রাশিতে অবস্থান করে, আবার কখনো ওই রাশিতে। আর এসবের মতো একইভাবে আত্মারও পরিভ্রমণ সম্ভব।

এর উত্তরে বলা যায় : সূর্য কখনো চন্দ্রে পরিণত হয় না; আর চন্দ্রও কোনোদিন সূর্যে রূপান্তরিত হয় না। উভয়টি স্রষ্টার নির্দেশে দিগন্তে সন্তরণশীল। হে হিন্দুরা, কী ব্যাপার! তোমাদের আত্মা একবার মানুষের দেহে প্রবেশ করছে; আবার কখনো কুকুর-শূকরের দেহে। একটু প্রকৃতির সঙ্গে আত্মার তুলনা করে দেখো তো!

দ্বিতীয় প্রমাণ : যদি জন্মান্তরবাদ সত্য না হতো, তাহলে প্রতিটি মানবশিশু একই বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করত। কেন তাদের একজন অন্ধ, আরেকজন খোঁড়া, অন্যজন বধির ও আরেকজন সুস্থ হিসেবে জন্মগ্রহণ করবে। অন্যথায় বলতে হবে, স্রষ্টা অযথা একজন শিশুকে বিপদাক্রান্ত করেছেন, তিনি ন্যায়বিচার করেননি; অথচ স্রষ্টার জন্য এটা অসম্ভব।

এর উত্তরে বলা যায় : যদি পুনর্জন্মতত্ত্বের কারণেই মানবশিশুর এই ভিন্নতা হয়,

[১২০] বিস্তারিত জানতে দেখুন *সত্যার্থ প্রকাশ*, অষ্টম অধ্যায়, জগতের সৃষ্টি।

তাহলে যৌবনে কেন একজন মানবসন্তানের শরীরে পরিবর্তন আসে? কেনই-বা পৌঢ়ত্বে দুর্বলতা আসে; আর কেনই-বা বার্ধ্যক্যে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয় বা অন্ধ হয়। তাহলে কী জীবন্ত অবস্থায় তার আত্মা বেরিয়েছে এবং তদস্থলে অন্য আত্মা স্থান দখল করেছে? তোমরা তো শুধু মৃত্যুর পর আত্মার পরিভ্রমণের প্রবক্তা। আর সদ্যভূমিষ্ট শিশুর গুণাবলির ভিন্নতা এটি তার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত, যা তোমরাও স্বীকার করো।

তৃতীয় প্রমাণ : তারা বলে, পুনর্জন্মে বিশ্বাস না করলে আত্মাকে নশ্বর মানতে হয়; অথচ এটি অবিনশ্বর।

এর উত্তর : এই প্রমাণ তাদের আরেকটি ভ্রান্ত দর্শনের ওপর স্থাপিত। সেটি হচ্ছে, আত্মার অবিনশ্বর হওয়ার দর্শন। ফলে সৃষ্টির জন্য স্রষ্টার আত্মার মুখাপেক্ষী হওয়া প্রমাণিত হবে; অথচ তিনি সবকিছু থেকে অমুখাপেক্ষী। হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাসমতেও তিনি সর্বশক্তিমান।

এই প্রমাণের বিরুদ্ধে কুরআনের এই আয়াত উপস্থাপন করা যায়—

﴿وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ۖ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ﴾

তারা আপনাকে রুহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন, রুহ আমার প্রভুর আদেশে ঘটিত। [সুরা বনি ইসরাইল : ৮৫]

চতুর্থ প্রমাণ : তারা বলে, যারা জন্মান্তরবাদ অস্বীকারপূর্বক সামান্য ইহকালীন কর্মের বিনিময়ে চিরস্থায়ী স্বর্গ বা নরকের প্রবক্তা, তারা যেন আল্লাহর বিচারের ব্যাপারে বে-ইনসাফির দাবি করছে। তাই আল্লাহর বিচারকে ইনসাফপূর্ণ প্রমাণ করতে হলে পুনর্জন্মে বিশ্বাস করতে হবে।

এর উত্তর : শাস্তি ও প্রতিদান স্থানকালের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়; বরং ভালো-মন্দের প্রভাবের ভিত্তিতেই এটি নিরূপিত হয়। সমাজে আমরা দেখি, মানুষ কত বিশাল কাজও প্রতিদানহীন সম্পন্ন করে; আবার কখনো নিতান্ত সামান্য কাজ, যা সমাজে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করে এবং এর জন্য বিশাল প্রতিদান পেয়ে যায়।

অপরদিকে যারা পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে, তারা তো বলে—মুক্তিপ্রাপ্ত আত্মা উর্ধ্বজগতের সঙ্গে মিলিত হয় এবং চিরস্থায়ী শান্তিপ্রাপ্ত হয়। সেটি পুনর্বার পৃথিবীতে ফিরবে না। এটি কি সীমিত কাজের বিনিময়ে অসীম প্রাপ্তি নয়?

মূলত এটাই হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মমতে পুনর্জন্মের বিশ্বাস।

১. ইসলামের নামে ভ্রান্ত পুনর্জন্মবাদ

ইসলামের নামে প্রচলিত কয়েকটি মতবাদেও এই বিশ্বাসের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। আবু মুহাম্মাদ ইবনু হাজম বলেন, 'আত্মার পরিভ্রমণের প্রবক্তারা পুনরায় দুটি দলে বিভক্ত হয়েছেন। একটি দল মনে করে, আত্মা এক দেহ থেকে আলাদা হওয়ার পর অন্য দেহে চলে যায়। এমনকি ভিনজাতীয় দেহেও গমন করে।'

এটি আহমাদ ইবনু হাবিত এবং তার শিষ্য আহমাদ ইবনু নামুস ও আবু মুসলিম খোরাসানি এই মতের প্রবক্তা। মুহাম্মাদ ইবনু জাকারিয়া রাজি তার রচিত *আল-ইলমুল ইলাহি* গ্রন্থে এই মত গ্রহণ করেছেন। এটি কারামিতাদেরও বক্তব্য। রাজি তাঁর কোনো এক গ্রন্থে বলেন, 'হত্যা ও জবাই ছাড়া প্রাণীর দেহ থেকে কোনো আত্মার যদি মানুষের দেহে যাওয়ার উপায় থাকত, তাহলে কোনো প্রাণী জবাই করা বৈধ হতো না!'

ইবনু হাজম বলেন, 'এটি প্রমাণবিহীন একটি ভ্রান্ত দাবি।'

তারা পাপ-পুণ্যের প্রতিদান হিসেবে জন্মান্তরবাদের মতবাদ লালন করেন। তারা মনে করেন, পাপাচারী ও মন্দকর্ম সম্পাদনকারীদের আত্মা নোংরা প্রাণীর দেহে স্থানান্তরিত হবে। এমন প্রাণীর দেহে স্থান নেবে, যেগুলো মানুষ কঠিন কাজে ব্যবহার করে বা জবাই করে। আর যাদের সব কাজ শধুই মন্দ, কল্যাণের ছিটেফোঁটাও নেই, তাদের ব্যাপারে এই মতবাদের প্রবক্তাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়। কেউ কেউ বলেন, এরা সাক্ষাৎ শয়তান।

আহমদ ইবনু হাবিত বলেন, 'এরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং সেখানে চিরদিন শাস্তি ভোগ করবে।' একইভাবে যাদের সব কাজ পুণ্যময়, পাপের ছিটেফোঁটাও যাদের নেই, তাদের ব্যাপারেও মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এরা ফেরেশতা-শ্রেণির। আহমাদ ইবনু হাবিত বলেন, 'নিঃসন্দেহে এরা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং চিরস্থায়ী নিয়ামত ভোগ করবে।'

ইসলামের বেশধারী এই দলটি তথা আহমাদ ইবনু হাবিত ও আহমাদ ইবনু নামুস প্রমাণ হিসেবে মহান আল্লাহর এই বাণী পেশ করেন,

﴿يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ۝ الَّذِيْ خَلَقَكَ فَسَوّٰىكَ فَعَدَلَكَ ۝ فِيْۤ اَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ﴾

হে মানুষ, কীসে তোমাকে তোমার মহামহিম পালনকর্তা সম্পর্কে

বিভ্রান্ত করল? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, এরপর তোমাকে সুবিন্যস্ত করেছেন এবং সুষম করেছেন। তিনি তোমাকে তার ইচ্ছামতো আকৃতিতে গঠন করেছেন। [সুরা ইনফিতার : ৬-৮]

আল্লাহ আরও বলেন,

﴿جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا ۚ يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ ۚ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ﴾

তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য যুগল সৃষ্টি করেছেন এবং চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্য থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন। এভাবে তিনি তোমাদের বংশবিস্তার করেন। [সুরা শুরা : ১১]

ইবনু হাজম আরও বলেন, এদের মধ্যে যারা ইসলামের দাবিদার নয় তারা বলে, আত্মা অবিনশ্বর। বিশ্ব এক মুহূর্তের জন্যও ধ্বংস হবে না। তাই আত্মা সর্বদা পরিভ্রমণকারী; আর আত্মার জন্য তার প্রথম দেহের অনুরূপ দেহে ভ্রমণ ভিনজাতীয় দেহে পরিভ্রমণের চেয়ে ভিন্ন নয়।[১২১]

এই মতবাদের প্রবক্তারা যেসব প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন, তা খণ্ডন করারও উপযুক্ত নয়। কেননা, এগুলো যেমন উম্মাহর ইজমাবিরোধী বক্তব্য, একইভাবে এগুলো হিন্দু ও ব্রাহ্মণদের অনুসরণের নামান্তর। ইসলাম এ ধরনের কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণা থেকে পবিত্র।

২. জন্মান্তরবাদ নিয়ে হিন্দুদের বিরোধ

যদিও এ ধর্মবিশ্বাসটি হিন্দুদের মধ্যে বেশ প্রসিদ্ধ, তবে শুরুর দিকে এটি তাদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ছিল না। একইভাবে বিবেকবহির্ভূত হওয়ায় আধুনিক যুগের হিন্দুদের মধ্যে এ ধরনের কুসংস্কারগুলো নিয়ে বিরোধ শুরু হয়েছে। যেমন, *পরলোক আওর পুনর্জনম* গ্রন্থে এর লেখক জয়দয়াল গোয়েন্দকাজি এমন একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন, যা পুনর্জন্মের প্রমাণ বহন করে। কিন্তু এই ঘটনাতেই এ কথার স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ ব্যাপারে ফেরেশতা ও স্রষ্টার নৈকট্যভাজনদের বিস্তর মতবিরোধ রয়েছে।

গল্পটির ভাষ্য এমন, ঋষি বাজশ্রবস দুগ্ধ দোহনে অনুপযুক্ত গাভি দান করে দিতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, এতে তার পুণ্য হবে। তবে তার পুত্র নচিকেতা তার এ

[১২১] *আল ফাসলু ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়ায়ি ওয়ান নিহাল* : ১/৯০-৯১।

কাজে বাধ সাধে। ফলে ক্ষুব্ধ পিতা তাকে মৃতদের জগতে পাঠিয়ে দেন। সেখানে হিন্দু মৃত্যুদেবতা যমের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। মৃত্যুর দেবতা এই মেধাবী ছেলের আগমনে অত্যন্ত আনন্দবোধ করেন। যমরাজ তাকে বলেন, 'তোমার যা ইচ্ছা প্রশ্ন করো।' নচিকেতা তাকে প্রশ্ন করে, 'মৃত্যুর পরে মানুষের কী হয়, এ নিয়ে পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে বেশ মতবিরোধ আছে। তাদের কেউ মনে করে মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা অবশিষ্ট থাকে; আবার কেউ তা অস্বীকার করে। এর বাস্তবতা কী?' যমরাজ বলেন, 'বৎস, বিষয়টি অত্যন্ত জটিল ও সাধারণের বোধগম্যতার উর্ধ্বে। এমনকি স্বর্গীয় দূত ও ঈশ্বরের নিকটভাজনরাও এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগেন—মৃত্যুর পর আত্মার কী পরিণতি হয়! তুমি অন্য একটি প্রশ্ন করো!' কিন্তু নচিকেতা বার বার এ ব্যাপারে জানতে চাইলে যমরাজ তাকে উত্তর জানিয়ে দেন।

এ ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয়, পুনর্জন্মের বিশ্বাসটি প্রথমদিকে হিন্দু-দর্শনে স্বীকৃত বিষয় ছিল না। অন্যথায় মৃত্যুর দেবতা যমরাজ প্রথমে এ ব্যাপারে উত্তর দিতে দ্বিধাবোধ করতেন না। তিনি তাকে এ কথা বলতেন না, 'স্বর্গীয় দূত ও ঈশ্বরের নিকটভাজনরাও এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগেন।'

একইভাবে আধুনিককালের বিভিন্ন হিন্দু গবেষক পুনর্জন্মের মতবাদকে অস্বীকার করেন। তারা *বেদ* গ্রন্থসমূহ থেকে এমন কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরেন, যা পুনর্জন্মের মতবাদের পরিবর্তে পুনরুত্থান ও বিচার-দিবসের প্রতি ইঙ্গিত করে।

ঋগ্বেদে বলা হয়েছে, 'তোমরা সূর্যকে প্রাপ্তির চেষ্টা করো, তাহলে আগুনের সম্মান বুঝতে পারবে। আমাদের অবতার ভার্ত, ভিকু ও মাতরিশো প্রত্যেকেই দুটি জীবনে বিশ্বাস করেন।'[১২২] অর্থাৎ, ইহকালীন জীবন ও পরকালীন জীবন।

ঋগ্বেদে আরও বলা হয়েছে, 'যেহেতু আমি তোমাদের অবিনশ্বর আহার গ্রহণের অনুমতি দিয়েছি হে অগ্নি, তুমি এমন দলের অন্তর্ভুক্ত হও, যারা অবিনশ্বর জীবন অর্জনের চেষ্টা করছে।'[১২৩]

এই হলো *বেদ* গ্রন্থসমূহের ভাষ্যমতে জন্মান্তরবাদের বিশ্বাস, যেটি প্রখ্যাত হিন্দুধর্মতত্ত্ববিদ ও আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দের মতবাদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। যদিও অধিকাংশ হিন্দু দয়ানন্দের মতবাদ গ্রহণ করেছে।

যারা দয়ানন্দ[১২৪] ও তার অনুসারীদের মতবাদের বিরোধিতা করেন, তাদের

[১২২] *ঋগ্বেদ* : ১/১১/৬০/১০।

[১২৩] প্রাগুক্ত : ১/৯/৪৪/৫।

[১২৪] দয়ানন্দের জন্ম ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দে আর মৃত্যু ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে।

সংখ্যাও একেবারে কম নয়। তন্মধ্যে ভারতের আধুনিককালের প্রখ্যাত লেখক রাহুল সাংকৃত্যায়ন বলেন, 'উপনিষদের যুগে যারা পুনর্জন্মের মতবাদের অবতারণা করেছিলেন, তারা হয়তো এ কথা ভাবেননি যে, এ দর্শনটি ভবিষ্যতে কোনো একসময় দ্বিধাদ্বন্দ্বের জন্ম দেবে এবং তা বিবেকবহির্ভূত বলে গণ্য হবে।'

ডক্টর ফরিদা চৌহান বলেন, '*বেদ গ্রন্থসমূহে* যদিও পুনর্জন্মের কথা বলা হয়েছে, তবে সেটি একবার সংঘটিত হবে, অসংখ্যবার নয়।'[১২৫] অর্থাৎ, *বেদ গ্রন্থসমূহে* পুনর্জন্ম বলতে পুনরুত্থান-দিবসকে বোঝানো হয়েছে।

সত্যপ্রকাশ বলেন, 'আমি পুনর্জন্মের প্রবক্তাদের চ্যালেঞ্জ করছি, এ ধর্মবিশ্বাসের কথা *বেদ গ্রন্থসমূহে* বলা হয়নি।'

দিল্লি থেকে প্রকাশিত ইসলামি ম্যাগাজিন কান্তিতে লেখা প্রবন্ধের সূত্র ধরে আমার পরিচয় হয় হিন্দু পণ্ডিত দ্বারকা শংকরের সঙ্গে। এই হিন্দু পণ্ডিত মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুদের বিদ্বেষ কমিয়ে আনতে *বেদ গ্রন্থসমূহে* কুরআনিক শিক্ষা প্রমাণের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। বেশ কিছু ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত সাফল্যের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হন। ফলে বহু হিন্দু যুবক এখন কুরআন অধ্যয়ন করে। এই পণ্ডিত বলেন, 'আমি মাঝেমধ্যে খুবই অবাক করার মতো একটি প্রশ্নের মুখোমুখি হই। সেটি হচ্ছে, *বেদ গ্রন্থসমূহে* পরকাল-দিবসের আলোচনা করা হয়েছে কি না?' তিনি বলেন, 'এই প্রশ্নটি কেমন যেন সেই প্রশ্নের মতো, দেহের মধ্যে আত্মা আছে কি না? কেননা, *বেদ গ্রন্থসমূহ* পরকাল-দিবসের আলোচনায় পরিপূর্ণ।'

এই হলো অধিকাংশ হিন্দুর অন্তরে লালিত জন্মান্তরবাদের স্বরূপ। জানি না, এসবের ব্যাপারে তারা কী বলবেন। আল্লাহ বলেন,

﴿وَاللّٰهُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ﴾

আল্লাহ যাকে চান তাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। [সুরা বাকারা : ২১৩]

চার. কর্মদর্শন

এটি মানবকর্মের প্রতিফলবিধি, যা এ কথার সিদ্ধান্ত দেয় যে, মানুষ যদি তার জীবনের কোনো এক পর্বে সৎকর্ম করে, তাহলে সে পরজনমে এর প্রতিদান পাবে। আর যদি দুষ্টকর্ম করে, তাহলে পরজনমে এর প্রতিফল ভোগ করবে।

[১২৫] *আত-তানাসুখ ওয়াল ফিদা* : ৯৩।

য়োগাবশিষ্ঠ গ্রন্থে এসেছে, 'বিশ্বচরাচরে পাহাড়, নদী বা আকাশ—এমন কোনো স্থান নেই, যেখানে মানুষ তার ভালো-মন্দ কর্মফল থেকে পলায়ন করতে পারে।'

কর্মের ধারণা থেকেই পুনর্জন্ম মতবাদের উৎপত্তি ঘটেছে। এ জগতে কখনো দেখা যায় অত্যাচারী ব্যক্তি তার অপরাধের সাজা ভোগ করা ছাড়াই মৃত্যুবরণ করে। তাই হিন্দুরা বাধ্য হয়ে পুনর্জন্ম বিশ্বাসের প্রবর্তন করেছে, যেন কেউ তার কর্মফল থেকে পালাতে না পারে।

কর্ম তিন প্রকার :

প্রথম প্রকার : প্রারব্ধ কর্ম।

দ্বিতীয় প্রকার : সঞ্চিত কর্ম।

তৃতীয় প্রকার : ক্রিয়মাণ কর্ম।

প্রারব্ধ কর্ম : যে কর্ম ফলদানের জন্য বর্তমান জনমে প্রস্তুত আছে, নিঃসন্দেহে মানুষ তা প্রাপ্ত হবে।

সঞ্চিত কর্ম : বর্তমানের আগে এই জন্মে যা কিছু করা হয়েছে; অথবা আগের অনেক মনুষ্যজন্মে করা কাজ, যা সংরক্ষিত হয়ে আছে, যার প্রতিফল প্রাপ্তি সম্ভব, তাকে সঞ্চিত কর্ম বলে।

ক্রিয়মাণ কর্ম : বর্তমানে যে কর্ম করা হচ্ছে, যার প্রতিফল ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে, তাকে ক্রিয়মাণ কর্ম বলে।

এতৎসত্ত্বেও কতেক হিন্দু পণ্ডিত মনে করেন, অনেক সময় কর্ম তার নির্দিষ্ট জনমে ফলদায়ক হয় না। কখনো কিছু কর্মের উল্লেখযোগ্য কোনো ফল হয় না।

পাঁচ. নির্বাণের বিশ্বাস

নির্বাণ অর্থ মুক্তি পাওয়া। যদি আত্মা পর পর কয়েক জনমে সৎকর্মপরায়ণ থাকে, তাহলে তার আর পুনর্জন্মের প্রয়োজন হয় না। তখন সেটি নির্বাণলাভ করে এবং স্রষ্টার সঙ্গে মিলিত হয়।

কৃষ্ণ বলেন, 'যে আমার অসীম কর্মক্ষমতার ধারণা লাভ করবে, সে দেহত্যাগের পর পুনর্বার জন্মলাভ করবে না; বরং সে আমার অবিনশ্বর সত্তায় প্রবেশ করবে।'[১২৬]

এখান থেকেই ওয়াহদাতুল ওজুদ তথা সর্বেশ্বরবাদ তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে। সুফিদের

[১২৬] *গীতা* : শ্লোক-৯।

ভাষায় এটি এভাবে বিবৃত হয়েছে, 'কুকুর ও শূকরের সত্তাও আমাদের প্রভু ছাড়া কিছু নয়; আর আল্লাহর সত্তাও গির্জার পাদরির সত্তা-ভিন্ন নয়।'

ইবনুল আরাবি বলেন, 'আমার চক্ষু তাকে ছাড়া অন্য দিকে নিক্ষিপ্ত হয় না; আর আমার কান তো তার বাণী ছাড়া কিছু শুনে না।'

হিন্দু জনমের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হওয়া। কেননা, আত্মা দেহ থেকে বিচ্যুত হয়ে অন্য দেহে স্থানান্তরিত হতে থাকে। একসময় কামনা-বাসনা থেকে মুক্তি লাভ করে তা নির্বাণলাভ করে। তখন সে যেখান থেকে বের হয়েছিল সেখানে চলে যায়। হিন্দুদের ভাষায় তা ব্রহ্মার সঙ্গে মিলিত হয়; আর সুফিগণের ভাষায় তা ফানা লাভ করে।

দয়ানন্দ বলেন, 'আত্মা নির্বাণলাভের পর উর্ধ্বজগতে সুখ ভোগ করতে থাকে। এর পর কর্ম হিসেবে সে আবারও দেহধারণ করে নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ করে। কেননা, আত্মা অবিনশ্বর যা ধ্বংস হয় না।'

নিঃসন্দেহে বলা যায়, সুফি-দর্শন বহুলাংশে হিন্দু ধ্যানধারণার মাধ্যমে প্রভাবিত হয়েছিল। তাই মানসুর হাল্লাজ ও ইবনুল আরাবির ওয়াহদাতুল ওজুদ তথা সর্বেশ্বরবাদ ও স্রষ্টার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার দর্শনগুলো *বেদান্ত* থেকে নির্গত হয়েছিল। সেটি খলিফা মামুনের যুগে দারুল হিকমার মাধ্যমে আরবিতে অনূদিতও হয়েছিল।

ইবনুল আরাবি জন্মভূমি স্পেন ছেড়ে আসার পর দীর্ঘদিন প্রাচ্যে অবস্থান করে সেখানকার শায়খগণের কাছ থেকে তাসাওউফের প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেন। পরে মক্কায় অবস্থানকালে *আল-ফুতুহাতুল মাক্কিয়া* গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর এই গ্রন্থের ভাষ্য অনেকটা ভারতীয় সুফি-দর্শনের অনুরূপ। তিনি দাবি করতেন, 'মুহাম্মাদি সত্তা ওয়াহদাতুল ওজুদেরই আরেক রূপ।'

পাঠক একটু ভেবে দেখুন, ইবনুল আরাবির বক্তব্য—'এ কথার বিশ্বাস পোষণ—প্রতিটি ধর্মবিশ্বাসই সত্য, এমনকি গাছ ও পাথরের পূজার বিশ্বাস হলেও'—এটি কী *বেদান্তের* সেই বক্তব্যের অনুরূপ নয়, যার শেষে প্রতিটি দর্শন ঈশ্বর পর্যন্ত পৌঁছায়?

প্রাচ্যবিদদের কেউ কেউ জোর দিয়ে বলেন, আকবারি তরিকা[১২৭] বস্তুত ষষ্ঠ হিজরি শতকে এর প্রতিষ্ঠাতা মুহিউদ্দিন ইবনুল আরাবির হাত ধরে ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এরপর এটি ভারতের মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।[১২৮]

---

[১২৭] ইবনুল আরাবির তরিকা, তিনি শায়খে আকবার উপাধিতে ভূষিত ছিলেন।

[১২৮] *মাকালুত তরিকাতিল আকবারিয়া* : ৩০৬, ড. আবুল ওয়াফা তাফতাজানি। ইবনুল আরাবির অষ্টম

এটাও অসম্ভব নয় যে, ইবনুল আরাবি তাঁর ওয়াহদাতুল ওজুদের শায়খ মানসুর হাল্লাজের মতো ভারতীয় দর্শনের দীক্ষা নিতে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। অবশ্য এসব দাবি প্রমাণের জন্য শক্ত প্রমাণ প্রয়োজন।

ইতিহাসবিদ গোল্ডজিহর জোর দিয়ে দাবি করেছেন, ভারতবর্ষের ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে ইসলামি সুফিবাদের সম্পর্ক রয়েছে। তিনি বলেন, 'সুফিদের মধ্যে প্রচলিত বহু ধর্মীয় সাধনা, আত্মহারা হওয়া ও আত্মসাধনার পন্থা সবগুলোই ক্রেমারের ভাষ্যমতে ভারতীয় দর্শন থেকে ব্যুৎপত্তি লাভ করেছে।'[১২৯]

অপরদিকে নির্বাণের মাধ্যমে মানবসত্তা পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়। তাই মৃতদেহকে জ্বালিয়ে দেওয়ার রীতি এসেছে, যার মাধ্যমে পার্থিব দেহ থেকে আত্মাকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং তার উর্ধ্বারোহণ সম্ভব হয়। এ ছাড়া আগুন হচ্ছে ঈশ্বর-অগ্নির স্মারক। এটি আত্মাকে পরমেশ্বরের সত্তার দিকে নিয়ে যায়।

জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থ।

[১২৯] *আল-আকিদা ওয়াশ শারিয়াহ ফিল ইসলাম* : ১৬১-১৬৪।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৌদ্ধধর্ম : ইতিহাস ও ধর্মবিশ্বাস

- বৌদ্ধধর্ম আবির্ভাবের ইতিহাস
- গৌতম বুদ্ধের শিক্ষাসমূহ
- বৌদ্ধধর্মে স্রষ্টার ধারণা
- বৌদ্ধ ধর্মমতে উপাসনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

বৌদ্ধধর্ম আবির্ভাবের ইতিহাস

এক. গৌতম বুদ্ধের পরিচয়

বুদ্ধ মতবাদ ভ্রম ও কল্পনাসৃষ্ট একটি ব্যর্থ দর্শন, যা মানবপ্রজন্মের প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করে না। এটি ধর্মের তুলনায় জীবন-দর্শন হিসেবে বেশি যথার্থ। এ ধর্ম কামনা, চাহিদা ও দুঃখ-বেদনার পরিবর্তে সন্ন্যাস ও বৈরাগ্যকে প্রাধান্য দেয়। এর প্রতিষ্ঠাতা বিবেক ও যুক্তিহীন আবেগি গল্প ও রূপকথার মাধ্যমে আবিষ্ট ছিলেন।

কথিত আছে, তিনি দক্ষিণ নেপালের কপিলাবস্তুর সন্নিকটে লুম্বিনি নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা শুদ্ধোধন ছিলেন শাক্যের রাজা।[১৬০] ইতিহাসে পাওয়া যায়, শাক্যের তৎকালীন রাজা ছিলেন বুদিয়া ও দান্দবানি। ইতিহাসবিদগণ এই দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য বহুবিধ ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, শাক্য সাম্রাজ্য ছিল প্রজাতন্ত্র। তাদের সংসদের প্রতিনিধিদের সম্রাট নামে অভিহিত করা হতো।

বুদ্ধদর্শন গ্রন্থের লেখকও এমন ব্যাখ্যার প্রয়াস চালিয়েছেন।[১৬১] কিন্তু এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করা অনেকটাই দুষ্কর। কেননা, প্রাচীন যুগে ভারতের কোনো অঞ্চলে গণতন্ত্র-দর্শন প্রচলিত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বুদ্ধ[১৬২] ও তার ঐতিহাসিক অস্তিত্ব নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে বিস্তর মতবিরোধ

[১৬০] ইতিহাসবিদ গুস্তাভ লে বন বলেন, 'গৌতম বুদ্ধ ইসা আ.-এর মতো কুমারি মায়ের গর্ভে জন্মলাভ করেছিলেন। (*হাজারাতুল আরব* : ৩৪৪) তবে এটি স্পষ্ট মিথ্যাচার। হিন্দু ও বৌদ্ধ ইতিহাসবিদগণ একমত যে, গৌতম বুদ্ধের জন্ম স্বাভাবিকভাবেই পিতা-মাতার ঘরে হয়েছিল। ভারতবর্ষের ধর্মতত্ত্ব গবেষণা করা বিভিন্ন আরব গবেষকগণ গুস্তাভ লে বন থেকে এই মত গ্রহণ করেছেন।

[১৬১] *বুদ্ধদর্শন* : ১৯। বৌদ্ধধর্ম-সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ লেখক রাহুল সাংকৃত্যায়ন এই গ্রন্থের রচয়িতা।

[১৬২] বুদ্ধ (Budha) শব্দের অর্থ জ্ঞানী, জাগ্রত, জ্ঞানপ্রাপ্ত। তার মূল নাম সিদ্ধার্থ। তার জন্মকাল নিয়ে বেশ

পাওয়া যায়। কেননা, তার শিক্ষাগুলো তার মৃত্যুর তিন শতক পর সম্রাট অশোকের সময় সংকলন করা হয়েছিল।[১৩৩] সম্রাট অশোক খ্রিস্টপূর্ব ২৭৩ সালে ক্ষমতারোহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন খ্রিস্টপূর্ব আড়াই শতকের ভারতবর্ষের সম্রাট এবং বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারক। তিনি চীন, জাপান, তিব্বত, শ্রীলঙ্কা, বার্মাসহ বিভিন্ন দেশে বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারকদের পাঠান। তিনিই সেই অন্ধকার যুগে লোকমুখে প্রচলিত বুদ্ধের শিক্ষাগুলো প্রস্তরফলকে লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দেন। এসবের কিছু কালের বিবর্তনে হারিয়েছে; আর যা কিছু অবশিষ্ট আছে, সম্রাট অশোক কর্তৃক সংকলনকালে এসব শিক্ষার যথাযথ যাচাই-বাছাই সম্পন্ন না হওয়ায় নিশ্চিতভাবে বিশ্বাসযোগ্য মানের হয়নি। তা ছাড়া হিন্দুদের মধ্যে একটি বিশ্বাস প্রচলিত ছিল, সেখানে যত সঠিক চিন্তাদর্শন রয়েছে এর উৎস হলো *বেদান্ত*।[১৩৪] আর সাধু-সন্ন্যাসীরা সাধারণত যাচাই-বাছাই ছাড়াই যেকোনো জ্ঞান ও প্রজ্ঞার বাণী দ্বারা প্রভাবিত হন। ফলে তারা যুক্তি ও বিবেকবহির্ভূত বহু ধর্মবিশ্বাস গ্রহণ করেছেন। এ ছাড়া বৌদ্ধধর্মীয় সাধু-সন্ন্যাসীরা গ্রামেগঞ্জে বুদ্ধের এসব শিক্ষার প্রচার করে বেড়াতেন।

দুই. বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তককে ঘিরে প্রচলিত কিছু লোকগাথা

কথিত আছে, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর একবার তিনি তার প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে একজন জীর্ণশীর্ণ বৃদ্ধ ব্যক্তির দেখা পান। দ্বিতীয় দিন বেরিয়ে তিনি একজন অসুস্থ ব্যক্তির সাক্ষাৎ পান। একইভাবে তৃতীয় দিন তিনি একটি মৃতদেহকে শেষকৃত্য পালনের জন্য নিয়ে যেতে দেখেন। তখন তিনি তার দেহরক্ষীকে বার্ধক্য, অসুস্থতা, মৃত্যু এবং এসবের কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। দেহরক্ষী জানায়, প্রতিটি সৃষ্টজীবেরই শেষ পরিণতি হচ্ছে বার্ধক্য, অসুস্থতা ও পরবর্তী সময়ে মৃত্যু। এসব জেনে বুদ্ধ এই জগৎ ও জীবনের প্রতি মহাবিরক্ত হয়ে ওঠেন। এরপরই তিনি জরা, বার্ধক্য ও মৃত্যু থেকে মুক্তি পেতে জঙ্গলের উদ্দেশে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পড়েন।

মতবিরোধ রয়েছে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী মন্তব্য করেছেন। তবে প্রায় সবাই একমত যে, তার জন্ম হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ খ্রিষ্টাব্দে।

[১৩৩] বুদ্ধের শিক্ষাসমূহের প্রাচীন প্রামাণ্যগ্রন্থ পালি ভাষায় রচিত *ত্রিপিটক*। এর অর্থ আইনকানুন। গ্রন্থটি খ্রিস্টপূর্ব ২৪১ সালে সংঘটিত বৌদ্ধসভায় উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল। সেই বৈঠক এ কথার স্বীকৃতি দেয় যে, এই প্রামাণ্যগ্রন্থে যা কিছুর উল্লেখ করা হয়েছে, তা বুদ্ধের শিক্ষা। এই গ্রন্থের কিছু অংশ আরবিতে *ইনজিল বুদ্ধা* নামে প্রকাশিত হয়েছে।

[১৩৪] হিন্দু ধর্মমতে একটি পবিত্র গ্রন্থ। হিন্দুধর্মের আলোচনায় এর উল্লেখ করা হয়েছে।

বুদ্ধদর্শন গ্রন্থের রচয়িতা গৌতম বুদ্ধের উদ্ধৃতিতে এই গল্পের অবতারণা করেছেন। বৌদ্ধধর্মের প্রায় সব গ্রন্থে এই গল্পের উল্লেখ আছে।

আমি জানি না, এ ধর্মের অনুসারীরা কীভাবে তাদের মহান স্রষ্টার ব্যাপারে এ ধরনের গল্পের অবতারণা করে, যিনি ৩০ বছর বয়সে উপনীত হয়েও বার্ধক্য, অসুস্থতা ও মৃত্যুর স্বরূপ সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। এসবের বাস্তবতা জানতে তার দেহরক্ষীকে প্রশ্ন করতে হয়। একপর্যায়ে এসব থেকে মুক্তি পেতে তিনি সন্ন্যাসজীবন অবলম্বন করেন। এটা কীভাবে সম্ভব? মানবসত্তা কি প্রাকৃতিক নীতির বিরুদ্ধে যেতে পারে?

এভাবেই গৌতম বুদ্ধ বার্ধক্য, অসুস্থতা ও মৃত্যু এড়ানোর ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়ে যান। তিনি সন্ন্যাসজীবনে বিভিন্ন কষ্ট-ক্লেশের মুখোমুখি হন। শীত-গ্রীষ্মের যন্ত্রণায় নিজেকে আপতিত করেন। সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে থেকে দীর্ঘ ছয় বছর পানাহার থেকে বিরত থাকেন। নিজের লক্ষ্য অর্জনে এক জঙ্গল থেকে অপর জঙ্গলে যাত্রা করেন। এ দীর্ঘ পরিশ্রমে তিনি শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন। এরপর তিনি স্বাচ্ছন্দ্যের জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে নিজের সাম্রাজ্যে ফিরে আসার পরিকল্পনা করেন।

কথিত আছে, এই অবস্থায় তিনি অতীত নিয়ে চরম নিরাশা ও হতাশায় ভুগছিলেন। একসময় তার সামনে পৃথিবীর সব তাৎপর্য উদ্ভাসিত হয় এবং তিনি বহু জ্ঞানের অধিকারী হন। তার অনুসারীদের মতে, এসব ছিল ঐশীজ্ঞান। তার সামনে তখন জল ও স্থলের সব অন্ধকার দূরীভূত হয়, জীবন-মৃত্যুর বাস্তবতা উদ্ভাসিত হয়। তিনি আবার নতুন করে উদ্যমী হন এবং সাধু-সন্ন্যাসীদের জীবন বেছে নেন। তিনি মানুষকে ধর্মের প্রতি আহ্বান করতেন এবং এই অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করেন।

তার শেষ উপদেশ ছিল, 'যে ব্যক্তি বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাস করবে, বৌদ্ধ-দর্শন লালন করবে, সে নির্বাণপ্রাপ্ত হবে।'

তার একান্ত ঘনিষ্ঠ শিষ্য আনন্দ গুরুর মৃত্যু আসন্ন দেখে কান্নাকাটি শুরু করেন। তখন বুদ্ধ তাকে লক্ষ করে বলেন, 'হে আনন্দ, যে ব্যক্তি নিজের জন্য মশালে পরিণত হবে, সে সঠিক রাস্তা পেয়ে যাবে। যে নিজের জন্য আশ্রয়স্থল হবে, সে আশ্রয় পেয়ে যাবে—আমার জীবদ্দশায় হোক অথবা মৃত্যুর পর। কেউ যেন নিজে ছাড়া অন্য কাউকে আশ্রয়স্থল মনে না করে, অন্যকে মশাল হিসেবে গ্রহণ না করে এবং সত্যের সঙ্গে অবস্থান করে। যারা এ পথ অবলম্বন করবে, তারা

সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করবে। অবশ্য এর জন্য তাদের জ্ঞানের প্রতি অনুরাগী হতে হবে।'

এরপর তিনি তাকে বলেন, 'তুমি কান্না করবে না। পৃথিবীর প্রতিটি অস্তিত্বশীল বস্তু একদিন নিশ্চিহ্ন হবে। তুমি সাধনা করো, এর দ্বারা তুমি নির্বাণ লাভ করবে, যদি তুমি পাপমুক্ত হও। আমিই প্রথম বুদ্ধ নই এবং আমি সর্বশেষও নই। যত দিন আমার শিষ্যরা তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে, তত দিন এ ধর্মের প্রচার অব্যাহত থাকবে; আর যখন সত্যের আলো নির্বাপিত হবে, আরেকজন বুদ্ধের আগমন ঘটবে—যে আমার ধর্মের সংস্কার করবে—তার নাম হবে মাত্র। তোমাদের কেউ যেন এ কথার ধারণা না করে যে, আমার পর আর কোনো পথপ্রদর্শক থাকবে না। আমার এই ধর্মদর্শনই তার পথপ্রদর্শক ও গুরু।'

বুদ্ধের শেষ বাণী ছিল, 'প্রতিটি অস্তিত্বশীল বস্তুর পরিণতি হবে ধ্বংস। আমার শিষ্যরা, তোমরা পূর্ণরূপে আত্মিক সাধনা করবে, যা দ্বারা তোমরা নির্বাণ লাভ করবে।'

খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৩ সালে গৌতম বুদ্ধ মৃত্যুবরণ করেন।[১৩৫]

পাঠক হয়তো লক্ষ করেছেন, গৌতম বুদ্ধ তার জীবনের শেষ মুহূর্তেও মহান আল্লাহর ওপর ইমান আনয়ন করেননি। এমনকি তিনি তার অনুসারী বৌদ্ধভিক্ষুদেরও আল্লাহর ওপর ইমান আনয়নের নির্দেশ দেননি।

এ কারণে গবেষকরা মনে করেন, গৌতম বুদ্ধ ছিলেন ভ্রান্ত ধর্মবিশ্বাসী। তিনি এই ভ্রান্ত মতবাদ নিয়েই মৃত্যুবরণ করেছেন। যারা গৌতম বুদ্ধকে ভারতবাসীর নবি-রাসুল ছিলেন বলে মনে করেন, তাদের ধারণা বেশ অবাক করার মতো।

[১৩৫] *বিশ্ব ধর্মদর্শন*: ১৫১-১৫২।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গৌতম বুদ্ধের শিক্ষাসমূহ

গৌতমবুদ্ধ কোনো গ্রন্থ রচনা করেননি। তবে তিনি তার শিষ্যদের সামনে বক্তব্য ও উপদেশ দিতেন। তার শিষ্যরা এসব বক্তব্য সংকলনেরও কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। এমনকি বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থসমূহের বক্তব্য থেকে জানা যায়, গৌতম বুদ্ধ অনুসারীদের তার বক্তব্যসমূহ লিপিবদ্ধ করতে বারণ করতেন। তাই গৌতম বুদ্ধের বাণীসমূহ মুখে মুখেই প্রচলিত হয়েছিল। আবার ইতিহাসবিদগণ নিশ্চিত করে বলতে পারেননি গৌতমবুদ্ধ কোন ভাষায় কথা বলতেন।

এক. বুদ্ধের সর্বজনীন চতুরার্য সত্য শিক্ষা

এ কারণে কয়েক শতক অতিক্রান্ত হওয়ার পর গৌতম বুদ্ধের শিক্ষাসমূহে বিভিন্ন ধরনের বিকৃতি ও বিচ্যুতি তৈরি হয়। এর পরেও তার এমন কিছু শিক্ষা রয়েছে, যা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী সবাই সমানভাবে বিশ্বাস করে। যদিও এসবের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তাদের মধ্যেই আবার বিভিন্ন মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে গৌতম বুদ্ধের সর্বজনীন এই শিক্ষাগুলো বৌদ্ধদের মধ্যে 'চতুরার্য সত্য' নামে পরিচিত। সেগুলো হচ্ছে :

১. দুঃখ

গৌতম বুদ্ধ বলেছেন, 'জন্ম-দুঃখ, বার্ধক্য-দুঃখ, অসুস্থতা-দুঃখ, মৃত্যু-দুঃখ, প্রিয়জনের সান্নিধ্য না পাওয়া-দুঃখ।'

আমি বলব, গৌতম বুদ্ধ এই জগতের বাস্তবতা থেকে চোখ বন্ধ করে কুসুমপল্লব জীবনযাপনের ইচ্ছা করেছিলেন। যদি জগতের এসব সত্য দুঃখ হয়, তাহলে মানুষ কি নিজেকে এসব থেকে দূরে রাখতে পারবে? মানুষ কি প্রাকৃতিক নীতিমালার বাইরে নিজেদের সরিয়ে নিতে পারবে? আল্লাহ বলেন,

﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾

এটাই আল্লাহর প্রকৃতি, যার ওপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। [সুরা রুম : ৩০]

আর বৌদ্ধধর্মের দর্শন এই প্রকৃতির বিরুদ্ধে কিছু প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। গৌতম বুদ্ধ নিজেকে মৃত্যু থেকে পরিত্রাণ দিতে চেয়েছিলেন; কিন্তু এটা কি তার জন্য সম্ভব ছিল?

২. দুঃখের কারণ

তিনি বলেন, 'মিছে আশা ও মন্দ কামনাসমূহ মানুষকে নতুনভাবে জন্ম নিতে বাধ্য করে।'

৩. দুঃখ নিরোধের সত্য

তিনি বলেন, 'এটি কামনা-বাসনার দমন, অপ্রয়োজনীয় সামগ্রী পরিত্যাগ, পার্থিব সম্পর্ক ছিন্ন ও পরিপূর্ণ বৈরাগ্যের মাধ্যমে সম্ভব।'

বস্তুত, এখানেও গৌতম বুদ্ধ জীবনের বাস্তবতা থেকে পালিয়ে বেড়াতে চেয়েছেন। তিনি মানুষের ইচ্ছা ও কামনাকে কল্যাণ ও সৌভাগ্যের দিকে পরিচালিত করার পরিবর্তে সমূলে বিনাশ করতে চেয়েছিলেন। এ কারণে বৌদ্ধধর্মের সাধুরা কামনা-বাসনা থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে না পারলেও কৃত্রিমভাবে নপুংসক হয়ে যান। যদি পুরো মানবসমাজ এ পদ্ধতি অবলম্বন করে, তাহলে কীভাবে পৃথিবী ঠিক থাকবে এবং মানবপ্রজন্মের ভবিষ্যৎই-বা কী হবে? নিঃসন্দেহে গৌতম বুদ্ধ কামনার সঠিক অর্থ অনুধাবন করতে পারেননি। নাহয় তিনি এমন অস্বাভাবিক নির্দেশ দিতেন না, যা মানবপ্রকৃতি-বিরুদ্ধ।

আবার ইতিহাসও ভিন্ন বাস্তবতার সাক্ষ্য দেয়। রাতের অন্ধকারে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের কুকীর্তি, এমনকি আশ্রমগুলোতে তাদের প্রকাশ্য অনাচারগুলো কারও অজানা নয়; যা স্পষ্টভাবে বুদ্ধের অস্বাভাবিক পন্থা ও মানুষের স্বভাববিরুদ্ধ প্রক্রিয়ায় মুক্তিলাভের দর্শনের ব্যর্থতার প্রতি ইঙ্গিত করে।

৪. দুঃখ নিরোধের পথ

বৌদ্ধ ধর্মবেত্তাগণের মতে এর উপায় আটটি :[১০৩]

১. সম্যক দৃষ্টি বা দর্শন : চতুরার্য সত্যের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন।

২. সম্যক সংকল্প : নিজের সত্তাকে বিলীন করে সৃষ্টির সেবায় প্রত্যয়ী হওয়া।

এটি অর্জিত হবে তিনটি উপায়ে—দুনিয়ার মায়া ও ভোগ ত্যাগ, বিদ্বেষ পরিহার এবং হত্যা থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে।

৩. সম্যক বাক্য : উপকারী কথা বলা এবং অপ্রয়োজনীয় কথা থেকে বিরত থাকা।

৪. সম্যক আচরণ : অপবিত্র উপাদান থেকে দেহকাঠামো গঠিত হওয়ার ব্যাপারে চিন্তামগ্ন হওয়া।

৫. সম্যক জীবিকা : ভাবনার বিষয় হচ্ছে, বৌদ্ধ ধর্মবেত্তাগণ এই উপায় কোথায় পেলেন? তাদের সাধুরা যেখানে ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবনযাপন করেন! তাদের জন্য কোনো ধরনের পেশা অবলম্বন করা যেখানে অন্যায় হিসেবে দেখা হয়! অবশ্য এর ব্যাখ্যায় বলা যায়—একদিনের প্রয়োজনীয় জীবিকার চিন্তা করা।

৬. সম্যক প্রচেষ্টা : উপকারী কর্ম সম্পাদন করা।

৭. সম্যক স্মৃতি : বুদ্ধের আলোচনা ও তার জীবনীচর্চা।

৮. সম্যক সমাধি : বুদ্ধের ধ্যান করা। তাকে ধ্যানে উপস্থিত করার চেষ্টা করা ও তার মূর্তির দিকে তাকিয়ে ধ্যানমগ্ন হওয়া।

এসব উপায় অবলম্বন করে দুঃখ, জরা ও অস্থিরতা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। এসবের ভিত্তিতে বৌদ্ধ সাধুগণ ১০টি মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন। যথা :

- প্রাণিহত্যা নিষিদ্ধ।
- চুরি করা নিষিদ্ধ।
- মিথ্যা বলা নিষিদ্ধ।
- মদপান নিষিদ্ধ।
- মধ্যাহ্নের পর আহার নিষিদ্ধ।

[১০৩] বৌদ্ধদের পরিভাষায় এটি অষ্টাঙ্গিক মার্গ নামে পরিচিত। —অনুবাদক।

- গানবাজনা ও নৃত্য নিষিদ্ধ।
- সুগন্ধি ব্যবহার নিষিদ্ধ।
- রাস্তা বা উঁচু ভবনে বসা নিষিদ্ধ।
- সোনা বা রুপার উপহার গ্রহণ নিষিদ্ধ।

বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের কাছে এই ১০টি কাজ নিষিদ্ধ বলে পরিচিত।

দুই. বুদ্ধের শিক্ষা

হিন্দু ধর্মমতে স্বীকৃত শ্রেণিবৈষম্য বিশ্বাস করা যাবে না। সকল মানবসন্তানকে সমমর্যাদার মনে করতে হবে। হিন্দুদের প্রবর্তিত শ্রেণিবিভাজনের কোনো ভিত্তি নেই। মানুষের মর্যাদার মাপকাঠি হয় ব্যক্তির যোগ্যতা ও তার অতীতের কর্ম। এর পাশাপাশি যেকোনো শ্রেণির মানুষই মুক্তি পাবে, যদি সে প্রেম-ভালোবাসা ও ধ্যানের পথে চলে।

বুদ্ধের এসব শিক্ষা ভারতের দলিত হিন্দুদের বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নিতে ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

তিন. দুঃখের কারণসমূহ

বুদ্ধ বলেন, 'মানুষ যখন নিজেকে অন্য সবার চেয়ে বিশেষ জ্ঞান করতে শুরু করে, তখনই তার কষ্ট ও দুঃখ-দুর্দশা শুরু হয়। এ জগতের প্রতিটি বস্তু একই সূত্রে গাঁথা; পরস্পরের মধ্যে কোনো বিচ্ছিন্নতা নেই। নিজের ব্যক্তিত্বকে আলাদাভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘনের শামিল। মানুষ নিজের জন্য চেষ্টা করতে পারে; কিন্তু প্রকৃতির এই বিধি লঙ্ঘন করতে পারে না। এটি করতে গেলেই তার দিকে বিপদাপদ ধেয়ে আসে।'

বুদ্ধ আরও বলেন, 'এই কঠিন জগতে অজ্ঞ ব্যক্তিকেও ছাড় দেওয়া হয় না।'

মোটকথা, বুদ্ধের দর্শনমতে এ জগতে শান্তির চেয়ে দুঃখের পাল্লাই ভারী। তাই মানুষের জন্য জন্মগ্রহণ না করাই কল্যাণকর। এমনকি কোনো কোনো ধর্মবেত্তা বুদ্ধের শিক্ষাসমূহের আলোকে বলেছেন, 'তার মতে আত্মহত্যা করা বৈধ! কেননা, বেঁচে থাকলে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হবে!'

বৌদ্ধধর্মের অনুসারীরা বংশবিস্তারে আগ্রহী নয়। এ কারণে তাদের ধর্মীয় ভিক্ষুদের

জন্য বিয়ে করা নিষিদ্ধ। ফলে তারা কাউকে জন্ম দিতে পারে না।

আবুল আলা আল মাআররিও[১৩৭] সম্ভবত বৌদ্ধ-দর্শনে প্রভাবিত ছিলেন। এ কারণে তিনি তার সমাধিতে এই পঙ্‌ক্তি লিখে দিতে বলেছিলেন,

এটি হচ্ছে আমার সঙ্গে পিতার অপরাধ
(কারণ, পিতা আমাকে জন্ম দিয়ে ভুল করেছেন।)
আর আমি কারও প্রতি কোনো অপরাধ করিনি!

বৌদ্ধধর্মের অনুসারীদের পূর্ণরূপে শারীরিক কামনা ও চাহিদা থেকে মুক্ত হওয়া ব্যতীত নির্বাণ তথা মুক্তিলাভ করা সম্ভব নয়। তারা বলে, 'নির্বাণ লাভের শর্তসমূহের অন্যতম হলো নিজের আত্মার ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণলাভ, বাস্তবতার অনুধাবন, স্থিরতা, মনোযোগ ও ধ্যান।'[১৩৮]

[১৩৭] **আবুল আলা আল মাআররি :** এই দার্শনিক কবি সিরিয়ার মাআররাতুন নুমানে ৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দ—৩৬৩ হিজরিতে এক উচ্চশিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। আধুনিক ইউরোপীয় সমাজে তার বিশেষ খ্যাতি ও গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। চার বছর বয়সে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। ফলে তার বাম চোখ নষ্ট হয়ে যায় এবং ডান চোখ সাদা হয়ে যায়। প্রাথমিক শিক্ষা পিতার কাছ থেকে নেওয়ার পর আলেপ্পো, ত্রিপোলি এবং এন্টিয়ক ও সিরিয়ায় লেখাপড়া করেন। এরপর বাগদাদ গিয়ে গ্রিকদর্শন ও ভারতীয় দর্শনবিদ্যা অর্জন করেন।

নৈরাশ্যবাদী মুক্তচিন্তার যুক্তিবাদী দার্শনিক হিসেবে পরিচিত আল মাআররি নিজেকে দুই জগতের বন্দি হিসেবে মনে করতেন।

আল মাআররি মূলত বিতর্কিত ছিলেন তার যুক্তিবাদী দর্শনের কারণে। তিনি ধর্মের মতবাদনির্ভর ভাবজড়তা এবং ইসলামকে অস্বীকার করেছিলেন। বিশেষত ইসলামের মৌলিক কিছু মতবাদ—যেমন : হজ পালনের বিধিবিধানকে তিনি পৌত্তলিকদের ভ্রমণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কিয়ামত-দিবসেও বিশ্বাসী ছিলেন না। তার মতে, ধর্ম হচ্ছে পুরাকালের রচনাকাহিনি, যা ভণ্ডরা কাজে লাগায় নিরীহ, নির্বোধ ও কুসংস্কারগ্রস্ত মানুষকে ঠকানোর জন্য। ইসলাম অন্য কোনো ধর্মের চেয়ে ভালোও নয়, খারাপও নয়। তিনি তার *রিসালাতুল গাফরান* গ্রন্থে জান্নাতকে পৌত্তলিক যুগের কবি ও দার্শনিকদের প্রমোদাগার হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া আরও বহু ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাস তিনি লালন এবং প্রচার করতেন। ১০৫৭ খ্রিষ্টাব্দ—৪৪৯ হিজরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। —*সম্পাদক।*

[১৩৮] *কিসসাতুল হাজারা :* ৩/৮৫।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বৌদ্ধধর্মে স্রষ্টার ধারণা

গৌতম বুদ্ধ প্রথমদিকে স্রষ্টা-সম্পর্কিত আলোচনা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি পরস্পরবিরোধী বক্তব্য থেকে নিস্তার পেতে এবং মানুষ যাতে বিভ্রান্ত না হয়, এ উদ্দেশ্যে তিনি তা এড়িয়ে গিয়েছিলেন। পাঠক হয়তো অবাক হবেন, গৌতম বুদ্ধ কীভাবে নির্বাণ তথা মুক্তিলাভ এবং ঐশীজ্ঞান পেয়েছিলেন! অথচ স্রষ্টা সম্পর্কে তাঁর কোনো জ্ঞানই ছিল না! তিনি জানতেন না, কে তার উপাস্য! এতৎসত্ত্বেও তিনি সাধারণ মানুষকে তার ধর্মের প্রতি আহ্বান করতেন। তিনি চেয়েছিলেন মানুষকে দুঃখ-দুর্দশা ইত্যাদি থেকে মুক্তি দিতে। এ কারণে বৌদ্ধ মতবাদকে ধর্ম হিসেবে আখ্যায়িত করতে অনেক গবেষক দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। কেননা, পৃথিবীর সব ধর্মেই স্রষ্টা ও প্রভু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকে।

একদল গবেষক মনে করেন, বৌদ্ধ মতবাদ বিশেষ কোনো ধর্ম নয়; বরং এটি তৎকালীন হিন্দুধর্মের কুসংস্কারপূর্ণ ও মানবতাবিবর্জিত মতবাদসমূহের বিরুদ্ধে চলা একটি আন্দোলন। বিশেষত অত্যাচারী হিন্দু গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আত্মপ্রকাশ করা একটি বিপ্লব, যার মাধ্যমে গৌতম বুদ্ধ দলিত হিন্দুদের নিজের দলে ভেড়াতে চেয়েছিলেন।

বাস্তবেও অন্যদের তুলনায় ভারতের নিপীড়িত দলিত হিন্দুদের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সে-সকল দরিদ্র, বঞ্চিত ও দলিত হিন্দুরা এ ধর্মে দীক্ষিত হয়ে তাদের কাঙ্ক্ষিত বস্তুর দেখা কি পেয়েছিল? তারা স্রষ্টার পরিচয়লাভের মাধ্যমে আত্মিক প্রশান্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল কি? নিঃসন্দেহে এর উত্তর হবে নেতিবাচক। যদিও হিন্দুসমাজের চেয়ে তাদের কিছুটা সামাজিক উন্নতি হয়েছিল; কিন্তু তারা এ মতবাদের মাধ্যমে সত্য ও সঠিক পথের দিশা পেতে সক্ষম হয়নি।

এখানেই ইসলাম তার উন্নত শিক্ষার মাধ্যমে এই আধ্যাত্মিক শূন্যস্থান পূরণ করতে সক্ষম। ইসলাম হিন্দুধর্মে প্রচলিত শ্রেণিবিভাজনে বিশ্বাস করে না। ইসলামের

দৃষ্টিতে প্রত্যেক আদমসন্তান মাটির সৃষ্টি। এদের মধ্যে যে আল্লাহকে বেশি ভয় করবে, সে বেশি কল্যাণের অধিকারী।

কথা বলছিলাম বৌদ্ধধর্মে স্রষ্টার বিশ্বাস নিয়ে। বিষয়টি গবেষকদের কাছে বেশ বিরোধপূর্ণ একটি অধ্যায়। প্রমাণাদির ভিত্তিতে এতে তারা দুটি ভাগে বিভক্ত হয়েছেন। যদিও তাদের এসব প্রমাণ বিশ্বাসযোগ্যতার মানদণ্ডে কোনোভাবেই উত্তীর্ণ নয়। তবু আমি পাঠকের সামনে বিষয়টি স্পষ্ট করে তুলে ধরতে উভয় দলের প্রমাণাদি উপস্থাপন করছি।

এক. বুদ্ধ স্রষ্টায় বিশ্বাস করতেন না

এই মতবাদের প্রবক্তারা বলেন, গৌতম বুদ্ধ স্রষ্টায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি তার অনুসারীদের এ ব্যাপারে কথা বলতে বারণ করতেন।

কথিত আছে, একবার দুজন হিন্দু সাধক বুদ্ধের কাছে আসেন। তারা দুজন চাচ্ছিলেন ব্রহ্মার মধ্যে প্রবেশ করতে; কিন্তু এর উপায় নিয়ে তাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। এর সমাধানের জন্য তারা বুদ্ধের কাছে আসেন।

বুদ্ধ তাদের বলেন : তোমরা কি ব্রহ্মার নিবাস চেনো?

তারা বলল : না।

: তোমরা কখনো ব্রহ্মাকে দেখেছ?

: না।

: তোমরা ব্রহ্মার স্বভাব সম্পর্কে অবগত?

: না।

: তোমরা দুজন সূর্যের মধ্যে একীভূত হতে চাও?

: না, না। সেটি তো অনেক দূরে আর দহনকারী।

: তবে তোমরা যেহেতু সৃষ্টির মধ্যে সমর্পিত হতে চাচ্ছ না! তাহলে কেন স্রষ্টার মধ্যে হারাতে চাও? আচ্ছা, ব্রহ্মা কী হিংসুক বা অহংকারী?

: না।

: তোমাদের মধ্যে কি হিংসা-বিদ্বেষ ও অহংকার আছে?

: হ্যাঁ, আছে।

: তাহলে তোমরা কীভাবে একীভূত হবে, যেখানে তোমাদের স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন?[১৩৯]

আরেকবার বুদ্ধ ও হিন্দু ঋষি বশিষ্ঠর মধ্যে কথোপকথন হয়েছিল। বুদ্ধ তাকে বলেন, 'আপনি কখনো ব্রহ্মাকে স্বচক্ষে দেখেছেন; অথবা আপনার পূর্বপুরুষদের কেউ কি তাকে স্বচক্ষে দেখেছিল?' এটা শুনে হিন্দু ঋষি চুপ হয়ে যান।

তারা আরও বলেন, প্রাচীন ধর্মবেত্তাগণ এ ব্যাপারে একমত যে, গৌতম বুদ্ধ স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করতেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন, তানসেন (খ্রিস্টপূর্ব ১৫০), নাগা অর্জুন (খ্রিস্টপূর্ব ১৭৫), আশংক (খ্রিস্টপূর্ব ৩৬০), বসবন্ত (খ্রিস্টপূর্ব ৪০০), দজনাজ (খ্রিস্টপূর্ব ৪২০) শান্ত (খ্রিস্টপূর্ব ৭৫০) ও শাক্য শ্রী বদর (খ্রিস্টপূর্ব ১২০০) প্রমুখ।

তারা আরও বলেন, গৌতম বুদ্ধ পবিত্র চতুরার্যে ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথা বলেননি। একইভাবে তিনি তার শিষ্য আনন্দকে স্রষ্টার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতেও বলেননি। তিনি তাকে নিজের মধ্যেই আশ্রয় খুঁজে নিতে বলেছিলেন।

বুদ্ধ ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন না। যারা এই মতবাদ লালন করে তারা এসবের ভিত্তিতেই এই দাবি করে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে রাহুল সাংকৃত্যায়নের *বুদ্ধদর্শন* দেখুন।[১৪০]

দুই. বুদ্ধ ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন

এই মতবাদের প্রবক্তারা বলেন, গৌতম বুদ্ধ ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন; কিন্তু তিনি এ নিয়ে কথা বলেননি। কারণ, তৎকালীন হিন্দুদের মধ্যে এটি স্বতঃসিদ্ধ একটি ব্যাপার ছিল। তাদের এ বক্তব্যের পক্ষে প্রমাণ হিসেবে যা উপস্থাপন করা হয় :

প্রথম প্রমাণ : যুক্তির নিরিখে বলা যায়, স্রষ্টার ধারণাবিহীন কোনো ধর্মের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। সকল ধর্মেই স্রষ্টার অস্তিত্বের ধারণা রয়েছে। অবশ্য এ কারণেই ভিন্নমতাবলম্বীগণ বৌদ্ধ মতবাদকে ধর্ম মানতে নারাজ।

আর প্রমাণের আলোকে বলা যায়, বৌদ্ধধর্মের ধর্মগ্রন্থ *আনকরনিকাই*[১৪১] ও *মুনজাম নিকাইয়ে*[১৪২] ঈশ্বর শব্দের ব্যবহার হয়েছে। অবশ্য বিরোধীরা বলেন,

[১৩৯] *বুদ্ধদর্শন* : ১১৪।

[১৪০] *বুদ্ধদর্শন* : ১, ৪১, ৫৩, ১৭১।

[১৪১] অধ্যায় : ৪১।

[১৪২] অধ্যায় : ১০১।

গুণাবলির বিশ্লেষণবিহীন ঈশ্বরের ধারণা যথেষ্ট নয়। এ ছাড়া গৌতম বুদ্ধ স্রষ্টার অস্তিত্বের কোনো গুণের কথা বলেননি।

দ্বিতীয় প্রমাণ : বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা ব্রাহ্মণদের মতো ব্রহ্মাকে স্রষ্টা মনে করে না। তারা বুদ্ধকে তার চেয়েও শ্রেষ্ঠ মনে করে।

বুদ্ধকে ব্রহ্মার চেয়ে প্রাধান্য দেওয়ার এই অভিমত বুদ্ধবিরোধীদের প্রধান অস্ত্র। তারা এর আলোকে বলেন, তারা বুদ্ধকে ঈশ্বর মনে করে ঈশ্বরের উপাসনা ছেড়ে তারই এক সৃষ্টির উপাসনা করে।

বুদ্ধ ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন—এই মতবাদের প্রবক্তারা বলেন, গৌতম বুদ্ধের ব্যাপারে এমন সন্দেহের কারণগুলো হলো :

১. সিদ্ধার্থ ছিলেন সাতজন বুদ্ধ নামে অভিহিতদের একজন। তারা হলেন, শিখ বুদ্ধ, বস বুদ্ধ, ইয়াসহাদ বুদ্ধ, কোসেংকা বুদ্ধ, কর্ণাকিন বুদ্ধ ও শিব বুদ্ধ। তাই প্রায়ই তাদের একজনের বক্তব্য অপরজনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যেত। ফলে এমন ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়।
২. গৌতম বুদ্ধ হিন্দুদের ঈশ্বর ব্রহ্মার সমালোচনা করতেন এবং বেদের শিক্ষাকে সম্মানের চোখে দেখতেন না। তাই হিন্দুরা তাকে ধর্মদ্রোহী বলে অভিহিত করে। তারা হিন্দুসমাজে এর ব্যাপক প্রচার করে এবং তাকে ধর্মদ্রোহী হিসেবে প্রচারণা চালায়। ফলে বৌদ্ধ মতবাদ সেখানে বেশ হুমকির মুখে পড়ে।
৩. কীভাবে এ কথার কল্পনা করা যায় যে, বুদ্ধের শিক্ষাগুলো অস্বাভাবিক বিষয়গুলোর উর্ধ্বে থাকবে! তা ছাড়া তার শিক্ষাগুলো শিরক ও বিদআতে ভরপুর। সেখানে বুদ্ধকে স্রষ্টার আসন দেওয়া হয়েছে। এ জন্য বৌদ্ধরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তার উপাসনা করে।[১৪৩]

যাইহোক, ধর্মের এমন মৌলিক এই ধর্মবিশ্বাসকে ঘিরে এহেন জটিল মতবিরোধ মূলত এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত এই ধর্মীয় মতবাদের যথার্থতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। কেননা, কোনো ধর্মের দর্শনে আল্লাহর অস্তিত্ব ও গুণাবলি নিয়ে এত বিরোধ ধর্মানুরাগীদের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। একজন ইমানদার ধর্মানুরাগী মানুষ কীভাবে মানুষকে জরা-ব্যাধি ও কষ্ট

[১৪৩] বৌদ্ধ ধর্মমতে, বুদ্ধের দীর্ঘ জীবনের শেষের দিকে তার অনুসারীরা তার মৃত্যুরও অপেক্ষা করেনি, তখন থেকেই তারা তাকে ঈশ্বর জ্ঞান করে উপাসনা করতে শুরু করে।

দিতে বুদ্ধের দর্শন গ্রহণ করবেন, যেখানে বুদ্ধ কোনোভাবেই স্রষ্টার অস্তিত্ব ও কুদরতের দর্শন স্পষ্ট করেন না। আবার দাবি করেন, তিনি নির্বাণ লাভ করেছেন!

কেউ সামান্য গবেষণা করলেই এ দুটি বিষয়ের মধ্যে পরস্পর বিরোধ ও দ্বন্দ্ব অনুভব করবেন। ফলে মতাদর্শটি শুরুলগ্ন থেকে মৌলিকভাবে ব্যর্থতার মুখ দেখেছে। কেননা, ভারতের অধিবাসীরা যেভাবে ইসলামের শিক্ষায় মুগ্ধ হয়েছে, বুদ্ধ-দর্শনের প্রতি ততটা আগ্রহ দেখায়নি। ঐশীজ্ঞান থেকে অনেক দূরে অবস্থান করা ইউরোপিয়ানদের কাছে যখন খ্রিষ্টান ধর্মপ্রচারকেরা পৌঁছেছিল, তখনো এমনটাই ঘটেছিল। ইউরোপিয়ানরা বৌদ্ধধর্মের পরিবর্তে বুদ্ধের পাঁচ শতক পর জন্ম নেওয়া ইসা আ.-এর ধর্মের প্রতিই আগ্রহ দেখিয়েছিল, যদিও তাতে বিভিন্ন বিকৃতি ও পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। মোটকথা, ইউরোপেও বুদ্ধের মতবাদ ততটা প্রসার লাভ করেনি।

এখন আবারও ইউরোপিয়ানরা এমন ধর্মের ব্যাপারে খোঁজ নিচ্ছে, যেটি বিবেকের ভাষা অনুধাবন করবে। যেটি স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য করবে। ইসা আ. ও তাঁর মধ্যে পার্থক্য বজায় রাখবে। নিঃসন্দেহে ভ্রষ্টতা, বিকৃতি ও পরিবর্তন থেকে মুক্ত ইসলামের বিশুদ্ধ শিক্ষা এই শূন্যস্থান পূরণে সক্ষম। একইভাবে প্রাচীন যুগে বৌদ্ধধর্ম-বিস্তৃত আফগানিস্তান ও ইন্দোনেশিয়ায় ইসলাম একই ভূমিকা পালন করেছিল। এসব অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসী ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল। এখন ইউরোপেও ইসলাম একই ভূমিকা পালনে সক্ষম।

বৌদ্ধধর্ম মানুষকে তার অনাড়ম্বর জীবনদর্শনের মাধ্যমে অভিভূত করে, যদিও কিছুদিনের মধ্যে মানুষ এর নেশা থেকে মুক্ত হয়ে বাস্তবতা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়।

তিন. বৌদ্ধ সম্মেলন

প্রথম বৌদ্ধ সম্মেলন : গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর পর প্রথম বৌদ্ধ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বুদ্ধের ঘনিষ্ঠ শিষ্য আনন্দকে বুদ্ধের বিশ্বাসসমূহ একত্রিত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। একইভাবে অন্যদের দায়িত্ব দেওয়া হয় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জীবনাচার-পদ্ধতি নির্ধারণের।

দ্বিতীয় বৌদ্ধ সম্মেলন : গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর শতবর্ষ পরে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল কুসংস্কার ও মনগড়া রীতিনীতি থেকে বুদ্ধের শিক্ষাকে মুক্ত করা।

তৃতীয় বৌদ্ধ সম্মেলন : সম্রাট অশোকের আমলে খ্রিষ্টপূর্ব ২২৪ সালে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন বিষয়ে বৌদ্ধদের মধ্যে জন্ম নেওয়া মতবিরোধ মিটিয়ে দেওয়া। বৈঠকের সমাপ্তির পর ভারত ও ভারতের বাইরে এই ধর্মের প্রচারকদের পাঠানো হয়।

চতুর্থ বৌদ্ধ সম্মেলন : খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকের শেষের দিকে সম্রাট কনিষ্কের আমলে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল ঘুরপ্যাঁচ ছাড়া বুদ্ধের শিক্ষাসমূহের ব্যাখ্যা দাঁড় করানো।

চার. বৌদ্ধধর্মের সম্প্রদায়সমূহ

সম্রাট অশোকের আমলে বৌদ্ধরা ১৮টি উপদলে বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে দুটি উপদল বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করে :

১. হীনযান (ছোট নৌকা)

এই সম্প্রদায়ের অনুসারীরা স্রষ্টার অস্তিত্ব, আত্মা ও প্রত্যাদেশের দর্শন অস্বীকার করে। তারা বুদ্ধকে মানবসত্তা হিসেবে বিশ্বাস করে। তারা মনে করে, তিনি অন্যান্য সাধারণ মানুষের মতোই মাতা-পিতার ঘরে জন্মলাভ করেছেন এবং সাধারণ মানুষের মতো জীবনযাপন করে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। অবশ্য তিনি উন্নত গুণাবলির অধিকারী ছিলেন, যা দ্বারা তিনি একজন সাধকের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। তিনি আচার্য মংশ উপাধির উপযুক্ত।

এই মতবাদের অনুসারীরা বুদ্ধের সেই বাণীকে নির্বাণপ্রাপ্তির মূল দর্শন হিসেবে গ্রহণ করে—'তুমি তোমাকে ভিন্ন কারও কাছে আশ্রয় চাইবে না'। এই সম্প্রদায় তৃতীয় বৌদ্ধ সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলোর ওপর নির্ভর করে।

দক্ষিণ ভারত ও শ্রীলঙ্কায় এই মতবাদের বহুল প্রচার দেখা যায়। এই মতবাদের গ্রন্থাবলি 'পালিভাষায়' লিখিত। তন্মধ্যে ত্রিপিটক বেশি প্রসিদ্ধ। এটি মূলত তিনটি গ্রন্থের সমন্বয়। এর সংকলন বুদ্ধের তিরোধানের প্রায় চার শতক পর সম্পন্ন হয়েছিল।

২. মহাযান (বড় নৌকা)

তারা বিশ্বাস করে, যারা এই মতবাদে দীক্ষিত হবে এবং ভিক্ষুদের সঙ্গে বড়

নৌকায় আরোহণ করবে, তারা নির্বাণ লাভ করবে। তারা মনে করে, বুদ্ধের দেহ নেই। তিনি আলোর বিচ্ছুরণ। তিনিই অবিনশ্বর স্রষ্টা, যিনি এ ধরায় আত্মপ্রকাশ করেছেন। এই মতবাদের অনুসারীরা শিরকের আঁধারে নিমজ্জিত। তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে সকল সাধুকে স্রষ্টা হিসেবে গ্রহণ করে। এ ছাড়া বিভিন্ন মনগড়া আচারবিধি গ্রহণ করে।

সম্ভবত এই সম্প্রদায়টি রাজা কনিষ্কের আমলে আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং চতুর্থ বৌদ্ধ সম্মেলনে এর নীতিমালা গৃহীত হয়েছিল।

উত্তর ভারত, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, চীন ও জাপানে এই মতবাদের ব্যাপক প্রসার রয়েছে। আবার মতবাদটি এসব অঞ্চলের বহু দর্শনও গ্রহণ করেছে। এই সম্প্রদায়ের অধিকাংশ গ্রন্থ সংস্কৃত, চীনা, তিব্বতি ও জাপানি ভাষায় লিখিত। এসবের মধ্যে *ডায়মন্ড সূত্র* (Diamond Sutra) ও *লঙ্কাবতার সূত্র* (Lankavatara Sutra) উল্লেখযোগ্য।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বৌদ্ধ ধর্মমতে উপাসনা

এক. বৌদ্ধধর্মের উপাসনার পদ্ধতি

বৌদ্ধ ধর্মমতে উপাসনার নির্দিষ্ট কোনো পন্থা নেই। তাদের মতে, যে কাজগুলো স্রষ্টার উপাসনা বলে বিবেচিত হয়, তা অনেকটা নিম্নরূপ :

১. তাদের ধারণামতে, বুদ্ধের মহত্ত্ব, গুণাবলি ও পূর্ণাঙ্গতার গুণকীর্তন করা।
২. বুদ্ধের আলোচনায় প্রশান্তি লাভ করা। নির্জনে ও জনসম্মুখে তার ধ্যান করা। দ্বিতীয় জনমে তার মতো হওয়ার প্রার্থনা করা।

বৌদ্ধ সাধুদের কাছে বুদ্ধের নাম জপ করা ও তার ধ্যান করা উচ্চাঙ্গের ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত।

এই ধর্মদর্শনের ফলে তারা ভিক্ষু ও সাধুদের অত্যন্ত মর্যাদার চোখে দেখে। বৌদ্ধদের মতে গ্রন্থপাঠ ও এ নিয়ে গবেষণা করা মুক্তিলাভের জন্য যথেষ্ট নয়। তাই মুক্তিলাভের জন্য সাধনা-কামনা থেকে মুক্ত বুদ্ধের মতো সিদ্ধিলাভ করা ভিক্ষুর কাছে শিষ্যত্ব লাভ করা আবশ্যক। তিনিই সব রহস্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী।[১৪৪]

দ্বিতীয় স্তরে এই উপাসনাকারী স্রষ্টার স্থানে অধিষ্ঠিত হয়। সৃষ্টি ঈশ্বরের স্থান দখল করে। তখন তার ও স্রষ্টার মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। এ সময় সে নিজের ঈশ্বর হওয়ার দাবি করে।

বৌদ্ধদের এই বিশ্বাস ও সুফিদের বিশ্বাসের মধ্যে একটু তুলনা করে দেখুন। তাসাওউফের সাধকগণ সর্বদা তাদের শায়খের চিত্র কল্পনা করেন। নিজের মনে

[১৪৪] বিভিন্ন গবেষকের ভাষায় এটি Wantlessness তথা এমন স্তর, যেখানে মানুষ বস্তুজগতের সকল বস্তু থেকে মুক্তি পায়।

সদা তার চিত্র অঙ্কিত রাখেন। তার অনুমতি ছাড়া কিছু করেন না, যেন তিনি তার সঙ্গে অবস্থান করছেন। দ্বিতীয় স্তরে তিনি নবিজি ﷺ-কে কল্পনা করে ও তাঁর চিত্র লালন করেন। শেষ স্তরে তিনি ইহসানের স্তরে পৌঁছার দাবি করেন।

দুই. বৌদ্ধধর্মের উপাসনার মন্ত্র

আমি পরমেশ্বর বুদ্ধের চরণে অবনত হচ্ছি, বিশ্বচরাচর যার সামনে প্রকাশ্য।

আমি পরমেশ্বর বুদ্ধের চরণে অবনত হচ্ছি, বিশ্বচরাচর যার সামনে প্রকাশ্য।

আমি পরমেশ্বর বুদ্ধের চরণে অবনত হচ্ছি, বিশ্বচরাচর যার সামনে প্রকাশ্য।

আমি বুদ্ধের শরণ নিলাম।

আমি ধর্মের শরণ নিলাম।

আমি ভিক্ষুদের দলের শরণ নিলাম।

আমি বুদ্ধের শরণ নিলাম।

আমি ভিক্ষুদের দলের শরণ নিলাম।

আমি বুদ্ধের শরণ নিলাম।

আমি ধর্মের শরণ নিলাম।

আমি ভিক্ষুদের দলের শরণ নিলাম।

আমি সেই ধর্ম গ্রহণ করছি, যাতে কোনো কষ্ট নেই।

আমি সেই ধর্ম গ্রহণ করছি, যাতে কোনো চুরি নেই।

আমি সেই ধর্ম গ্রহণ করছি, যাতে কোনো কামনা নেই।

আমি সেই ধর্ম গ্রহণ করছি, যাতে কোনো মিথ্যা নেই।

আমি সেই ধর্ম গ্রহণ করছি, যাতে কোনো মদপান নেই।

তিন. বৌদ্ধধর্মের প্রসার

বৌদ্ধ মতাবলম্বীরা শুধু হিন্দুসমাজকেই নিজেদের ধর্মে দীক্ষিত করতে ইচ্ছুক ছিল না; বরং তারা এই ধর্মের প্রতি মুগ্ধ সবার জন্যই নিজেদের ধর্ম গ্রহণের পথ উন্মুক্ত করে রেখেছিল। এতে বৌদ্ধধর্ম বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। বহু বর্ণের অসংখ্য হিন্দু এই ধর্মমত গ্রহণ করেন। সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন এবং একে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করেন। তিনি ভারতের ভেতরে ও বাইরে

এই ধর্মের প্রচারকদের পাঠান। এমনকি তিনি তার পুত্র মহেন্দ্রকে দক্ষিণ ভারত ও শ্রীলঙ্কায় পাঠান। আর এভাবেই পূর্ব ও মধ্য-এশিয়া পর্যন্ত বৌদ্ধ মতবাদ ছড়িয়ে পড়ে।

তৎকালে বৌদ্ধ ধর্মানুসারী ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে কোনো মতবিরোধ ছিল না। যেমন : খ্রিস্ট পঞ্চম শতকে ভারতবর্ষ ভ্রমণ করা চীনা পর্যটক বাহিনা বলেন, জনসাধারণ বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ সাধুদের সামাভাবে সম্মানের চোখে দেখত। উভয় ধর্মের অনুসারীদের উপাসনালয়গুলোও পাশাপাশি অবস্থান করত।'

এরপর সপ্তম শতক থেকে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন সংঘাত ও দ্বন্দ্বের সূচনা হয়। এসব বিরোধকে কেন্দ্র করে ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে কনৌজে উভয় মতবাদের প্রবক্তাদের মধ্যে বিতর্কসভা অনুষ্ঠিত হয়। এমন বিভিন্ন বিতর্ক অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণরা বিজয়ী হয়। তারা বৌদ্ধদের প্রতিপত্তি খর্ব করে দিতে শুরু করে। এরপর *বেদান্তের* প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকারক ও মহান হিন্দু সাধক শঙ্করাচার্য (৭৮৮-৮৩০ খ্রি.) বৌদ্ধ মতবাদকে ভারত উপমহাদেশ থেকে হটিয়ে দিতে সক্ষম হন। বলা হয়, তিনি নিজের বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে সম্রাট অশোকের শাসনক্ষমতার প্রভাবকে খর্ব করে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এরপর ভারতের আকাশে ইসলামের আলো উঁকি দেয়। ধীরে ধীরে সিন্ধু, ইন্দোনেশিয়া ও থাইল্যান্ডে ইসলামের ঐশী আলোর সামনে হিন্দু ও বৌদ্ধ মতবাদ সমানভাবে ম্রিয়মান হতে শুরু করে। ইসলামে মুগ্ধ অসংখ্য হিন্দু ও বৌদ্ধ ইসলামগ্রহণ করে নেয়।

তৃতীয় অধ্যায়

জৈনধর্ম : ইতিহাস ও ধর্মবিশ্বাস

- জৈনধর্মের গোড়ার কথা
- জৈনদের ধর্মবিশ্বাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

জৈনধর্মের গোড়ার কথা

ভারতবর্ষের ধর্মতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে হলে জৈনধর্ম সম্পর্কে অবশ্যই কথা বলতে হবে। কেননা, ভারতবর্ষের অন্যান্য ধর্মের ওপর এর ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। যদিও এর অনুসারীর সংখ্যা নিতান্তই অল্প।[১৪৫]

এক. জৈনধর্মের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

জৈনধর্মের অনুসারীরা মনে করে, বিশ্ব যেমন আদি ও অবিনশ্বর, তাদের ধর্মও তেমনি আদি ও অবিনশ্বর। তাদের সর্বশেষ নেতা—যিনি তাদের ধর্মের মূলনীতিসমূহ সংস্কার ও মতবাদ প্রচার করেছেন—তিনি মহাবীর স্বামী (খ্রিষ্টপূর্ব ৫৪৯-৪৮৬)। তিনি গৌতম বুদ্ধের সামসময়িক ছিলেন।[১৪৬] তাদের দুজনের মধ্যে দর্শনগত বেশ বিরোধ ছিল। বুদ্ধ তার বিভিন্ন বক্তব্যে মহাবীর স্বামীর সমালোচনা করেছিলেন। মহাবীর স্বামীর পূর্বে ২৩ জন তীর্থঙ্কর (জৈনধর্মের রাসুল, যাদের মধ্যে ঈশ্বর বিরাজ করেন) গত হয়েছিলেন। তাদের নাম নিম্নরূপ :

১. ঋষভদেব (Rishabdeva)
২. অজিতনাথ (Ajitnatha)
৩. সম্ভবনাথ (Shambhavanatha)
৪. অভিনন্দননাথ (Abhinandananatha)

[১৪৫] ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দের আদমশুমারি অনুযায়ী এ ধর্মের অনুসারীর সংখ্যা ১৬ লাখ ১৮ হাজার ৪০৫ জন। এ ধর্মের ভ্রান্ত দর্শন ও অসারতার দরুন ভারতবর্ষের বাইরে এটি ততটা প্রসারের মুখ দেখেনি। ভারতবর্ষেও এটি ততটা ছড়াতে পারেনি। শুধু গুজরাট অঞ্চলেই এদের দেখা মিলে। সেখানে তাদের বেশ কিছু মন্দির রয়েছে, যা বেশ আশ্চর্যজনক স্থানসমূহের অন্তর্ভুক্ত। জৈন শব্দের অর্থ বিজয়ী তথা যিনি নিজের কামনা ও চাহিদাসমূহের ওপর বিজয়লাভ করেছেন।

[১৪৬] ড. মোহন লাল মনে করেন, তারা দুজন সামসময়িক হলেও তাদের কখনো সাক্ষাৎ হয়নি। *জৈন ধর্ম দর্শন* : ৮।

৫. সুমতিনাথ (Sumatinatha)
৬. পদ্মপ্রভ (Padmaprabha)
৭. সুপার্শ্বনাথ (Suparshvanath)
৮. চন্দ্রপ্রভা (Chandraprabha)
৯. শবধিনাথ (Suvidhinatha)
১০. শীতলনাথ (Shitalnatha)
১১. শ্রেয়াংশনাথ (Shreyansanatha)
১২. বসুপূজ্য (Vasupujya)
১৩. বিমলনাথ (Vimalnatha)
১৪. অনন্তনাথ (Anantanatha)
১৫. ধর্মনাথ (Dharmanatha)
১৬. শান্তিনাথ (Shantinatha)
১৭. কুন্থুনাথ (Kunthunatha)
১৮. অরনাথ (Aranatha)
১৯. মল্লিনাথ (Mallinatha)
২০. মুনিসুব্রত (Munisuvrata)
২১. নমিনাথ (Naminatha)
২২. নেমিনাথ (Neminatha)
২৩. পার্শ্বনাথ (Parshvanatha)
২৪. মহাবীর (Mahavira) (শেষ তীর্থঙ্কর)।

এদের প্রত্যেকেই একটি নির্দিষ্ট যুগ পর পর আবির্ভূত হয়েছিলেন। প্রত্যেকের আবির্ভাবের মধ্যে ছিল মিলিয়ন মিলিয়ন বছরের তফাত; বরং এর চেয়েও বেশি, যা হয়তো গাণিতিক সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

লালা দেওয়ান চন্দ্র তার *জৈনধর্ম কি অনন্তকালীন* গ্রন্থে বলেন, 'এই পৃথিবী অনন্তকালীন, যার শুরু ও শেষ নেই। জৈনধর্মও এর অনুরূপ।'

এখানে প্রথমেই লক্ষণীয়, জৈনধর্মে শুরু ও শেষ সম্পর্কে কোনো ধারণা পাওয়া যায় না। এর কোনো ইতিহাসও সংরক্ষিত হয়নি।

জৈনধর্ম বড় দুটি ভাগে বিভক্ত :

১. দিগম্বর সম্প্রদায়।[১৮৭]
২. শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়।[১৮৮]

প্রতিটি সম্প্রদায় আবার দু-ভাগে বিভক্ত। এক দল মূর্তির পূজা করে, আরেক দল এটি নিষিদ্ধ মনে করে।

দিগম্বরদের মধ্যে যারা মূর্তিপূজা নিষিদ্ধ মনে করে, তারা তারাংবতহস নামে পরিচিত; আর শ্বেতাম্বরদের মধ্যে দাস নামে পরিচিত।

লক্ষণীয়, এ ধরনের পরস্পরবিরোধী মতবিরোধ ধর্মের মূল অস্তিত্বকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে।

দুই. মহাবীর স্বামীর শিক্ষাসংকলন

মহাবীর স্বামীর মৃত্যুর পর তাদের ধর্মীয় পন্ডিতগণ মানুষকে নিজেদের স্মৃতি থেকে মহাবীর স্বামীর শিক্ষামালা শেখাতেন। কয়েক যুগ এভাবেই চলছিল। তবে সাত যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর মহাবীরের শিক্ষা পুরোপুরি আত্মস্থকারী সবাই মৃত্যুবরণ করেন। যারা বেঁচে ছিলেন, তারা প্রত্যেকেই সেসব শিক্ষার আংশিক ধারণ করতেন। তা দেখে জৈন পন্ডিত কুন্ড কুন্ড স্বামী এই অধঃপতন ঠেকাতে বিভিন্নজনের স্মরণে থাকা অবিশিষ্ট শিক্ষা সংকলনের প্রকল্প হাতে নেন।[১৮৯] এরপর তার শিষ্য আচার্য উমা স্বামী তার পথ ধরে *তত্ত্বার্থ সূত্র* (Tattvartha Sutra) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যা জৈনদের কাছে 'মহাগ্রন্থ' হিসেবে বিবেচিত। দিগম্বরি সম্প্রদায়ের ভাষ্যমতে, গ্রন্থটি বর্তমানে মহাবীর স্বামীর শিক্ষাসমূহের একমাত্র উৎস।

অপরদিকে শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের মতে, (জৈন সিতসারা গ্রন্থলেখকের ভাষ্যমতে) দেবঋষিগানি (দেবার্ধি) ৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে (দশ শতক পর) গুজরাটের বল্লভি শহরে প্রায় ৫০০ জৈন পন্ডিতকে একত্রিত করেন। তিনি তাদের স্মৃতি থেকে মহাবীরের শিক্ষাসমূহ সংকলনের নির্দেশ দেন।

---

[১৮৭] দিগম্বর অর্থাৎ, দিক যার অম্বর বা বস্ত্র। এরা মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য নগ্নতাকে মুখ্য মনে করে।
[১৮৮] শ্বেতাম্বর অর্থ যারা সাদা পোশাক গ্রহণ করে। *জৈন ধর্মদর্শন* : ১৯।
[১৮৯] এটি ছিল ১৫৬ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা।

তিন. ঐতিহাসিক সমীক্ষা

এই দুটি বর্ণনা থেকে আমরা সহজেই বলতে পারি, মহাবীর স্বামীর শিক্ষাগুলো আমাদের কাছে যথাযথভাবে এসে পৌঁছেনি। সময়ের বিবর্তনে এর অনেক অংশই হারিয়ে গেছে। যতটুকু অবশিষ্ট আছে, আমরা ইতিহাসের নিরিখে তার ওপর ভরসা করতে পারছি না। কেননা, দেবঋষিগানি প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত সাধু ও গুরুদের সত্যতা যাচাইয়ে কোনো আগ্রহ দেখাননি। তিনি তাদের মুখনিঃসৃত প্রতিটি বাক্যই সংকলনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, দেবঋষিগানির সংকলন বলে কথিত এই গ্রন্থ কীভাবে তার সংকলন বলে গণ্য করা যায়, যার সুনির্দিষ্ট কোনো প্রমাণ বা ঐতিহাসিক সূত্রনেই। তাই এর বরাতে যারা সেসব গল্প ও রূপকথায় বিশ্বাস করে বসে আছে, তাদের কথা ভেবে একটু অবাকই হতে হয়।

চার. বৃহৎ দুটি সম্প্রদায়ের মৌলিক পার্থক্য

জৈনধর্মের বৃহৎ দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায় ৮৪টি বিষয়ে বিরোধ দেখা যায়। তবে এর অধিকাংশই শাখাগত মতবিরোধ। এখানে সেসব মতবিরোধের কথা আলোচনা না করে এমন তিনটি মৌলিক বিষয়ের বিরোধ দেখানো হচ্ছে, যা এই ধর্মের মূল ভাষ্যকেই ধ্বংস করে দেয়।

১. পার্থিব বন্ধন

দিগম্বর সম্প্রদায়ের মতে, মানবসন্তানের পার্থিব সব বন্ধন (দ্রব্য, স্থান বা ব্যক্তি) থেকে পূর্ণ নিরাসক্তি ব্যতীত পরিপূর্ণ জ্ঞান ও স্থায়ী মুক্তি মিলবে না। এমনকি তাকে পোশাক ও লজ্জাস্থান আবৃত করা থেকেও নিরাসক্ত হতে হবে। এ জন্য দিগম্বর সম্প্রদায়ের সাধুগণ নিরাবরণ হয়ে জীবনযাপন করেন। এর বিপরীতে শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের লোকেরা পোশাক, বিছানা ও লাঠির মতো প্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্রী থেকে দূরে থাকার প্রয়োজন মনে করেন না।

দিগম্বর সম্প্রদায়ের সাধুগণ তিনটি বস্তুর ওপর নির্ভর করেন :

১. শাস্ত্র (তাদের মতে পবিত্র গ্রন্থ)
২. ময়ূরের পেখমের তৈরি পাখা, যা দিয়ে ভূমি পরিচ্ছন্ন করা যায়।
৩. পবিত্রতা অর্জনের নিমিত্তে একটি লোটা।

ধর্মীয় গ্রন্থসমূহ, ঐতিহাসিক স্থান, বিমানবন্দর, রেলস্টেশন, মন্দির ও জনসমাগমস্থলে আমরা যেসব নগ্ন চিত্র দেখতে পাই, এর সবই দিগম্বর সম্প্রদায়ের স্মারক। অপরদিকে শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের সাধকগণ কথা বলা ও যাত্রাকালে একখণ্ড বস্ত্র দিয়ে তাদের মুখ ঢেকে নেন; কিন্তু দিগম্বর সম্প্রদায় পুরোপুরি পোশাকমুক্ত থাকেন। তারা দিনে একবার আহার করেন। আহারের ক্ষেত্রে তারা কোনো পাত্র ব্যবহার না করে হাতে নিয়েই আহার করেন। অন্যদিকে শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের সাধুগণ দিনে দুবার পাত্রে আহার করেন।

পার্থিব উপকরণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এসবই মৌলিক পার্থক্য।

২. নারীদের মুক্তিলাভ

শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের অনুসারীরা মনে করে, নারীদের নারীগঠনেই মুক্তি মেলা সম্ভব। অন্যদিকে দিগম্বর সম্প্রদায়ের অনুসারীরা মনে করে, নারীদের কখনো মুক্তি মিলবে না। কেননা, নারীদের বগলে এক ধরনের জীবাণু থাকে, যা নারীদের নড়াচড়ার ফলে মৃত্যুবরণ করে। একইভাবে তারা প্রতি মাসে ঋতুগ্রস্ত হয়ে অপবিত্র হয়। তাই তারা পরিপূর্ণ ধ্যানসাধনা করতে সক্ষম নয়। আবার তারা একেবারে নগ্ন থাকতেও সক্ষম নয়। এ জন্য তাদের মুক্তি পেতে পুরুষের দেহ ধারণ করে জন্ম নিতে হবে।

৩. পূর্ণ সাধক

দিগম্বর সম্প্রদায় মনে করে, পূর্ণ সাধককে ইহকালে ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও অসুস্থতা স্পর্শ করতে পারে না। তবে শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় এটি বিশ্বাস করে না।

এই ছিল জৈন মতাবলম্বী দুটি বৃহৎ সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাসের মৌলিক পার্থক্য। শাখাগত আরও অনেক পার্থক্য আছে, আলোচনা সংক্ষিপ্ত করার জন্য তা এড়িয়ে যাওয়া হলো।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জৈনদের ধর্মবিশ্বাস

এক. জৈনদের মৌলিক ধর্মবিশ্বাস

১. এই জগৎ আত্মা ও বস্তুর নির্যাস। এর বাইরে কোনো স্রষ্টা বা ব্যবস্থাপক নেই।

২. আত্মা ও বস্তুর মধ্যকার সম্পর্ক হলো কর্মের ফলাফল। কেননা, কর্মই আত্মাকে অসংখ্যবার পৃথিবীতে পাঠায়।

৩. শুদ্ধবিশ্বাস, শুদ্ধজ্ঞান ও শুদ্ধকর্ম ছাড়া আত্মার পরিভ্রমণ থেকে মুক্তি মিলবে না।

৪. মুক্তিপ্রাপ্ত আত্মা পরমাত্মা হিসেবে গণ্য হয়। মুক্তির পর এটি আবারও পথভ্রষ্টদের পথের দিশা দিতে ধরায় আসবে। তাই মানুষের উচিত মুক্তির জন্য চেষ্টা করা।

৫. জগৎ আত্মার কেন্দ্র ও নিবাস। এই জগতে আত্মার পুনরাগমন নিরন্তর।

৬. অহিংসা পরম ধর্ম।

৭. জৈনসাধকের জন্য ব্রহ্মচারী জীবনযাপন তথা নারীসঙ্গ ও সুগন্ধির ব্যবহার এড়িয়ে চলা একান্ত কর্তব্য।

৮. ইন্দ্রিয়ের কারণেই মানুষ কামনার জীবনযাপন করে এবং জগতের প্রতি অনুরাগী থাকে। ফলে তার মুক্তি মেলে না। তাই পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকা আবশ্যক।

দুই. জৈন ধর্মমতে স্রষ্টার বিশ্বাস

জৈন ধর্মবিশ্বাসের প্রথম বিশ্বাস থেকে আমরা জানতে পেরেছি, জৈনরা পৃথিবীর স্রষ্টা ও ব্যবস্থাপকের বিশ্বাস লালন করে না। তারা মনে করে, এই জগৎ আত্মা ও বস্তুর সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ। আত্মা ও বস্তুর মতো জগৎও অনন্তকালীন। এটি এমন নয় যে, অস্তিত্বহীন ছিল আর কোনো ঈশ্বরের মাধ্যমে অস্তিত্বে এসেছে। অনন্তকাল থেকেই এটি অন্য আকারে অস্তিত্বশীল ছিল, নতুন সম্পর্কের কারণে অন্য রূপ ধারণ করেছে।

এই মতবাদের কারণেই কোনো কোনো গবেষক মনে করেন, জৈন মতবাদ ব্রাহ্মণদের অনাচারের প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট মতবাদ।

জৈনরা এটি অস্বীকার করে তারা বলে, আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করি না। আমরা শুধু তার সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনার গুণ অস্বীকার করি। কেননা, তার অস্তিত্ব পৃথিবীর বাইরে নয়।

জৈন ধর্মবেত্তা বি আর্কিন মনে করেন, 'জৈনরা অনন্তকালীন কোনো উপাস্যের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না—যিনি সর্বত্র বিদ্যমান, সর্বজ্ঞ, সব বিষয়ে ক্ষমতাবান ও জগৎসংসারের সৃষ্টিকর্তা। তারা বিশ্বাস করে, মুক্তিপ্রাপ্ত আত্মা যারা নির্বাণ লাভ করে, তারাই ঈশ্বরের স্থানে অধিষ্ঠিত হয়।'

এই বক্তব্য থেকে অনুধাবন করা যায়, জৈনদের মতে ঈশ্বরের সংখ্যা মুক্তিপ্রাপ্ত আত্মার সংখ্যার সমপরিমাণ। এ কারণে জৈন ধর্মাবলম্বীরা নির্বাণলাভ করা আত্মা তথা তীর্থঙ্করদের উপাসনা করে। তারা বলে, 'আমি পূজা করি তীর্থঙ্করের, যিনি স্রষ্টা, যিনি মানুষকে নিরাপত্তা ও শান্তি দান করেন। হায়, যদি তার অনুগ্রহ ও সুদৃষ্টিতে নির্বাণলাভ হতো।'

মহান আল্লাহ তাদের মনগড়া এসব ধারণা থেকে পবিত্র। তারা এক স্রষ্টার উপাসনা থেকে মুক্তি চেয়েছে; আর অসংখ্য ঈশ্বরের উপাসনায় লিপ্ত হয়েছে।

তিন. জৈন ধর্মমতে ধর্মপুরুষদের শ্রেণিবিভাগ

জৈনধর্মের অনুসারীরা তাদের ধর্মীয় ব্যক্তিদের পাঁচ ভাগে বিভক্ত করে :

প্রথম শ্রেণি—অরহিন্ত : নির্বাণলাভ করা এমন আত্মা, যার সর্বজ্ঞান লব্ধ হয়েছে। পৃথিবীতে স্বাভাবিক মৃত্যুর আগেই যিনি স্রষ্টার মর্যাদা লাভ করেছেন। এদের সংখ্যা ২৪ জন। তাদের নাম পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় শ্রেণি—সিদ্ধ : যে-সকল আত্মা পরিভ্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছেন ও স্বাভাবিক মৃত্যুর পর মুক্তিলাভে সক্ষম হয়েছেন। এদের সংখ্যাও ২৪ জন।

তৃতীয় শ্রেণি—আচার্য : সাধুসম্রাট, যিনি মুক্তিলাভের কাছাকাছি পৌঁছেছেন।

চতুর্থ শ্রেণি—অবাদ্য : এমন সাধুপুরুষ, যিনি নগরে ঘুরে বেড়ান এবং আচার্যের অধীনে সাধনায় লিপ্ত থাকেন।

পঞ্চম শ্রেণি—সাধু : এমন সাধু, যিনি মাত্রই জৈনজীবন আরম্ভ করেছেন।

চার. জৈন-দর্শনে মূর্তিপূজা

যে-সকল জৈন সাধু সদ্যই তপস্যাজীবন আরম্ভ করেছেন, (যেমন, পঞ্চম শ্রেণি) তারা নিজেদের চিন্তা স্থির করতে পারেন না। স্রষ্টার যথাযথ চিত্র মনে স্থাপন করতে না পারায় তারা পূর্ণ ধ্যানমগ্ন হতে সক্ষম হন না, তাই তারা বাহ্য উপাস্যের মূর্তির প্রয়োজন অনুভব করেন। জৈন ধর্মবেত্তারা তাদের এই সমস্যা সমাধানকল্পে তাদের জন্য স্রষ্টার গুণাবলিসম্পন্ন মূর্তি তৈরির অনুমতি দেন। তখন প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী মূর্তি নির্মাণ করে। যেমন, দিগম্বর সম্প্রদায়ের মানুষেরা ইহকালীন অনুরাগ থেকে মুক্ত থাকার দর্শন লালন করায় তারা তাদের ঈশ্বরের মূর্তি নিরাবরণ করে তৈরি করেছে; আর শ্বেতাম্বররা এর বিপরীত মূর্তি গ্রহণ করেছে।

এভাবেই ভারতবর্ষের ধর্মসমূহে মূর্তির ধারণা এসেছে। কেননা, আমরা *বেদ* ও বুদ্ধের শিক্ষাসমূহে মূর্তি ও মন্দির নির্মাণের কোনো আলোচনা পাইনি। এ দুটি ধর্ম এ ব্যাপারে জৈন মতবাদের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়েছে। এ ছাড়া বর্তমানে মূর্তিপূজা জৈনদের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গে পরিণত হয়েছে। নতুন প্রজন্মের অনুসারীরা মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করায় তাদের পণ্ডিতরা আফসোস করেন। তারা মনে করেন, এরা ইসলামের মাধ্যম প্রভাবিত হয়েছে। কেননা, ভারতের ধর্মবিশ্বাসের ইতিহাসে ইসলামই মূর্তিপূজা ও এর নির্মাণ প্রথম নিষিদ্ধ করেছে।

এখানে পাঠক প্রশ্ন তুলতে পারেন, জৈনরা যেখানে ঈশ্বরের কোনো গুণাবলিতে বিশ্বাস করে না, তাহলে তারা কীসের আকৃতিতে মূর্তি নির্মাণ করে?

তাহলে জেনে নিন, তারা সেই ঈশ্বরের মূর্তি নির্মাণ করে না, যাকে তারা অস্বীকার করে। তারা দেবীজি, মহাবীর ও সোমনাথজির[১০০] মতো সে-সকল লোকের মূর্তি নির্মাণ করে, যাদের আত্মা মুক্তিলাভ করেছে। এরাই এখন জৈন ধর্মাবলম্বীদের মহাপ্রভু।

[১০০] এটিই সেই বিশালকায় মূর্তি, যেটি সুলতান মাহমুদ গজনবি (মৃত্যু : ৪২১ হিজরি) ভেঙেছিলেন।

পাঁচ. হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের ওপর জৈনধর্মের প্রভাব

হিন্দুধর্মের মৌলিক কোনো ধর্মবিশ্বাস না থাকায় তাদের অনেক ধর্মবিশ্বাস ও রীতিনীতি জৈনধর্মের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়েছিল। এখানে আমি এমন কিছু ধর্মবিশ্বাস ও প্রথার আলোচনা করব, হিন্দু ও বৌদ্ধরা যা জৈনদের থেকে গ্রহণ করেছিল।

১. মূর্তিপূজা ও মন্দির নির্মাণ : বৈদিক যুগে হিন্দুদের মূর্তিপূজা বা মন্দির নির্মাণের ধারণা ছিল না। হিন্দুদের মতো বৌদ্ধরাও জৈনদের কাছ থেকে এটি রপ্ত করেছিল।

২. অহিংসা : *বেদ* গ্রন্থসমূহে ঘোড়া, মহিষ ও গরু জবাই শেখানো হয়েছে; কিন্তু জৈনরা এটি পাপ মনে করত। তারা প্রাণিহত্যা, এমনকি বাতাসে ঘুরে বেড়ানো জীবাণু হত্যাও নিষিদ্ধ মনে করত। কোনো কোনো ইতিহাসবিদ মনে করেন, আবুল আলা মাআররি গৌতম বুদ্ধের মাধ্যমে নয়; বরং জৈনদের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়েই এদিকে ঝুঁকেছিলেন।

এরপর হিন্দুধর্মাবলম্বীরা তাদের অনুসারীদের জন্য প্রাণিহত্যা বিশেষত গো-হত্যা নিষিদ্ধ করে। এখন তো হিন্দুরা গর্বভরে এই দর্শন প্রচার করে যে, অহিংসা পরম ধর্ম।

৩. পুনর্জন্ম বা আত্মার পরিভ্রমণ : ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়েছি যে, *বেদ* গ্রন্থসমূহে স্বর্গ-নরকের অস্তিত্বের আলোচনা করা হয়েছে; কিন্তু জৈনদের প্রভাবে হিন্দু ও বৌদ্ধদের জন্য পুনর্জন্মবাদ থেকে বেরোনো সম্ভব হয়নি।

৪. সংসারত্যাগী হওয়া : ইতিপূর্বে আমরা হিন্দু ধর্মমতে মানবজীবনের চারটি স্তরের আলোচনা করেছি, যেখানে প্রথম দুটি স্তর ছিল ইহকালীন জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

কিন্তু জৈনরা শুরু থেকেই সংসারবিরাগী জীবনের প্রতি উদ্‌বুদ্ধ করেছিল। হিন্দু ও বৌদ্ধ সাধুরা এর মাধ্যমে প্রভাবিত হন এবং তারা পার্থিব সম্বন্ধ ছিন্ন করে বিরাগী জীবন অবলম্বন করেন।

৫. নিরাবরণ থাকা : হিন্দু ও বৌদ্ধসমাজে নগ্ন থাকার দর্শন ছিল না। নিঃসন্দেহে হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে এ দর্শন জৈনদের থেকে এসেছে। এখন তারা প্রতিবছর নগ্নদের সম্মেলনের আয়োজন করে। উলঙ্গ হয়ে রাস্তাঘাটে চলাফেরা করে। ভারত সরকার তাদের এভাবে নগ্ন হয়ে গ্রামেগঞ্জে চলাফেরা করতে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল। পরে তাদের কঠোর প্রতিবাদের পর

জঙ্গল ও জনমানবহীন অঞ্চলে নগ্ন চলাফেরার অনুমতি দিয়েছে।

এসবই ছিল হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মে জৈন মতবাদের প্রভাব। আমি এর কয়েকটি সংক্ষেপে দেখানোর চেষ্টা করেছি। বিস্তারিত আলোচনায় হাজার পৃষ্ঠার প্রয়োজন হবে এবং বিষয়টিও জটিল হয়ে উঠবে। আশা করছি, সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করতে সক্ষম সত্যান্বেষীদের জন্য এই আলোচনাই যথেষ্ট হবে।

পবিত্রতা সেই মহান সত্তার, যিনি তার স্পষ্ট গ্রন্থে প্রকাশ্য প্রমাণাদি অবতীর্ণ করেছেন, গ্রাম্য-শহুরে ও জ্ঞানী-মূর্খ ব্যক্তিরা সমভাবে যা অনুধাবন করে উপকৃত হতে পারে। আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ইসলামের উপহারে ভূষিত করায়। পরিপূর্ণ রহমত অবতীর্ণ হোক আমাদের নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর, তাঁর পরিজন ও সহচরদের ওপর।

চতুর্থ অধ্যায়

শিখধর্ম : ইতিহাস ও ধর্মবিশ্বাস

- শিখধর্ম আবির্ভাবের পটভূমি
- শিখধর্মে হিন্দু-দর্শন
- ইসলামের আলো থেকে শিখদের সংগ্রহ

প্রথম পরিচ্ছেদ

শিখধর্ম আবির্ভাবের পটভূমি

ইসলামের আবির্ভাবের শুরুলগ্ন থেকেই ভারতবর্ষ ইসলামের আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছিল। তখন থেকেই ভারতভূমি মুসলিম বীরসেনানী, আলিম ও ইসলামি দায়িগণের পদচারণায় ধন্য হয়। ঐশীশিক্ষার আলো, মহান রবের অনুগ্রহ ও মুজাহিদদের ধারাবাহিক অভিযানের ফলে ভারতভূমিতে মূর্তিপূজারিদের ধর্মবিশ্বাস চরমভাবে ঝাঁকুনি খেয়েছিল। তাদের দেব-দেবীরা যেন কোনোভাবেই তাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও মন্দিরগুলো ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারছিল না।

নিজেদের পরিণতির কথা ভেবে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনরা হতাশ হয়ে পড়ে। তারা একে নিজেদের ধর্মীয় সংকট হিসেবে বিবেচনা করছিল। তারা যেন চোখের সামনে নিজেদের সাধু-সন্ন্যাসীদের নেতৃত্ব লুণ্ঠিত হওয়ার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছিল। ঠিক তখনই ভারতবর্ষে বিভিন্ন কবি-সাহিত্যিক হিন্দুধর্মের সংস্কারক হিসেবে আবির্ভূত হন। তারা হিন্দুদের মধ্যে ব্রহ্মার ভালোবাসা জাগরূক করে তাদের মনস্তাত্ত্বিকভাবে সবল করার প্রয়াস চালান। তারা সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে ঈশ্বরের এমন অকল্পনীয় ভালোবাসা জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন, যা হবে চিরন্তন; কিন্তু পাথুরে মূর্তির উপাসনায় অভ্যস্ত হিন্দুধর্মের অনুসারীরা এ ধরনের কাব্যিক বক্তব্যে অনুপ্রাণিত হতে পারছিল না। ফলে তখন থেকে এ দুটি মত আলাদাভাবে পথ তৈরি করে এগোতে থাকে।

এক. জ্ঞানের পথ

এই মতবাদ সৎকর্মে বিশ্বাস করে না। এর অনুসারীদের কাছে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অর্জনই মূল কাম্য। তারা মনে করে, এই জনম প্রভুর সত্যিকারের পরিচয়লাভের জন্যই অপ্রতুল, উপাসনা ও আনুগত্যের সময় কই?

হিন্দি কবি কবির দাস (১৪৪০-১৫১৮ খ্রিষ্টাব্দ) ছিলেন এই মতবাদের বড়

প্রচারক। তিনি ছিলেন কবি রামানন্দ (১৩০-১৪৫০ খ্রিষ্টাব্দ)-এর আশ্রমের ১২ জন প্রতিনিধির একজন। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ব্রাহ্মণ পরিবারে; আর প্রতিপালিত হয়েছিলেন কোনো এক মুসলমান পরিবারে। ফলে সবাই তার মতাদর্শের বিরোধিতা করে। তিনি সবাইকে আল্লাহর সত্তা নিয়ে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি বলতেন, যেহেতু আল্লাহকে পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন ও কল্পনা করা যায় না, তাহলে এই ইবাদত, পূজা ও নৈবেদ্যের যথার্থতা কী?

সম্ভবত তিনিই ভারতের ইতিহাসে প্রথম, যিনি সব ধর্মকে একসুতোয় গেঁথে দেওয়ার (আন্তঃধর্ম) প্রবক্তা ছিলেন। তিনি হুলুল ও ইত্তিহাদের[১৪১] আকিদা লালন করতেন, যেটি শংকরাচার্যের (৭৮৮-৮২১ খ্রিষ্টাব্দ) পর প্রচারের আলো দেখেছিল। এসব কবিতা থেকে তার চিন্তাদর্শের ঝলক দেখা যায়। তিনি বলেন,

> *তুমি আমাকে কোথায় খোঁজো? আমি তো তোমার কাছেই, তুমি আমাকে পাবে না ছাগলের মধ্যে, না গরুর মধ্যে।*
>
> *তুমি আমাকে পাবে না ছুরিতে, পাবে না চামচে, আর পাবে না প্রাণীর চামড়ায়, না তার রক্ত বা মাংসে।*
>
> *না তুমি পাবে আমাকে উপাসনায়; আর না পাবে সন্ন্যাসে। যখন তুমি আমাকে খুঁজবে, পেয়ে যাবে এক মুহূর্তেই।*

কবির দাস বলতেন, 'হে সাধু-সন্ন্যাসীরা, শোনো, আমি প্রতিটি নিঃশ্বাসে এবং প্রতিটি স্থানেই বিদ্যমান।'

তিনি হিন্দুদের সমালোচনায় বলতেন, 'এই জগতের আচরণ কেমন যেন বিকৃতমনা, পাথর কেটে বানানো মূর্তির উপাসনা করা হয়; আর যেই চাক্কির পেষা আটা খাওয়া হয়, তার পাথরের পূজা করা হয় না।'

তিনি জ্ঞানার্জনের জন্য কোনো গুরুকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণকে আবশ্যক মনে করতেন। কেননা, তিনি ভাবতেন গুরুর মধ্যে ঈশ্বর প্রবেশ করেন।

তিনি বলেন, 'আমি গুরু আর ঈশ্বরকে আমার সামনে দণ্ডায়মান দেখেছি। তখন আমি আমার গুরুর সামনে সিজদায় পতিত হয়েছি, যিনি আমাকে রবের পরিচয় দিয়েছেন।'

তিনি বিভিন্ন সময় হিন্দুদের বিভিন্ন রীতিনীতির ব্যাপক সমালোচনা করতেন।

---

[১৪১] হুলুল—সৃষ্টিসত্তায় স্রষ্টার অনুপ্রবেশ। ইত্তিহাদ—সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার সত্তাগত একাত্মতা।—অনুবাদক।

এ ছাড়া অনেক আশ্চর্যজনক দর্শনও তিনি লালন করতেন, এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ এখানে তুলে ধরা সম্ভব নয়।

শিখ ধর্মের প্রবর্তক নানক—এই ব্যক্তির মাধ্যমে প্রভাবিত হয়েই আন্তঃধর্ম তথা সব ধর্ম সত্য—এমন দর্শন গ্রহণ করেছিলেন। এ ব্যাপারে সামনে আলোকপাত করা হবে।

দুই. প্রেম-ভালোবাসার মতবাদ

এটিও পূর্বোক্ত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অর্জনের মতবাদের অনুরূপ। তবে এতে আরও একধাপ এগিয়ে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও অনুরাগের প্রতি উদ্‌বুদ্ধ করা হয়েছে। কবি মালিক মুহাম্মাদ জায়শি ছিলেন এই মতবাদের একজন বড় প্রচারক। তার *পদ্মাবত* নামে একটি কাব্যগ্রন্থ রয়েছে।

তিন. রামের প্রতিকৃতি

এই মতবাদের অনুসারীরা শুধু কল্পনায় ক্ষান্ত হতে চায় না। তারা পছন্দনীয় কোনো ব্যক্তিকে নির্বাচন করে তাকে ঈশ্বরের মর্যাদা দেয়। এটি ধ্যানকালে তাদের মনঃসংযোগ স্থির রাখতে সহযোগিতা করে। তারা মনে করে, রাম একটি উত্তম চরিত্রের প্রতিকৃতি। ঋষি তুলসি দাসকে (১৫১৭-১৬৪৩ খ্রিষ্টাব্দ) এই মতবাদের একজন প্রভাবশালী মুখপাত্র হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি রামের ব্যক্তিত্বকে ভদ্র সন্তান, প্রেমময় স্বামী, প্রিয় ভাই, অন্তরঙ্গ বন্ধু, ন্যায়পরায়ণ বিচারকসহ বহু গুণের সমন্বয়ে চিত্রায়িত করেছেন।[১৫২]

চার. কৃষ্ণের প্রতিনিধি

এই দর্শনও পূর্বোক্ত মতবাদের মতো। তবে এখানে শুধু ব্যক্তির ভিন্নতা রয়েছে। তুলসি দাস যেখানে রামকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন, সুর দাস (১৫০৮-১৫৮৩ খ্রিষ্টাব্দ) সেখানে কৃষ্ণকে নায়ক হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি তাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন গল্প ও রূপকথা তৈরি করেন।

এমন সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবেশের মধ্যেই পাঞ্জাবের অন্তর্গত লাহোর অঞ্চলে এক ক্ষত্রিয় হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন শিখ ধর্মের প্রবর্তক নানক (১৪৬৯-

১৫২ হিন্দুধর্মের ইতিহাস-অংশে রামের ঐতিহাসিক অস্তিত্বের আলোচনা করা হয়েছে।

১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ)। তিনি বাল্যকাল থেকেই একাকিত্ব ও নির্জনবাসের অনুরাগী ছিলেন। তিনি বেশ কয়েকজন মুসলিম সুফির সান্নিধ্যও পেয়েছিলেন। তন্মধ্যে হুসাইন দরবেশ, শায়খ ইসমাইল বুখারি, আলি হাজবিরি, বাবা ফরিদ গঞ্জেশকর (১৪৫২-১৫১০ খ্রিষ্টাব্দ) ও জালালুদ্দিন বুখারি উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া তিনি কবির দাসের শিষ্য ছিলেন। শিখধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ *গুরুগ্রন্থ সাহিব* তার রচনা বলে কথিত রয়েছে।[১৫৩] গ্রন্থটি শিখদের মধ্যে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। যদিও গ্রন্থটি পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন বক্তব্য ও ধর্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ। এতে ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধসহ ভারতবর্ষের ধর্মগুলোর একটি মিশ্রণ তৈরির চেষ্টা করা হয়েছে।

গ্রন্থটি অধ্যয়ন করলে বোঝা যায়, এর রচয়িতা নিজেকে সব ধর্ম ও মতবাদের অনুসারীদের সামনে অনুসরণযোগ্য হিসেবে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন; কিন্তু তার এই প্রয়াস শুরুতেই হোঁচট খায়। কেননা, হিন্দুদের মধ্যে শিখধর্ম তখন তৃতীয় শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়, যা একই সময়ে ইসলাম ও হিন্দুধর্মের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়েছিল।

এখন দেখে নেওয়া যাক, শিখরা হিন্দুদের থেকে কোন কোন ধর্মবিশ্বাস গ্রহণ করেছিল—

পাঁচ. আন্তঃধর্ম-দর্শন

নানকের আগে হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থ ভগবত *গীতায়* বলা হয়েছে, ‘যে উপায়েই তোমরা আমার উপাসনা করো, আমি সে পন্থায়ই তোমাদের রক্ষা করব। মানুষ আমার উপাসনার বিভিন্ন পথ অবলম্বন করে, প্রতিটি পথ আমার পর্যন্ত পৌঁছে দেবে।’

বেদান্তে উল্লেখ আছে, ‘*বেদান্ত* কোনো দর্শনের বিরোধিতা করে না, সেটি ধর্মীয় বা দর্শনগত মতবাদ হোক না কেন।’

এ ধরনের দর্শন হিন্দুদের মধ্যে বেশ প্রচলিত ছিল। তারা উদারতার সঙ্গে পরস্পরবিরোধী অনেক মতবাদ খুব সহজেই গ্রহণ করত। এ কারণে আমরা দেখেছি, তাদের অনেকে ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করে; আবার কেউ বহু ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। কেউ-বা আবার ঈশ্বরতত্ত্বকেই অবিশ্বাস করে। এতকিছুর পরও তারা হিন্দুত্বের গণ্ডিতে অবস্থান করে। কেননা, জন্মসূত্রেই তারা হিন্দু। ফলে কারও

১৫৩ কেরতার সিং বলেন, গুরুগ্রন্থ সাহিবের লেখক হলেন অর্জুন, তিনি ১৬০৬-১৬৮১ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে কিরদাসজির মাধ্যমে এটি লিখিয়েছিলেন। এতে বাবা ফরিদ গঞ্জেশকরের ১১২টি পঙক্তি আছে। একইভাবে গ্রন্থটিতে কবির দাসের বহু কবিতাও রয়েছে।

জন্য হিন্দুত্ব থেকে তাদের বহিষ্কার করার ক্ষমতা নেই। এর একটিই উপায়; আর সেটি হচ্ছে, তাদের মৃত্যুর পর আত্মা কোনো ভিনধর্মীর দেহ ধারণ করা বা অন্য কোনো বর্ণে প্রকট হওয়া। ভারতের ইতিহাসে এভাবেই আন্তঃধর্ম-দর্শন বা সব ধর্ম সঠিক হওয়ার বিশ্বাস প্রবর্তিত হয়।

নানক এই দর্শন কাজে লাগান এবং হিন্দুদের মধ্যে নতুন করে এই মতবাদ প্রচারের চেষ্টা করেন; কিন্তু কৌশলী এই ধর্মগুরু নিজের মতাদর্শের পাশাপাশি মানব-অভিরুচির সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ ইসলামি দর্শনগুলোও গ্রহণ করেন। এর পেছনে তার পরিকল্পনা ছিল সব মতবাদ ও ধর্মের মানুষদের আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে নিজেই আবির্ভূত হওয়া।

নানক বলেন, 'হিন্দুদের ছয়টি মতাদর্শ রয়েছে। প্রতিটির আলাদা প্রতিষ্ঠাতা ও গুরু রয়েছেন। তবে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠাতা একই জলাধারের পানি পান করেছেন; যদিও তাদের রীতি, অভ্যাস ও বেশভূষায় ভিন্নতা রয়েছে। তাই যে মতাদর্শ স্রষ্টা, তার মহত্ত্ব ও সক্ষমতায় বিশ্বাস করবে, তুমি তা গ্রহণ করো। এতেই রয়েছে উৎকর্ষ ও উন্নতি। তুমি কি দেখো না, সূর্য একটাই; অথচ আবহাওয়া ভিন্ন ভিন্ন। হে নানক, স্রষ্টা একজন, যদিও তার উপাসনার পন্থা ভিন্ন ভিন্ন।'

শিখ ধর্মগুরু কোবিন্দ সিং বলেন, 'হিন্দুদের মন্দির ও মুসলমানদের মসজিদে কোনো পার্থক্য নেই। হিন্দুদের উপাসনা ও মুসলমানদের সালাতেও কোনো পার্থক্য নেই।'

এই ধর্মগুরুকে আমরা বলতে চাই, হিন্দুদের মন্দির আর মুসলমানদের মসজিদ বাহ্যিকভাবে ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের দিক থেকে কোনোভাবেই এক মানের নয়। মন্দিরগুলো হয় মূর্তির আশ্রম; আর তা পবিত্র করা হয় গরুর গোবর ও মূত্র দিয়ে। অন্যদিকে মুসলমানদের মসজিদ হয় আল্লাহর ইবাদতের জায়গা এবং তা পবিত্র করা হয় পানি ও মাটি দিয়ে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَأَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ أَحَدًا﴾

মসজিদসমূহ আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করার জন্য। অতএব, তোমরা আল্লাহর সঙ্গে কাউকে ডেকো না। [সুরা জিন : ১৮]

আবার হিন্দুদের উপাসনা হয় নৃত্য, বাজনা, গান, মূর্তিপূজাসহ বিভিন্ন ঘৃণ্য কাজের মাধ্যমে। যেমন : সন্তানের প্রত্যাশায় নারীদের দ্বারা পুরুষের লিঙ্গ স্পর্শ করা, যেটি তাদের ধর্মমতে লিঙ্গপূজা নামে পরিচিত।

অপরদিকে মুসলমানদের সালাত হচ্ছে পরিচ্ছন্ন দেহমনে আল্লাহর স্মরণ, প্রশংসাজ্ঞাপন ও স্রষ্টার সামনে বিনয় প্রকাশের নাম।

তাহলে এই ধর্মগুরু কীভাবে মন্দির আর মসজিদে সমতা পেলেন। কীভাবে হিন্দুদের পূজা আর মুসলমানদের সালাতে সাযুজ্য পেলেন। তবু যারা সবকিছুতে একাত্মতা খুঁজে বেড়ান, তারাই নানকের দর্শন অনুসরণ করেন।

নানক বলেন, 'একজন মানুষের জন্য সত্যিকারের মুসলমান হওয়া বেশ কঠিন; কিন্তু যদি এমন পাওয়া যায়, তাহলে আমরা তার পথ ছেড়ে দেবো। অর্থাৎ, শিখ বা মুসলমান—কাউকেই আপনি প্রত্যাখ্যান করতে পারবেন না, যদি সে আপনার বিশ্বাস গ্রহণ করে।'

আমরা এই ধর্মগুরুকে বলব, সত্যিকারের কোনো মুসলমান যদি আপনাদের এসব কাল্পনিক দর্শন ও বিশ্বাস গ্রহণ করে, তাহলে সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাবে। কেননা, ইসলাম সব ধরনের ভ্রষ্ট ধর্মবিশ্বাস প্রত্যাখ্যান করে।

আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ﴾

যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম তালাশ করে, কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং পরকালে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত। [সুরা আলে ইমরান : ৮৫]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শিখধর্মে হিন্দু-দর্শন

শিখসম্প্রদায় ভারতবর্ষের বহুল বিস্তৃত হিন্দুমতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। অবশ্য তারা পুরোপুরি হিন্দু-দর্শন গ্রহণ করেনি। এর পরিবর্তে তারা হিন্দু-দর্শনকে ব্যক্তিগত চিন্তাধারা ও নতুন আঙ্গিকে সাজিয়ে তোলার প্রয়াস চালিয়েছিল। অন্যদিকে আমরা আগেই দেখিয়েছি যে, হিন্দুরা কোনো মৌলিক ধর্মবিশ্বাস লালন করত না, ফলে তারা নতুন আত্মপ্রকাশ করা শিখ-দর্শনকে আঘাত না করে বরং উদারতার সঙ্গে এটাকে গ্রহণ করেছে। হিন্দুরা ধরে নিয়েছে, শিখরা তাদেরই একটা অংশ।

পাঠকের সামনে এখন হিন্দুদের থেকে গৃহীত শিখ ধর্মবিশ্বাসগুলোর বিবরণ তুলে ধরছি :

এক. জীবনের লক্ষ্য

হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অনুসারীদের মতে, জীবনের উদ্দেশ্য নির্বাণ লাভ করা। অর্থাৎ, আত্মা পরিভ্রমণ থেকে মুক্তিলাভ করে ব্রহ্মার সত্তার সঙ্গে মিলিত হওয়া। শিখরা হিন্দুদের কাছ থেকে এই মতবাদ গ্রহণ করেছে। তবে ইসলামের প্রভাবে প্রভাবিত হওয়ার ফলে ওরা বুঝতে পেরেছিল যে, এর সপক্ষে প্রমাণ দাঁড় করানো খুবই কঠিন হবে। তাই তারা এর সঙ্গে যোগ করেছে—কিন্তু প্রজ্ঞাময় ও ক্ষমতাবান আল্লাহ চাইলে তার দয়া ও অনুগ্রহে আত্মার এই পরিভ্রমণ থেকে মুক্তি দেবেন।

নিঃসন্দেহে বলা যায়, 'ঈশ্বরের ইচ্ছায় কোনো আত্মা পরিভ্রমণ থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে'—জন্মান্তরবাদের মূল বিশ্বাসে এই অংশটি ছিল না। কেননা, এর মাধ্যমে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য শ্রেণির লোকদেরও পুনর্জন্ম থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব প্রমাণিত হয়। যদিও কোনো কোনো হিন্দু পণ্ডিত এমনটি বলেছেন; কিন্তু এটি সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর অভিমত নয়।

দুই. অনুপ্রবেশবাদ বা ইত্তিহাদের আকিদা

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে এই ধর্মবিশ্বাস প্রসিদ্ধ ছিল। ভারতে সেই লোকদের সবচেয়ে উন্নত চিন্তার অধিকারী মনে করা হতো, যারা এ কথার বিশ্বাস লালন করত যে, সবকিছুতেই ঈশ্বর বিরাজমান, ঈশ্বর বিনে অন্য কিছুর অস্তিত্ব নেই। *বেদান্তের* ভাষায় এটিই তাদের দর্শনের সর্বোচ্চ স্তর।

বেদান্তের ভাষায় :

- প্রথম পদক্ষেপ : সৃষ্টিকে চেনার মাধ্যমে স্রষ্টাকে চেনা।
- দ্বিতীয় পদক্ষেপ : স্রষ্টা ও জগতের ধরনের মধ্যে পার্থক্য করা।
- তৃতীয় পদক্ষেপ : স্রষ্টা ও এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূল অণুর মধ্যে একাত্মতার বিশ্বাস লালন করা।
- চতুর্থ পদক্ষেপ : হিন্দুদের মতে এটিই সর্বোচ্চ স্তর এবং এ কথার বিশ্বাস লালন করা যে, সৃষ্টির মূল বিন্দু ঈশ্বরের মধ্যেই বিলীন হয়। কেননা, ঈশ্বরই সৃষ্টির মূল এবং অবশ্যই তা ঈশ্বরের মধ্যে বিলীন হবে।

এ কারণে *বেদান্ত* ঈশ্বরের সঙ্গে অন্য কারও পূজার বিরোধ করে না।

বেদান্তের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার শংকরাচার্য (৭৮৮-৮২০ খ্রিষ্টাব্দ) ভারতীয় এ দর্শনটি গ্রহণ করেন এবং ভারতের সাধারণ শ্রেণির মধ্যে তা ছড়িয়ে দেন। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের বহু অনুসারী এই দর্শন গ্রহণ করে। তখন থেকেই হিন্দু সন্ন্যাসীরা শারীরিক কষ্টভোগে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি শুরু করে। তারা সাধনা ও নিজেদের জীবন শেষ করতে স্রষ্টার সত্তায় অনুপ্রবেশের লক্ষ্যে বিভিন্ন কষ্টকর তপস্যায় মগ্ন হয়।

শংকরাচার্যের একটি বাণী ছিল এমন, 'আত্মা, ব্রহ্মা ও জগৎ একই বস্তু। আমরা আমাদের অনুধাবনক্ষমতার অপ্রতুলতায় এসবের মধ্যে পার্থক্য করি। যদি আমরা আমাদের আত্মাকে কামনা ও ক্রোধ থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হই, তাহলে এই তিনটিকে একই সত্তারূপে দেখতে পাব।'

বেদান্তের এক ব্যাখ্যাকার বলেন, 'আমরা ঈশ্বরকে তার সত্তায় দেখতে পারি না; আবার তার সৃষ্টির মধ্যেও দেখতে পাই না। কেননা, আমরা সব দিক থেকে 'মায়া' বা ভ্রমের মধ্যে বসবাস করি। এটি সর্বদা আমাদের মধ্যে আমিত্বকে জাগ্রত রাখে। যদি আমরা এটাকে মুছে দিতে পারি এবং ঈশ্বরের চাহিদা অনুযায়ী জীবনযাপন করতে পারি, তাহলে আমরা অনুধাবন করতে পারব—কীভাবে আমরা বিলীন

হচ্ছি; আর কীভাবে ঈশ্বরের মাঝে মিলিত হচ্ছি—যেভাবে সাগরের ঢেউ তার গভীরে মিলিত হয়।

শংকরাচার্য ও তার অনুসারীদের এসব কাল্পনিক ধারণা অক্ষরে অক্ষরে গ্রহণ করেছেন শিখ ধর্মপ্রবর্তক নানক। তিনি তার *গুরুগ্রন্থ সাহিবে* বলেন, 'তুমিই কলম, তুমিই লেখা, তুমিই কালি, তুমিই টেবিল।'

নানক আরও বলেন, 'শুধুই তুমি, তুমি বিনে কিছু নেই।'

অন্যত্র তিনি বলেন, 'তুমিই মাছ, তুমিই জাল আর তুমিই শিকারি। তুমি শুধুই তুমি। তুমি বিনে কিছুই নেই।'

মূলত, ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে শিখদের বিশ্বাস এমনই।

অপরদিকে শিখরা এ দাবির মাধ্যমে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করেছে যে, তারাও ইসলামের দর্শনমতো তাওহিদে বিশ্বাসী। কিন্তু কোথায় বিশুদ্ধ তাওহিদ আর কোথায় অনুপ্রবেশবাদের মতো ভ্রান্ত দর্শন।

তিন. হিন্দুদের রূপকথা

শিখরা দাবি করে তারা একত্ববাদে বিশ্বাসী। তার মহান আল্লাহর সঙ্গে কাউকে অংশীদার মনে করে না। শুধু তা-ই নয়, তাদের মতে তারাই প্রথম যথাযথভাবে একত্ববাদের মর্ম অনুধাবন করেছে। তারা বিভিন্ন ধর্ম থেকে একত্ববাদের বিক্ষিপ্ত অংশগুলো সংগ্রহ করে একে পরিশুদ্ধ করেছে। এর পক্ষে বিভিন্ন যৌক্তিক প্রমাণাদির অবতারণা ঘটিয়েছে, যা ইতিপূর্বে অন্য কেউ করতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু শিখদের পবিত্র গ্রন্থটি পাঠের সময় তাতে তাওহিদের আকিদার সঙ্গে সাংঘর্ষিক বিভিন্ন গল্পের অবতারণা দেখে আপনাকে চমকে যেতে হবে।

ধরুন, গুরুগ্রন্থ সাহিবের রচয়িতা নানকের ভাষ্য—'ব্রহ্মা আত্মপ্রকাশ করেছিলেন বিষ্ণুর নাভি থেকে। আত্মপ্রকাশের পর তিনি বেদের মন্ত্রগুলো পাঠ করছিলেন; কিন্তু ঈশ্বরের সত্তা পূর্ণ অনুধাবন করতে সক্ষম না হওয়ায় তিনি অস্থিরতার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকেন।'

অন্যত্র তিনি বলেন, 'তিনিই বিষ্ণু, তিনি শিব, তিনি ব্রহ্মা, তিনিই পার্বতী, তিনিই লক্ষ্মী। যে ঈশ্বরকে ব্যক্ত করতে চাইবে, সে ঈশ্বরের যথাযথ ধারণা না থাকায় বোবা ও বধির হয়ে থাকবে। পুরাণ, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও সাধুরা এর সপক্ষে সাক্ষ্য দেবেন; আর ধর্মদেব তোমার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করবেন। (অধ্যায় চাব চি)

এই অধ্যায়টি শিখদের পবিত্র গ্রন্থের ভূমিকা, যা তারা প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা পাঠ করে। এতে তাওহিদের লেশমাত্রও নেই; বরং এতে হিন্দুদের বিভিন্ন রূপকথা ও মূর্তির নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। এসবে শুধু আল্লাহর সঙ্গে শিরকের আলোচনা পাওয়া যায়। তা ছাড়া শিখরা কখনো বিশুদ্ধ তাওহিদের সত্যিকারের দর্শন ধারণ করতে পারেনি। যদি তারা ইসলামে দীক্ষিত হতো, তাহলে হয়তো তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত বস্তুর দেখা পেত।

চার. গানবাজনা

হিন্দু সন্ন্যাসিনীরা নৃত্য, বাদ্য ও গানের মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি তাদের ভালোবাসা ও অনুরাগের প্রকাশ করে। কৃষ্ণের অনুরাগিণীদের মধ্যে যারা নারী কবি হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়েছিল, তার প্রতি প্রেম ও অনুরাগ প্রকাশ করেছিল, তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল মীরাবাই (১৫১৬-১৫৪৬ খ্রিষ্টাব্দ), যে বিভিন্ন মন্দির ও আশ্রমে সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে যাত্রা করত। সে নিজের মনোমুগ্ধকর কণ্ঠে তাদের তন্ময় করে তুলত। করতাল (এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র) বাজাত এবং কৃষ্ণের মূর্তির সামনে নৃত্য করত। বৃন্দা থেকে দ্বারকা পর্যন্ত বিভিন্ন মন্দিরে যাতায়াত করত।[১৫৪]

এভাবেই হিন্দু-দর্শনে গানবাজনা স্থান করে নেয়।

হিন্দু পণ্ডিত ও দার্শনিকগণ গানবাজনাকে জগতের সৃষ্টি ও অনস্তিত্ব থেকে এর অস্তিত্বলাভের মাধ্যম মনে করেন। তারা বিশ্বচরাচরের সবকিছুতেই এর তাল অনুভব করেন।

শিখধর্মে গানবাজনার দর্শন এমন ছিল না। এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা নানক অসাধারণ বাদ্য বাজাতে পারদর্শী ছিলেন। এটা তিনি নিজ ধর্মের প্রচারের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি তার রচিত *গুরুগ্রন্থ সাহিব*কে গানের ছন্দে বিন্যস্ত করেন, যা ৩১টি স্বরে সাজানো।

এই গ্রন্থের শেষে আমরা স্বরসমূহের বিস্তারিত একটি তালিকা দেখতে পাই। প্রতিটি স্বরের পাঁচটি শাখা ও আটটি সুর রয়েছে। এগুলোকে নানক 'স্ত্রী ও সন্তান' হিসেবে অভিহিত করেছেন। এ ছাড়া গ্রন্থটি শিখদের পবিত্র গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত।

শিখধর্মের একজন ধর্মীয় ব্যক্তি গোপাল সিং বলেন, 'শিখ ধর্মাবলম্বী অধিকাংশ গুরু[১৫৫] গানবাজনায় পারদর্শী ছিলেন। এই ধর্মের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা নানক বিভিন্ন

[১৫৪] বৃন্দা ও দ্বারকা : কৃষ্ণের মূর্তিসমৃদ্ধ মন্দিরের জন্য প্রসিদ্ধ দুটি শহর।
[১৫৫] শিখধর্ম পূর্ণাঙ্গ করা ১০ জন গুরু।

সমাবেশে অত্যন্ত সুরেলা কণ্ঠে গানবাজনা করতেন। ইসলাম ধর্মাবলম্বী কিছু মানুষ তার সঙ্গে কাঠের তবলা বাজাতেন। তিনি তার গ্রন্থ ছন্দাকারে সংকলন করেন। এ জন্য শিখদের উপাসনাসমূহে গানবাজনার ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তাদের ধর্মীয় রীতিনীতি গানবাজনার মাধ্যমে পালন করা হয়। তাই এটি শিখধর্মের অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়েছে। এ ছাড়া এই ধর্ম মানুষের মধ্যে এসব সৌন্দর্য ও শিল্পের কারণে পরিচিত হয়েছে। প্রতিটি শিখ নর-নারী নিজেদের শরীরে ছন্দের প্রবাহ অনুভব করে, যেভাবে তাদের দেহে রক্ত প্রবহমান হয়। শিখ ধর্মবিশ্বাস এভাবেই হিন্দুধর্মের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়েছে। এর বাইরেও তারা নতুনভাবে অনেক কিছু আবিষ্কার করেছে।

এই ছিল গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ধর্মবিশ্বাসের বিবরণ, শিখ ধর্মাবলম্বীরা যা হিন্দুদের থেকে গ্রহণ করেছে। এ ছাড়া শিখধর্মে যেসব বিষয় হিন্দু ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক, তার কয়েকটি নিম্নরূপ :

১. শিখ ধর্মমতে কর্মমার্গ তথা নৈবেদ্য ও ধর্মীয় রীতির মাধ্যমে মুক্তি মিলবে না। জ্ঞানমার্গ তথা জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অর্জনের মাধ্যমেও মুক্তি পাওয়া যাবে না। কেবল এক ঈশ্বরের উপাসনা ও তার অনুসরণের মাধ্যমেই মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

নিঃসন্দেহে এ ব্যাপারে শিখরা মুসলমানদের মাধ্যমে বেশি প্রভাবিত হয়েছে। হিন্দুরা উপাসনার মর্ম অনুধাবন করতে সক্ষম হয়নি। তারা কর্মমার্গ ও জ্ঞানমার্গকেই মুক্তির একমাত্র উপায় মনে করে।[১৫৬] কিন্তু ইসলাম ইবাদত ও অনুসরণের প্রতি আহ্বান করে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন,

﴿وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ﴾

তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না। [সুরা বনি ইসরাইল : ২৩]

আল্লাহ আরও বলেন,

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ﴾

আমি মানুষ ও জিনকে আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি। [সুরা জারিয়াত : ৫৬]

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

[১৫৬] তাদের মতে, এ দুটির সঙ্গে নির্বাণপ্রাপ্তির জন্য ভক্তিমার্গ তথা সাধনাও থাকা জরুরি।

﴿اِنَّ اَرْضِىْ وَاسِعَةٌ فَاِيَّاىَ فَاعْبُدُوْنِ﴾

নিশ্চয় আমার জমিন প্রশস্ত, সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত করো। [সুরা আনকাবুত : ৫৬]

এ ছাড়া এ মর্মে কুরআনে আরও অনেক আয়াত রয়েছে।

অনুসরণের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে আল্লাহ বলেন,

﴿اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ۗ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ﴾

তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তোমরা তার অনুসরণ করো এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে অনুসরণ করো না। তোমরা তো অল্পই উপদেশ গ্রহণ করো। [সুরা আরাফ : ৩]

আল্লাহ আরও বলেন,

﴿وَاتَّبِعُوْٓا اَحْسَنَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ﴾

তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ উত্তম বিষয়সমূহের অনুসরণ করো। [সুরা জুমার : ৫৫]

এ প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি আয়াত রয়েছে।

২. শিখধর্ম সন্ন্যাস ও বিরাগী জীবনকে নিষিদ্ধ মনে করে। এই ধর্ম একেবারে দুনিয়াবিমুখ হওয়াকে সমস্যাজনক মনে করে এবং মানুষকে উপার্জনে লিপ্ত হতে উদ্বুদ্ধ করে। অন্যদিকে হিন্দু ও বৌদ্ধ সাধুরা এর বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করেছে। তারা এই জগতকে ক্ষতির মূল মনে করে। নিঃসন্দেহে বলা যায়, শিখধর্মের এই দর্শন হিন্দু-দর্শনের তুলনায় ইসলামি বিশ্বাসের বেশি নিকটবর্তী।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন,

﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ﴾

হে ইমানদারগণ, তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং যা আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করো এবং তা থেকে নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করতে মনস্থ করো না। কেননা, তা তোমরা কখনো

গ্রহণ করবে না, তবে যদি তোমরা চোখ বন্ধ করে নিয়ে নাও। জেনে রেখো, আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। [সুরা বাকারা : ২৬৭]

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوٰةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

এরপর সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহের সন্ধান করো। আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফল হও। [সুরা জুমুআ : ১০]

এর পাশাপাশি নবিজির অনেক হাদিস মুমিনদের উপার্জনে লিপ্ত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে। আল্লাহর ওপর ভরসার ভান করে মানুষের কাছ থেকে যাঞ্চা করতে বারণ করে। যেমন, আবু হুরাইরা রা. সূত্রে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেছেন,

তোমাদের কেউ যদি রশি নিয়ে বের হয়, এরপর কাঁধে লাকড়ি বহন করে আনে এবং তা বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে এবং দানও করে, তা তার পক্ষে আল্লাহর অনুগ্রহধন্য ব্যক্তির কাছে এসে যাঞ্চা করার চেয়ে উত্তম, যে হয়তো তাকে কিছু দান করবে বা ফিরিয়ে দেবে। কেননা, উপরের হাত (দাতার হাত) উত্তম নিচের হাতের চেয়ে।[১৫৭]

৩. শিখদের মতে আত্মার বার বার পরিভ্রমণ নিশ্চিত বিষয় নয়; বরং মানবাত্মা কখনো শুধু ঈশ্বরের দয়া ও অনুগ্রহে পুনর্জন্ম থেকে মুক্তি পেতে পারে।

কিন্তু হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মমতে আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে মুক্তি পাওয়ার কোনো ধারণা নেই।

৪. শিখ ধর্মমতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবারই মুক্তিলাভের অধিকার রয়েছে। হিন্দু ধর্মবিশ্বাস এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। সেখানে নারীদের সকল অকল্যাণের মূল হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর জৈন ধর্মমতে, নারীদের মুক্তিলাভের জন্য পুরুষের দেহ ধারণ করে পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হবে।

অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

[১৫৭] মুত্তাফাক আলাইহি।

হে মানুষ, আমি তোমাদের এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে তোমাদের বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত, যে সর্বাধিক তাকওয়াসম্পন্ন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন। [সুরা হুজুরাত : ১৩]

ইসলাম নারী-পুরুষকে আলাদাভাবে বিবেচনা করেনি; বরং নারী-পুরুষ প্রত্যেককে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে বিবেচনা করে।

৫. শিখ ধর্মমতে বিভিন্ন ভাষার মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। সব ভাষার মর্যাদা সমান। ঈশ্বর মানুষের মনের ভাষা অনুধাবন করেন; কিন্তু হিন্দুধর্ম এ ক্ষেত্রে সংস্কৃতভাষাকে পবিত্র মনে করে, যা বেদ গ্রন্থসমূহের ভাষা; যে ভাষায় ব্রহ্মা সৃষ্টিকে সম্বোধন করেছেন। এ ভাষা ছাড়া তাদের উপাসনা গ্রহণযোগ্য হয় না।

বর্তমানে এই ভাষা ভারতে মৃতপ্রায়। এমনকি হিন্দু ধর্মবেত্তারাও একে অপরের সঙ্গে কথোপকথন এই ভাষার ব্যবহার করেন না।

অপরদিকে কুরআনে আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

আমি প্রত্যেক রাসুলকে তাঁর স্বজাতির ভাষাভাষী করেই পাঠিয়েছি, যাতে তাদের পরিষ্কারভাবে বোঝাতে পারে। এরপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথপ্রদর্শন করেন। তিনি পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। [সুরা ইবরাহিম : ৪]

আর মহান আল্লাহ তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থ স্পষ্ট আরবিভাষায় অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

আমি একে করেছি কুরআন, আরবিভাষায়, যাতে তোমরা বুঝো। [সুরা জুখরুফ : ৩]

৬. শিখদের মতে, ঈশ্বর শ্রেণিবৈষম্য করেন না। তার অনুগ্রহ সবার জন্য সমান; কিন্তু হিন্দুরা মনে করে, স্রষ্টার দরবারে ব্রাহ্মণরাই সম্মানের অধিকারী। তারাই ঈশ্বরের উপাসনা করবে, তার জন্য নৈবেদ্য অর্পণ করবে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

হে মানবসমাজ, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত করো, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন। তাতে আশা করা যায় তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারবে। [সুরা বাকারা : ২১]

প্রসিদ্ধ এক হাদিসে রাসুল ﷺ ইরশাদ করেন,

وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً

আগের নবিগণ বিশেষ গোত্রের কাছে প্রেরিত হতেন; আর আমি প্রেরিত হয়েছি সকল মানুষের কাছে।[১৫৮]

৭. শিখধর্ম 'অবতার' তথা স্রষ্টার মানবরূপে অবতরণের দর্শনকে অস্বীকার করে রিসালাতের দর্শন লালন করে, যা ইসলামি দর্শনের অনুরূপ।

অপরদিকে আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুলকে মানুষের মধ্যে এ কথার ঘোষণা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন,

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ﴾

বলুন, আমিও তোমাদের মতোই একজন মানুষ। আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহই একমাত্র ইলাহ। [সুরা কাহাফ : ১১০]

অবশ্য শিখধর্মের অনুসারীরা বেশিদিন এই মতবাদের ওপর অবিচল থাকেনি। তারা তাদের ধর্মসংস্কারকদের মৃত্যুর পর তাদের ধর্মগুরু ও সংস্কারকদের শীঘ্রই ঈশ্বরের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এসবের উপাসনায় লিপ্ত হয়েছে। বিভিন্ন ব্যাপারে তারা অন্যদের চেয়ে বেশি শিরকে লিপ্ত হয়েছে। তাদের গুরুরাই তাদের আইনপ্রণেতা। তাদের কথা বা বচনই পবিত্র বচন। ধ্যানে তাদের স্মরণ করাই শ্রেষ্ঠ ইবাদত।

এই ছিল হিন্দুধর্ম মতবাদের সঙ্গে শিখদের ধর্মবিশ্বাসের বিরোধসমূহ।

[১৫৮] সহিহ বুখারি: ৩৩৫।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলামের আলো থেকে শিখদের সংগ্রহ

এক. আল্লাহ তাআলার গুণাবলি

অসংখ্য মতবিরোধ ও দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও শিখরা ইসলাম থেকে অনেক কিছু আহরণ করে নিজেদের মতবাদের সঙ্গে যুক্ত করেছে। তন্মধ্যে আল্লাহ তাআলার গুণাবলির ধারণা অন্যতম। হিন্দুরা ঈশ্বরের গুণাবলি বহু সত্তার মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছে। তারা স্রষ্টা, আত্মা ও সৃষ্টির মূল বস্তুকে অনন্তকালীন মনে করে। প্রাচীনকাল থেকে হিন্দু ধর্মবেত্তাগণ তাদের এসব ধর্মবিশ্বাসকে দলিল-প্রমাণ দিয়ে সুসংহত করার প্রয়াস চালিয়েছিল; কিন্তু স্বাধীন মস্তিষ্ক কখনো এসব প্রমাণ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ গ্রহণে আগ্রহ দেখায়নি। অন্যদিকে শিখ ধর্মবেত্তাগণ মুসলিম আলিমগণের নিয়মিত সান্নিধ্যধন্য হয়েছিলেন। তাই তাদের কিছু ধর্মবিশ্বাস মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাস থেকে লব্ধ হলে সেটি অবাক হওয়ার মতো কিছু নয়। তবে কোনো মুসলমান এমনটি ধারণা করতে পারে না—শিখধর্মের প্রতিষ্ঠাতা নানক গোপনে ইসলামের-অনুসারী ছিলেন, যদিও তিনি বাহ্যত হিন্দু ছিলেন।

ভারত ও ইউরোপের কিছু মানুষ এমনটা ধারণা করে থাকে; কিন্তু প্রত্যেক মুসলমানকে এ কথা ভালোভাবে অনুধাবন করতে হবে যে, ইসলাম বণ্টনযোগ্য কোনো ধর্ম নয়। কেউ যদি ইসলামের কোনো আদর্শ গ্রহণ করে এর সঙ্গে অন্য কোনো আদর্শ লালন করে এবং এসবের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করে, তবে তার সঙ্গে ইসলামের কোনো সম্পর্ক থাকে না।

আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল স্রষ্টার ব্যাপারে শিখদের ধারণা। শিখ ধর্মবিশ্বাসের অনুসারীরা স্রষ্টার একত্ববাদে বিশ্বাস করে। তারা মনে করে, তিনি অবিনশ্বর, সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনিই সবকিছু সন্নিবেশকারী এবং সবকিছুর কারণ। তিনি বিদ্বেষ ও হিংসা থেকে মুক্ত। তিনি বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের স্রষ্টা

নন; বরং পুরো মানবজাতির স্রষ্টা। তিনি ন্যায়বিচারক, দয়াময় ও ক্ষমাশীল। তিনি মানুষকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেননি; বরং তাঁর উপাসনার জন্য সৃষ্টি করেছেন।[১৫৯]

এই ভাষ্যমতে এখানে এমন কিছু ধারণা রয়েছে, যা ইসলামি দর্শনের অনুরূপ।

১. আল্লাহ বলেন,

﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

তিনিই প্রথম, তিনিই সর্বশেষ, তিনিই প্রকাশমান ও অপ্রকাশমান এবং তিনিই সব বিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত। [সুরা হাদিদ : ৩]

মহান আল্লাহর সত্তার ব্যাপারে শরিয়তের পরিভাষায় আদি ও অবিনশ্বর শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়নি, তাই তর্কবিদগণের ব্যবহৃত এই শব্দগুলো ব্যবহার না করাই যুক্তিযুক্ত।

২. মহান আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা। আল্লাহ বলেন,

﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا﴾

তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। এরপর তা নির্ধারণ করেছেন যথাযথ অনুপাতে। [সুরা ফুরকান : ২]

৩. প্রসিদ্ধ এক হাদিসে আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে; তিনি বলেন,

أَتَتْ فَاطِمَةُ النَّبِيَّ ﷺ ـ تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَقَالَ لَهَا مَا عِنْدِي مَا أُعْطِيكِ. فَرَجَعَتْ فَأَتَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ الَّذِي سَأَلْتِ أَحَبُّ إِلَيْكِ أَوْ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ. فَقَالَ لَهَا عَلِيٌّ قُولِي لاَ بَلْ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ فَقَالَتْ فَقَالَ قُولِي اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ.

একটি খাদিম চাইতে ফাতিমা রা. নবিজি ﷺ-এর কাছে এলেন। তিনি তাঁকে বলেন, 'আমার কাছে এমন কিছু নেই, যা আমি তোমাকে দিতে পারি।' তিনি ফিরে গেলেন। পরে নবিজি তার কাছে এসে বলেন, 'যা তুমি চেয়েছ,

[১৫৯] ড. গোপাল সিং *গুরুগ্রন্থ সাহিবের* ভূমিকায় এমনই লিখেছেন।

সেটাই কি তোমার কাছে অধিক প্রিয়, না যা তার চেয়ে উত্তম সেটি? আলি রা. বললেন, 'না, বরং যা এর চেয়েও উত্তম।' নবিজি বলেন, 'তুমি বলো, হে আল্লাহ, সাত আসমানের প্রতিপালক ও মহান আরশের প্রভু, আমাদের প্রতিপালক এবং প্রতিটি জিনিসের প্রতিপালক, তাওরাত, ইনজিল ও মহান কুরআন অবতীর্ণকারী। তুমিই আদি; তোমার পূর্বে কিছুই নেই। তুমি অন্ত; তোমার পরেও কিছু নেই। তুমিই প্রবল, বিজয়ী ও প্রকাশ্য; তোমার উপরে কিছুই নেই। তুমিই গুপ্ত, তুমি ছাড়া আর কিছু নেই। অতএব, তুমি আমাদের ঋণ পরিশোধ করে দাও এবং দরিদ্রতা দূর করে আমাদের স্বাবলম্বী বানাও।[১৬০]

৪. তিনি বিশেষ কোনো শ্রেণির স্রষ্টা নন; বরং পুরো মানবজাতির স্রষ্টা। আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

হে মানবসমাজ, তোমরা তোমাদের সেই পালনকর্তার ইবাদত করো, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন। তাতে আশা করা যায়, তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারবে। [সুরা বাকারা : ২১]

অপরদিকে হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাস মতে, ব্রহ্মা—তিনি শুধু ব্রাহ্মণদের স্রষ্টা, যিনি নিজের মুখমণ্ডল থেকে তাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাদের উপাসনা গ্রহণ করেন। এ ছাড়া অন্যান্য শ্রেণির লোকেরা হিন্দু ধর্মমতে চণ্ডালশ্রেণির। তারা কখনো মুক্তি লাভ করতে পারবে না। পরবর্তী জনমে ব্রাহ্মণ হিসেবে জন্মগ্রহণ করলেই শুধু তাদের মুক্তি মিলবে।

তাই হিন্দু ধর্মমতে একজন মানুষ সৃষ্টিগত বা জন্মগতভাবেই অপবিত্র হিসেবে জন্মগ্রহণ করে।

ইসলামের ভাষ্যমতে,

﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا﴾

নিশ্চয়ই মুশরিকরা অপবিত্র। সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন মাসজিদুল হারামের কাছে না আসে। [সুরা তাওবা : ২৮]

এই অপবিত্রতা শিরক, কুফর ও অবিচারের। ফলে একজন মুশরিক যখন আল্লাহর ওপর ইমান আনে, রাসুলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহ

[১৬০] *সহিহ মুসলিম* : ২৭১৩।

তাআলার বিধিবিধান মান্য করে, সে মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হবে। শিখধর্ম ইসলাম থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে এই মতাদর্শ গ্রহণ করেছে।

৫. আল্লাহ তাআলা ন্যায়পরায়ণ। ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

আপনার প্রতিপালকের বাক্য পূর্ণ সত্য ও সুষম। তাঁর বাণীর কোনো পরিবর্তনকারী নেই। তিনিই শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী। [সুরা আনআম : ১১৫]

৬. আল্লাহ তাআলা দয়াময়। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ﴾

তোমাদের উপাস্যই একমাত্র উপাস্য। তিনি ছাড়া মহা করুণাময় দয়ালু আর কেউ নেই। [সুরা বাকারা : ১৬৩]

৭. তিনি মহামহিম। ইরশাদ হয়েছে,

﴿يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾

হে মানুষ, কীসে তোমাকে তোমার মহামহিম পালনকর্তা সম্পর্কে বিভ্রান্ত করল। [সুরা ইনফিতার : ৬]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

﴿فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ﴾

অতএব, শীর্ষ মহিমায় আল্লাহ। তিনি সত্যিকারের মালিক, তিনি ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। তিনি সম্মানিত আরশের মালিক। [সুরা মুমিনুন : ১১৬]

৮. মানবজীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

আমি মানুষ ও জিনকে আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি। [সুরা জারিয়াত : ৫৬]

হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মাবলম্বীরা জন্মান্তরবাদ ও আত্মার পরিভ্রমণে বিশ্বাস করে। তাই পৃথিবীপৃষ্ঠে আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তা সবই পূর্ববর্তী জনমের ভালো-মন্দের পরিণতি। ব্রহ্মার সঙ্গে মিলিত হওয়া তথা নির্বাণ লাভ করা পর্যন্ত আত্মা জগতের কারাগারে শাস্তি পেতে থাকবে।

এভাবেই আমরা দেখেছি, শিখ ধর্মগ্রন্থগুলো হিন্দুধর্মের তুলনায় ইসলামের মাধ্যমে

বেশি প্রভাবিত হয়েছে। শিখধর্মের পবিত্র গ্রন্থগুলো আল্লাহর সম্মানিত নাম ও গুণাবলিতে পরিপূর্ণ। অপরদিকে হিন্দুধর্ম স্রষ্টার এসব গুণবাচক নাম সম্পর্কে অবগতই নয়।

ডক্টর গোপাল চন্দ্র সিং শিখদের ধর্মবিশ্বাসের বিবরণে আরও বলেন, 'স্রষ্টার আদালতে সকল মানুষ সমান। আল্লাহ তাআলা কোনো জাতি বা শ্রেণির বিবেচনা করবেন না। প্রত্যেককেই নিজ নিজ কর্মের হিসাব দিতে হবে।'

শিখ ধর্মাবলম্বীদের এই বিশ্বাস আর হিন্দু ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে পাঠক একটু তুলনা করে দেখুন—হিন্দু ধর্মমতে শূদ্রসম্প্রদায় সবচেয়ে নিকৃষ্ট। এমনকি তারা পশু ও কীটপতঙ্গের চেয়েও নিম্নমানের; আর ব্রাহ্মণরা সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। হিন্দুদের কাছে তাদের মর্যাদা স্রষ্টার মর্যাদার সমান।

ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে প্রথমবারের মতো শিখরাই এই ঐশী ন্যায়পরায়ণতার প্রবক্তা হয়েছিল। নিঃসন্দেহে তারা এটি আহরণ করেছিল ইসলামের আলো থেকেই।

নানক বলেন, 'রব এই জগতের দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা।'

এ ব্যাপারে কুরআনে উল্লেখ হয়েছে,

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾

আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, আর যা কিছু তোমরা করো। [সুরা সাফফাত : ৯৬]

কুরআনে আরও ইরশাদ হয়েছে,

﴿قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا﴾

তিনি বললেন, এমনিতেই হবে। তোমার পালনকর্তা বলে দিয়েছেন, এটা আমার পক্ষে সহজ। আমি তো ইতিপূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি এবং তুমি কিছুই ছিলে না। [সুরা মারইয়াম : ৯]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

﴿هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾

মানুষের ওপর এমন কিছু সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না। [সুরা দাহর : ১]

আর হিন্দুদের মতে, এই জগতের সৃজনের জন্য ব্রহ্মার আত্মা ও সৃষ্টির মূলের প্রয়োজন ছিল।

নানক বলেন, 'তিনি ইন্দ্রিয়ানুভূত নন।'

কুরআন বলছে,

﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ۖ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾

কোনো কিছুরই দৃষ্টিসীমা তাঁকে বেষ্টন করতে পারে না; কিন্তু তিনি সবার দৃষ্টি বেষ্টন করতে পারেন। তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী, সুবিজ্ঞ। [সুরা আনআম : ১০৩]

এসব উদ্ধৃতির মাধ্যমে স্পষ্টভাবে শিখধর্মের প্রবর্তক নানকের ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। অবশ্য তিনি এর সঙ্গে মূর্তিপূজাজনিত কিছু ধর্মবিশ্বাস গুলিয়ে ফেলেছিলেন। এ জন্য তিনি বিশুদ্ধ তাওহিদের অনুসরণ করতে পারেননি। তিনি বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদের মধ্যে আন্তঃধর্ম সংযোগ তৈরির ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়েছিলেন। তার রচিত যে গ্রন্থটি শিখ ধর্মাবলম্বীদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র গ্রন্থ বলে বিবেচিত, সেখানে পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন দর্শন ও ধর্মবিশ্বাসের সমন্বয় রয়েছে। সে গ্রন্থটিতে আপনি একদিকে কবির দাস, রবিদাস, সুর দাস ও ব্রহ্মানন্দের মতো হিন্দু দার্শনিকদের মনগড়া কিছু গল্পগাথা দেখতে পাবেন; আবার বাবা ফরিদ গঞ্জেশকর ও বাবা মুর্দান খানের মতো মুসলিম সুফিসাধকদের মুখনিঃসৃত কিছু বাস্তবতা ও তত্ত্বের আলোচনাও দেখতে পাবেন। এ জন্য বিনা দ্বিধায় বলা যায়, এ-সকল সুফিসাধক ও হিন্দু দার্শনিকের মতবাদের মধ্যে বিশাল দ্বন্দ্ব ছিল। তাদের মধ্যে ছিল চরম আদর্শিক সংঘাত।

শুধু তা-ই নয়, শিখধর্মের প্রবক্তারা নিজেদের এ ধরনের আন্তঃধর্ম সংযোগের প্রয়াস নিয়ে গর্ববোধ করেন। এর ফলে সৃষ্ট সংঘাত ও শিখধর্ম অনুধাবনে যেসব সমস্যার তৈরি হয়েছে, তা নিয়ে তারা ভাবতে নারাজ।

দুই. শিখদের পাঁচটি কর্তব্য

পাঁচটি কর্তব্য একজন শিখের জন্য সর্বদা অবশ্যকরণীয় :

১. **কেশ :** মাথার চুল ও দাড়ি লম্বা রাখা। একজন শিখের জন্য চুল-দাড়ি মুণ্ডন করা নিষিদ্ধ।

২. **কাঙ্গা :** মাথার উপরে পাকযুক্ত বিনুনি, যেটি চিরুনির পরিবর্তে বানানো হয়।

৩. **কাশেরা :** উরু ঢেকে রাখার বিশেষ ধরনের অন্তর্বাস। তাদের জন্য হিন্দুদের মতো ধুতি পরিধান পাপ। ধুতি ৬ মিটার দীর্ঘ সেলাইবিহীন কাপড়, যা হিন্দুরা নাভির নিচে পরিধান করে।

৪. **কারা :** শিখদের হাতে পরার লোহার তৈরি বিশেষ বন্ধনী। তাদের জন্য অন্য সব অলংকার পরিধান করা অন্যায়।

৫. **কৃপাণ :** এক ধরনের তরবারি, যা শিখ পুরুষেরা ধারণ করে। শত্রুর মোকাবিলার জন্য এটির প্রয়োজন হয়।

তিন. শিখ ধর্মমতে নবুওয়াত ও রিসালাত

হিন্দুরা অবতারে বিশ্বাস করে। অবতার অর্থ, মানবকল্যাণে স্রষ্টার মানবরূপে আবির্ভূত হওয়া। হিন্দুধর্ম-সংক্রান্ত আলোচনায় আমি এ মতবাদের অসারতাগুলো তুলে ধরেছি; কিন্তু এ মতবাদটি হিন্দুধর্মের অনুসারীদের মধ্যে বহুল প্রচলিত ছিল। তারা তাদের ধর্মগুরুদের স্রষ্টার আসনে আসীন করত। শিখধর্মের প্রবর্তক নানকের মধ্যেও এ ধরনের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। যদিও শিখধর্মের প্রতিষ্ঠাতা এমন মতবাদের প্রবর্তন করেননি। তিনি এ ক্ষেত্রে ইসলামের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে মানবসম্প্রদায়ের মধ্যে নবি ও রাসুল আগমনের বিশ্বাস লালন করতেন। পঞ্চম শিখ ধর্মগুরু অর্জুন দাস (১৫৬৩-১৬০১ খ্রিষ্টাব্দ)-এর আবির্ভাব পর্যন্ত তাদের মধ্যে এ দর্শন প্রচলিত ছিল। অর্জুন দাস শিখদের আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে আবির্ভূত হলে তিনি পূর্ববর্তী শিখ গুরুদের স্রষ্টা হিসেবে ঘোষণা করেন। তিনি শিখদের মধ্যে অবতার-দর্শন প্রবর্তন করেন। শিখধর্মের সে-সকল ধর্মগুরুর তালিকা নিম্নরূপ :

১. নানক (১৪৬৯-১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ) শিখধর্মের প্রবর্তক।
২. অঙ্গাদ দেব (১৫০৪-১৫৫২ খ্রিষ্টাব্দ)
৩. অমর দাস (১৪৭৯-১৫৭৪ খ্রিষ্টাব্দ)
৪. রাম দাস (১৫৩৪-১৫৮১ খ্রিষ্টাব্দ)
৫. অর্জন দেব (১৫৬৩-১৬০৬ খ্রিষ্টাব্দ)
৬. হর গোবিন্দ (১৫৯৫-১৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দ)
৭. হরি রায় (১৬৩০-১৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ)
৮. হরি কৃষ্ণ (১৬৫৬-১৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দ)
৯. তেগ বাহাদুর (১৬২১-১৬৭৫ খ্রিষ্টাব্দ)
১০. গোবিন্দ সিং (১৬৬৬-১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দ)

শিখদের মহান ধর্মগুরুর এই তালিকা নানক থেকে শুরু হয়ে গোবিন্দ সিং পর্যন্ত সমাপ্ত হয়েছে। অবশ্য এদের কারও কারও ব্যাপারে শিখদের মধ্যেই চরম মতবিরোধ রয়েছে। কেননা, কখনো তাদের কোনো ধর্মগুরু পরবর্তী ধর্মগুরুর নির্বাচন করা ছাড়াই মৃত্যুবরণ করেছেন। আবার এ-ও প্রশ্ন উঠেছিল, শিখধর্ম পূর্ণাঙ্গতা অর্জন করেছে কি না! নাকি এর জন্য নতুন সংস্কারকের প্রয়োজন!

এ নিয়ে শিখধর্মের অনুসারীরা দুটি ভাগে বিভক্ত হয়েছেন। একদল মনে করেন, শিখধর্মের আর নতুন সংস্কারকের প্রয়োজন নেই। তাদেরই আরেকটি দল মনে করে, সংস্কারকের এ ধারা অনন্তকাল অব্যাহত থাকা প্রয়োজন। এরা প্রত্যেক যুগের জন্য ধর্মগুরু নির্ধারণ করেন, যিনি তাদের জন্য ধর্মীয় নীতিমালা নির্ধারণ করবেন এবং স্থান-কাল-পাত্রভেদে পবিত্র গ্রন্থের ব্যাখ্যা দেবেন।

পাঠক হয়তো লক্ষ করেছেন, শিখধর্মের আবির্ভাব হয়েছিল আন্তঃধর্ম সংযোগ তৈরির লক্ষ্যে। বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদের অনুসারীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত কমিয়ে আনার প্রয়াসে। তবে এ ধর্মের উদ্দেশ্যটি ব্যর্থ হয়েছে। এটি নতুন একটি ধর্ম হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে এবং এমন একটি তৃতীয় শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে, যা একই সময়ে হিন্দু ও ইসলামের সঙ্গে সংঘাত সৃষ্টি করে। ভারতবর্ষের মুসলমানদের সঙ্গে তাদের রক্তক্ষয়ী বিভিন্ন সংঘর্ষ হয়েছিল।

শায়খ আহমাদ ইবনু ইরফান বেরেলবি ও ইসমাইল শহিদের জিহাদের ব্যর্থতার পেছনে এ সম্প্রদায়টি দায়ী ছিল। এদের হাতেই বালাকোটের ময়দানে মুসলিমবাহিনী পরাজয় বরণ করে। আর তাদের পরাজয়ের মাধ্যমে ভারতবর্ষে আট শতক ধরে চলে আসা শক্তিশালী মুসলিম সাম্রাজ্যের সমাপ্তি ঘটে। এরপরই ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন থেকে আজ পর্যন্ত এ দেশে আল্লাহর বিধান প্রবর্তনের জন্য ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

পরিপূর্ণ রহমত অবতীর্ণ হোক আমাদের নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর, তাঁর পরিজন ও সহচরগণের ওপর।
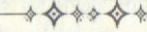
পঞ্চম অধ্যায়

হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহে বর্ণিত সুসংবাদ ও উপসংহার

প্রথম পরিচ্ছেদ

হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহে বর্ণিত সুসংবাদ

ভারতের আলিমগণ হিন্দুধর্মের গ্রন্থগুলোকে আসমানি গ্রন্থ মনে করেন না। এরপরও তাঁরা এসব গ্রন্থে বর্ণিত সুসংবাদগুলো নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন।

ভারতের আহলে হাদিস আলিম শায়খ মুহাম্মাদ ইবরাহিম শিয়ালকোটি (মৃত্যু : ১৩৭৬ হিজরি) এ মর্মে *বাশারাতে মুহাম্মাদিয়া* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। জমিয়তে আহলে হাদিস ভারতের সভাপতি মুনাজির শায়খ সানাউল্লাহ অমৃতসরী (মৃত্যু : ১৩৬৭ হিজরি) *মুহাম্মাদ ঋষি* নামে এর সংক্ষিপ্ত সংকলন রচনা করেন। শায়খ মুহাম্মাদ দাউদ রাজ (১৩৭৭ হিজরি) এটি প্রকাশ করেন।

একইভাবে প্রফেসর মুহাম্মাদ মতিউর রাহমান চতুর্বেদি *খাতামুন নাবিয়্যিন* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

একই বিষয়ে শামস নাবিদ উসমানিও কলম ধরেছিলেন। তবে তিনি সেখানে এমন অনেক বিষয়ের সন্নিবেশ করেন, যা হিন্দু ধর্মমতে স্বীকৃত নয়। তারা সবাই হিন্দুদের গ্রন্থাবলি থেকে উপকরণ সংগ্রহপূর্বক তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন।

অনেক হিন্দু এবং কাদিয়ানি লেখকও ব্যাপারটি গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছে। কাদিয়ানি অনুসারী আবদুল হক বিদ্যার্থী রচনা করে *মিসাকুন নাবিয়্যিন* গ্রন্থ। সে তার এই গ্রন্থে ইয়াহুদি, খ্রিষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও জরথুস্ত্র বিধর্মী গ্রন্থসমূহে বর্ণিত সুসংবাদসমূহ সংকলন করে। ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় এবং অনেক ভাষায় অনূদিত হয়।

এ ছাড়া অনেক হিন্দু ধর্মবেত্তাও একই বিষয়ে কলম ধরেছেন। হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহে রাসুল ﷺ-এর সম্পর্কিত সুসংবাদগুলোর সমন্বয়ে দুটি গ্রন্থ রচনা করেছেন ড. বেদ প্রকাশ। ড. রমেশ প্রসাদ একই বিষয়ে লেখা সালামুল্লাহ সিদ্দিকির গ্রন্থের ভূমিকা রচনা

করেছেন। তিনি সেখানে স্বীকার করেন, *অথর্ববেদে* উল্লিখিত 'নরশংস'-এর অর্থ হচ্ছে 'মুহাম্মাদ'।

'নরশংস' শব্দটি এসেছে 'নর' ও 'শংস' শব্দযুগলের সমন্বয়ে। 'নর' অর্থ 'মানুষ'; আর 'শংস' অর্থ 'প্রশংসিত'। অর্থাৎ, এমন মানুষ, যার প্রশংসা করা হয়। তিনি সেখানে দাবি করেন, মুহাম্মাদ ﷺ ব্যতীত তিনি আর কে হতে পারেন!

কাদিয়ানিরাও কুরআনের অনুবাদ ও ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছে।

ভারতের আলিমসমাজে তামিলনাড়ুতে ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করা *নেরুতাম* পত্রিকার সম্পাদক Assyar রচিত *আল-ইসলামুল্লাজি উহিব্বুহু* গ্রন্থে উল্লিখিত হিন্দুধর্মের সুসংবাদগুলো বেশ প্রসিদ্ধি পেয়েছিল।[১৬১]

মানুষের মনে যে প্রশ্নটি ঘুরে বেড়ায় সেটা হচ্ছে, হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থগুলো আসমানি গ্রন্থ না হলেও সেখানে কীভাবে এ ধরনের সুসংবাদগুলো উল্লেখ হয়েছে? আর এসব সুসংবাদের ব্যাপারে হিন্দুদের অবস্থান-ই বা কী? এসব প্রশ্নের উত্তরে আমি যেসব সম্ভাবনার কথা বলতে পারি তা হচ্ছে :

১. আর্যরা ইবরাহিম আ.-এর শিক্ষাসমূহ থেকে এসব সুসংবাদ গ্রহণ করেছিল। কেননা, তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন ইসমাইল আ.-এর বংশে যেন একজন রাসুল পাঠানো হয়। কুরআনে আল্লাহ বলেন,

﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

'হে আমাদের রব, আপনি তাদের মধ্য থেকে তাদের কাছে একজন রাসুল পাঠান, যিনি আপনার আয়াতসমূহ তাদের কাছে তিলাওয়াত করবেন; কিতাব ও হিকমাহ তাদের শিক্ষা দেবেন এবং তাদের পরিশুদ্ধ করবেন। আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' [সুরা বাকারা : ১২৯]

কেননা, এ কথা তো প্রমাণিত যে, আর্যরা যে সময়ে নিজেদের আদিভূমি ত্যাগ করে জীবিকার অন্বেষণে বেরিয়েছিল, তখনই ইরাক ও তদীয় অঞ্চলে ইবরাহিম আ.-এর ধর্মীয় মতবাদ আবির্ভূত হয়েছিল। আর্যরা তখন এই অঞ্চল পাড়ি দিয়ে সিন্ধু অঞ্চলে এসে পৌঁছেছিল।

[১৬১] আমি জানতে পেরেছি, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

এই যাত্রাপথ থেকেই তারা কিলদানি ও ব্যাবিলনের বিভিন্ন দর্শন সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। মহেঞ্জোদারোর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাবলির গবেষণা থেকেও এর সত্যতা জানা যায়।

আমি আগে মনে করতাম, ব্রহ্মা শব্দটি ইবরাহিম আ.-এর দিকে সম্পর্কিত। পরে এ ব্যাপারে আবুল ফজল সাকসাকির (মৃত্যু : ৭৮৩ হিজরি) *আল-বুরহান ফি মারিফাতিল আদইয়ান* গ্রন্থের আলোচনা দেখেছি। সেখানে তিনি বলেছেন, 'তাদের ব্রাহ্মণ বলে এ কারণে নামকরণ করা হয় যে, তারা আল্লাহকে স্বীকার করে এবং ইবরাহিম আ. ব্যতীত সকল নবি-রাসুলকে অস্বীকার করে; আর ইবরাহিম আ.-কে রাসুল হিসেবে স্বীকার করার কারণে তাদের ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত করা হয়।'[১৬২]

বেনারসের হিন্দু ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ড. পুরাণ নাথ *টাইমস অব ইন্ডিয়ার* ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই-আগস্ট সংখ্যায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দাবি করেন, '*ঋগ্বেদের* শিক্ষাসমূহের বিশাল অংশ তাওরাত ও ইবরাহিম আ.-এর গ্রন্থসমূহ থেকে সংকলন করা হয়েছে।'

এই হিন্দু প্রফেসর কোথা থেকে ইবরাহিম আ.-এর গ্রন্থসমূহের খোঁজ পেয়েছেন? হয়তো ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি জেমস কর্তৃক গ্রিক ভাষায় অনূদিত *The Book of Abrahamam* বা জি এইচ বক্স কর্তৃক হিব্রু থেকে গ্রিক ভাষায় অনূদিত *The Testament of Abrahamam* গ্রন্থটিকে ইবরাহিম আ.-এর গ্রন্থ মনে করেছেন। তবে আমি কোনোভাবেই এসব গ্রন্থকে ইবরাহিম আ.-এর গ্রন্থ বলে বিশ্বাস করি না।

পবিত্র কুরআনে ইবরাহিম ও মুসা আ.-এর যেসব গ্রন্থের কথা বলা হয়েছে, এসব গ্রন্থের পরিণতি কী হয়েছিল, তা আমাদের জানা নেই। এগুলো হয়তো কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে।

২. হিন্দুরা তাদের ধর্মগ্রন্থসমূহ বহুবার পরিমার্জন করেছে। হয়তো তারা ইসলামি শাসনামলে তাদের গ্রন্থসমূহে এ ধরনের সুসংবাদগুলো মুসলমানদের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সন্নিবেশ করেছিল।

আজমগড় শহরে অবস্থিত শিবলি কলেজের সংস্কৃতভাষার শিক্ষক ও ভারতবর্ষের ধর্মসমূহের বিশেষজ্ঞ প্রফেসর সুলতান মুবিনকে এসব সুসংবাদের বাস্তবতা জানতে চেয়ে একবার আমি একটি পত্র দিয়েছিলাম। ২৫ জুন ১৯৭৯

[১৬২] *আল-বুরহান ফি মারিফাতিল আদইয়ান* : ৮৭

তিনি এর জবাবে আমাকে লেখেন, 'এসব জালিয়াতি। তারা পরবর্তীকালে নিজেদের গ্রন্থে এসবের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। তারা ইসলামি যুগেও নিজেদের গ্রন্থ রচনা করেছে। এসব গ্রন্থকে তারা আসমানি গ্রন্থের মতো পবিত্র মনে করে। এগুলোর মধ্যে *ভবিষ্য পুরাণ* ও *কল্কি পুরাণ* উল্লেখযোগ্য।'[১৬৩]

আমার কাছেও তাঁর এ মতটি বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হয়। কেননা, হিন্দুধর্মের বেশির ভাগ গ্রন্থ খলিফা মামুনুর রশিদের আমলে বাগদাদের দারুল হিকমায়[১৬৪] আরবিভাষায় অনূদিত হয়েছিল। এ ছাড়া প্রাচীন কোনো লেখকের গ্রন্থে আমি হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহে এসব সুসংবাদ যে উল্লেখিত আছে, তা শুনতে পাইনি। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই আবু রায়হান মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ বেরুনির (মৃত্যু : ৪৪০ হিজরি) কথা। তিনি সংস্কৃতভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন এবং গ্রন্থ দুটির আরবি অনুবাদ করেছেন। পাশাপাশি তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *তাহকিকু মা লিল হিনদি মিন মাকুলাতিন মাকবুলাতিন ফিল আকলি আও মারজুলাহ* রচনা করেন। সেখানে তিনি হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহে এসব সুসংবাদের কথা উল্লেখ করেননি।

এ কারণে এসব সুসংবাদে বিশ্বাস করতে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। আমি একবার হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহ থেকে এসব সংকলনের পরিকল্পনা করেছিলাম। পরে সেই পরিকল্পনা বাদ দিয়েছি।

এসব সুসংবাদের ব্যাপারে হিন্দু পণ্ডিতদের অবস্থান এবং তাদের বক্তব্যসমূহ যাচাই-বাছাই করে আমার সামনে যেসব বিষয় সামনে এসেছে, তা হচ্ছে :

১. তাদের কেউ কেউ বলেন, এসব সুসংবাদ তাদের ধর্মীয় নেতা ও মহামানবদের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

২. আবার কেউ কেউ এই সুসংবাদের উদ্দিষ্ট ব্যক্তি শেষ যুগে আবির্ভূত হবেন বলে বিশ্বাস করেন।

৩. কেউ কেউ আবার এসবকে বানোয়াট বলে মনে করেন। যেমন : দয়ানন্দ ও তার অনুসারীরা।

[১৬৩] এ দুটি গ্রন্থে এ ধরনের বহু সুসংবাদ পাওয়া যায়।

[১৬৪] অষ্টম শতাব্দীতে নির্মিত ইসলামের ইতিহাসে প্রথম সাড়া জাগানো ও প্রভাবশালী জ্ঞানচর্চাকেন্দ্র বায়তুল হিকমা, যাকে হাউজ অব উইজডম বা জ্ঞানের ভান্ডার হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। অনুবাদকেন্দ্র হিসেবে যাত্রাপথ শুরু হলেও ক্রমেই তা গবেষণাকেন্দ্র, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও মানমন্দিরে পরিণত হয়েছিল। এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আব্বাসি শাসনামলে। খলিফা হারুনুর রশিদ আব্বাসি রাজধানী বাগদাদে এটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর পুত্র খলিফা আল মামুন ৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে সেটির পূর্ণতা দান করেন।—*অনুবাদক*।

৪. কেউ কেউ এসবকে সত্য বলে মনে করেন; কিন্তু তারা ইসলাম গ্রহণ করেননি। যেমন : ড. বেদ প্রকাশ ও ড. রমেশ প্রসাদ।

৫. আবার কেউ কেউ এসবের সত্যতা স্বীকার করে ইসলাম গ্রহণের অনুরাগ প্রকাশ করেছিলেন; কিন্তু তারা নিজেদের জীবন বা নেতৃত্ব হারানোর শঙ্কায় তা করেননি।

আর যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং প্রকাশ্যে এর ঘোষণা দিয়েছিলেন, তাদের বহু বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তারা স্বজাতির মারধর, গালাগালি ও নির্যাতন সহ্য করেছিলেন। তখন যারা পালাতে পেরেছিলেন, তারাই মুক্তি পেয়েছিলেন; আর যারা তাদের কবজায় ছিলেন, তাদের পরিণতি কী হয়েছিল, তা আল্লাহই ভালো যানেন।

৬. তাদের অনেকে আবার এ ব্যাপারে চুপ থাকার নীতি অবলম্বন করেন। আমি ভারতে অনেকের কাছে পত্র লিখে এসব সুসংবাদের বিবরণ পাঠিয়েছি এবং হিন্দু গবেষক ও প্রফেসরদের সামনে তা উপস্থাপনের কথা বলেছি। উত্তরে তারা আমাকে জানিয়েছেন, 'সেই প্রফেসরদের সামনে এসব তুলে ধরা হলে তারা এ ব্যাপারে কথা বলতে চাননি।'

আমি তখন মনে মনে বললাম, আল্লাহ সত্যই বলেছেন,

﴿فَمَن يُرِدِ اللهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۖ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ ۚ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾

এরপর আল্লাহ যাকে পথপ্রদর্শন করতে চান, তার বক্ষকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন এবং যাকে বিপথগামী করতে চান, তার বক্ষকে সংকীর্ণ; অত্যধিক সংকীর্ণ করে দেন, যেন সে সবেগে আকাশে আরোহণ করছে। এভাবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না, আল্লাহ তাদের ওপর আজাব বর্ষণ করেন। [সুরা আনআম : ১২৫]

আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত, তিনিই সঠিক পথের পথপ্রদর্শক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শেষ কথা

আলোচনার সমাপনীতে পাঠকের সামনে মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুদের পার্থক্যগুলো সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরতে চাই। আল বিরুনি তাঁর *তাহকিকু মা লিল হিন্দ* গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন,

১. এর মাধ্যমেই বিভিন্ন জাতির মধ্যে পার্থক্য তৈরি হয়। আর কেউ যদি এই পার্থক্য দূর করার প্রয়াসও চালায়, তাতে ততটা সফল হয় না। এই ভাষা আরবির মতোই অনেকটা জটিল ও বিস্তৃত আকারের। এতে একই বস্তুর বহু নাম থাকে, যা সংক্ষিপ্ত ও বিভিন্ন শব্দমূল থেকে নির্গত হয়। আবার একই শব্দের বহুবিধ অর্থ থাকায় উদ্দেশ্য নির্ধারণের জন্য আলাদা বিশেষণ যুক্ত করতে হয়। বক্তব্যের পটভূমির অনুধাবন ও পূর্বাপরের অর্থ অনুমান করার মতো বুদ্ধিমত্তা না থাকলে এসবের মর্ম উদ্ধার করা সম্ভবপর হয় না। আর তারা এটি নিয়ে বেশ গর্ববোধও করে, বাস্তবে যা একটি ভাষার জন্য দূষণীয় ব্যাপার।

এই ভাষায় কিছু শব্দ রয়েছে এতটাই তুচ্ছ, যা শুধু সাধারণশ্রেণির মানুষদের মধ্যেই ব্যবহৃত হয়। আবার কিছু শব্দ রয়েছে ব্যাকরণ ও সাহিত্যের মানে এতটাই উচ্চাঙ্গের, যা প্রাজ্ঞ মেধাবী ছাড়া অন্য কারও বোধগম্য হওয়ার মতো না। আবার এই ভাষায় এমন কিছু বর্ণমালার অন্তর্ভুক্তি রয়েছে, যা আরবি বা ফারসিভাষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আমাদের জিহ্বা ও স্বর যথাযথভাবে এর উচ্চারণেও সক্ষম নয়। সাধারণভাবে শুনলে এই বর্ণমালার কাছাকাছি শব্দগুলোর মধ্যে তফাত করাও দুষ্কর হয়ে পড়ে। লেখার ক্ষেত্রেও যথাযথভাবে সেসব শব্দের বিবরণ দেওয়া সম্ভব হয় না। যে কারণে আমাদের ভাষায় তাদের সেসব শব্দ লিখতে বিভিন্ন চিহ্ন ইত্যাদির পরিবর্তন করে প্রকাশ করতে হয়। লেখকদের মধ্যে এসবের সঠিক উচ্চারণ নিয়ে দ্বিধার সৃষ্টি হয় এবং এর সঠিকতা নিরূপণে বহু প্রচেষ্টা চালাতে হয়। এর দু-একটি উদ্ধৃতি টানতেই বহু কষ্টের শিকার হতে হয়।

আর এতে যে নতুন ভাষার সৃষ্টি হয়, তা উভয় জাতির কারও জন্যই মর্মোদ্ধার করা সহজসাধ্য হয় না।

২. তারা ধর্মীয়ভাবে পুরোপুরিই আমাদের বিরোধী অবস্থানে। তাদের স্বীকৃত কোনো বিষয়ই আমাদের কাছে মান্যতাপ্রাপ্ত নয়; আর আমাদের কোনো বিষয়ই তাদের মান্যতা পায়নি। তারা ধর্মীয় বিষয়াদি নিয়ে নিজেদের মধ্যে খুব সামান্যই বিরোধে জড়ায়। আর সেসব বিরোধের জেরে কারও সম্মান বা জীবনের ক্ষতি করা হয় না। কিন্তু ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে তাদের আচরণ এমন নয়। তারা তাদের 'ম্লেচ্ছ' নামে অভিহিত করে, যার অর্থ নোংরা, অপবিত্র। তাদের সঙ্গে কোনো আচার-অনুষ্ঠান ও বিয়ে-শাদিতে একত্রিত হওয়া বৈধ মনে করে না। তাদের সঙ্গে বসা বা পানাহার করাও বৈধ মনে করে না। এমনকি তারা তাদের ব্যবহৃত পানি ও আগুন ব্যবহার করাও অন্যায় মনে করে। জীবনের অপরিহার্য দুটি উপাদানের ক্ষেত্রেই তারা এমন আচরণ করে।

তাদের ইত্যাকার আচরণ আর মনোভাব কি কোনোভাবে শোধরাবে? নোংরা বস্তু যেমন শুধু পবিত্রীকরণের মাধ্যমেই পবিত্র হয়, তেমনিভাবে তাদের কাছেও গ্রহণযোগ্যতা পেতে ভিন্নধর্মীদের হয় তাদের অনুরাগী হতে হবে, না হয় তাদের ধর্মের প্রতি প্রগাঢ় টান অনুভব করতে হবে। এমন মনোভাবের কারণেই তাদের সঙ্গে সুসম্পর্কের সকল উপায় ছিন্ন হয়েছে; আর সৃষ্টি হয়েছে চরম বিদ্বেষ।

৩. তারা সকল প্রথা ও রীতিনীতিতেও আমাদের সঙ্গে বৈপরীত্যপূর্ণ অবস্থানের অধিকারী। এমনকি তারা তাদের শিশুদের আমাদের আকৃতি ও পোশাক ইত্যাদি দিয়ে ভয় দেখায়। তারা আমাদের দুষ্টমানব রূপে চিত্রায়িত করে।

তাদের কারও কারও সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। আমি দেখলাম তারা আমার ওপর ক্ষুণ্ন। এর কারণ ছিল, তাদের কোনো এক সম্রাট আমাদের অঞ্চল থেকে অভিযান পরিচালনা করা কোনো শত্রুর হাতে বধ হয়েছিলেন। তার স্ত্রীর গর্ভে থাকা তার সন্তান পরবর্তীকালে তার উত্তরাধিকারী মনোনীত হয়েছিল। একবার সে তার মায়ের কাছে পিতার ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি তাকে সবিস্তারে জানিয়ে দেন। এতে সে চরম ক্রুদ্ধ হয়ে পড়ে। এরপর সে নিজের অঞ্চল ছেড়ে শত্রুভূমিতে যায়। সেখানে সে জনগণের ওপর চরম নিপীড়ন ও রক্তারক্তির মাধ্যমে নিজের ক্ষোভ মেটায়। আর অবশিষ্টদের আমাদের মতো বেশভূষা আর পোশাক

পরিয়ে লাঞ্ছিত করে। এসব শুনে আমি তার কাজের প্রশংসা করলাম—যাইহোক, সে তো আর আমাদের হিন্দু বানিয়ে দেয়নি বা তাদের রীতি পালনে বাধ্য করেনি।

৪. আরও যে ব্যাপারটি মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুদের বিরোধ ও দ্বন্দ্ব উসকে দিয়েছিল—শামানিজমে[১৬৫] বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণদের সঙ্গে চরম বিদ্বেষ থাকা সত্ত্বেও তারা অন্যদের তুলনায় ভারতের খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। ইতিপূর্বে খোরাসান, পারস্য, ইরাক ও শামের সীমান্তবর্তী মসুল অঞ্চল পর্যন্ত তাদের মতাবলম্বী ছিল। আজারবাইজানে জরথুস্ত্রের[১৬৬] আবির্ভাবের ফলে এই মতবাদের প্রভাব কমে আসে। জরথুস্ত্র বলখে পৌঁছে সেখানে অগ্নিপূজার প্রতি মানুষদের আহবান করতে থাকে।[১৬৭] সম্রাট কাশতাসাবের দরবারে তার মতবাদ প্রচারলাভ করে। তার ছেলে ইসফানদারিয়া প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে বিভিন্ন উপায়ে এই মতাদর্শ প্রচারে আত্মনিয়োগ করে। তার প্রচেষ্টায় চীন থেকে রোম পর্যন্ত অগ্নিপূজার উপাসনালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর পারস্য ও ইরাকের শাসকেরা তাদের মতবাদের প্রতি অনুরাগী হলে শামানিরা সেখান থেকে বিতাড়িত হয়ে বলখের পূর্বাঞ্চলে যায়। আর অগ্নিপূজকেরা এখনো ভারতে অবস্থান করছে। তারা সেখানে মগ[১৬৮] নামে নিজেদের পরিচয় দেয়।

এভাবেই খোরাসান থেকে তাদের বিতাড়িত হওয়ার ধারা শুরু হয়। এরপর ইসলামের আবির্ভাব ঘটে ও পারস্য সাম্রাজ্যের পতন হয়। মুহাম্মাদ ইবনু কাসিম

---

[১৬৫] শামানিজম (Shamanism) হচ্ছে একটি মানবতাত্ত্বিক বিষয়, যা আত্মিক জগতের সঙ্গে যোগাযোগের নিমিত্তে বিশ্বাস ও ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যস্থতাকারী বা Intermediary হলেন শামানরা। এই শামানদের মাধ্যমেই অপর জগতের বাসিন্দাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়।

যারা শামানিজম চর্চা করে তাদের আমেরিকা মহাদেশে শামান, ভারত উপমহাদেশে তান্ত্রিক, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে ওঝা/কবিরাজ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সামগ্রিক মিয়ানমার অঞ্চলে 'মগ বৈদ্য' বলা হয়।—*অনুবাদক*।

[১৬৬] খ্রিষ্টপূর্ব ৬৬০ সালে তার জন্ম হয়; আর মৃত্যু হয় খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮৩ সালে। সে মগদের বংশোদ্ভূত ছিল। এই ধর্মের মৌলিক ধর্মগ্রন্থ দুইটি। এভেস্তিয়ানভাষায় রচিত দাসাতির ও জেন্দাবেস্তা। গ্রন্থদ্বয়ে একত্ববাদের বহু আলোচনা আছে। অবশ্য বর্তমানের জরথুস্ত্রবাদে বিশ্বাসীরা অগ্নিপূজা করে থাকে।

[১৬৭] কেননা, তার গোত্রের লোকেরা তার আহ্বানে সাড়া দেয়নি, তাই সে বলখের সম্রাট কাশতাসাবের দরবারে গিয়ে তাকে নিজের মতবাদের প্রতি আহ্বান করে। সম্রাট তার আহবানে সাড়া দেয় এবং তার মতবাদ গ্রহণ করে। এভাবে খুব দ্রুত তার মতবাদ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বিভিন্ন অঞ্চলে সে নিজের ধর্মপ্রচারকদের পাঠাতে থাকে। একপর্যায় তাদের সঙ্গে তুরানি ও পারস্যবাসীর যুদ্ধ হয়। জনৈক তুরানির হাতে সে নিহত হয়।

[১৬৮] তাদের Magian তথা জাদুকর নামেও জানা হয়।

ইবনু মুনাব্বিহের সিজিস্তানের পথ ধরে সিন্ধু বিজয় তাদের মনে আরও ভীতির সঞ্চার করে। তিনি 'ভমনাওয়া' শহরের নাম রাখেন 'মানসুরা', 'মুলিস্তান' বিজয় করে তার নাম রাখেন 'মামুরা'। তিনি ভারতের কনৌজ শহর পর্যন্ত দাপিয়ে বেড়ান। হানা দেন কান্দাহারে ও কাশমিরের সীমান্তে। কৌশলী রণনীতিতে কখনো তিনি যুদ্ধ আবার কখানো সন্ধির পথ গ্রহণ করেন। তিনি সেখানকার স্থানীয় অধিবাসীদের নিজেদের ধর্মের অনুসারী থাকার সুযোগ দেন। তবে যারা চাইত তারা স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরিত হতো। এর ফলে প্রাচীন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিদ্বেষের সূচনা হয়।

মুহাম্মাদ ইবনু কাসিমের পর কোনো সেনাপতি কাবুল ও সিন্ধু অববাহিকা পাড়ি দেননি। এরপর সামানি শাসনামলে তুর্কিরা শাসনক্ষমতা গ্রহণ করে; আর সুলতান নাসিরুদ্দিন সবুক্তগিন সাম্রাজ্যের অধিকর্তা নিযুক্ত হলে তিনি নতুন করে অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি ভারত দখলের জন্য অভিযানের পথ সুগম করেন, যে পথ ধরে সুলতান ইয়ামিনুদ্দৌলা মাহমুদ ত্রিশোর্ধ্ব বছর ধরে অভিযান অব্যাহত রাখেন। তিনি সেখানে স্থানীয় অধিবাসীদের প্রতিপত্তির অবসান ঘটান। অবিশ্বাস্য উপায়ে বিজয়ের গল্পগাথা রচনা করেন। যার ফলে তাদের পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে মুসলমানদের প্রতি তৈরি হয় চরম বৈরী মনোভাব ও বিদ্বেষ। এমনকি এর প্রভাবে তাদের বিজিত অঞ্চলগুলো থেকেও তাদের শাস্ত্রজ্ঞানচর্চা হারিয়ে যেতে থাকে। পাশিপাশি বহিরাগত রাজনৈতিক শক্তি ও ধর্মের প্রভাবে কাশমির ও বেনারসের মতো শহর ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলে এসবের পুনুরুদ্ধার আর সম্ভব হয়নি।

এরপর তিনি তাদের আরও কিছু দোষের আলোচনা করেন, যা তাদের মধ্যে স্পষ্টতই পরিলক্ষিত হয়। আর বোকামি এমন ব্যাধি, যার কোনো উপশম নেই।

৫. তারা মনে করে এই বিশ্বচরাচর তাদের। মানুষদের মনে করে তাদের বংশোদ্ভূত। নিজেদের মনে করে রাজাধিরাজ। আর নিজেদের ধর্মকে মনে করে সকল ধর্মের মূল। নিজেদের জ্ঞানকেই মনে করে সকল জ্ঞানের সেরা। তারা এ নিয়ে চরম অহমিকা ও দাম্ভিকতায় ভোগে। তারা স্বজাতির মধ্যে অযোগ্য লোকদের মধ্যেই জ্ঞানের আলো জ্বালাতে কার্পণ্য করে। অন্যদের ব্যাপারে তাদের মনোভাব তো এ থেকেই অনুমেয়।

তারা মনে করে বিশ্বজুড়ে তাদের অঞ্চল ও নিজেদের অঞ্চলের অধিবাসীদের ছাড়া কারও কাছে কোনো জ্ঞান নেই। এমনকি যদি তাদের কাছে অন্য এলাকার কোনো বিদ্যার সংবাদ দেওয়া হয় বা খোরাসান ও পারস্যের কোনো বিদ্বান ব্যক্তির সংবাদ দেওয়া হয়, তারা তখন সংবাদদাতাকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে। তারা কোনোভাবেই

এটি মেনে নিতে চায় না। যদি তারা পরিব্রাজন করত ও মানুষদের সঙ্গে মেলামেশা করত, তাহলে নিজেদের এমন মানসিকতা থেকে ফিরে আসত। উপরন্তু, তাদের পূর্বসূরিরা এতটা অসচেতন ছিল না।

এই ছিল আল বিরুনির *ফি তাহকিকি মা লিল হিনদি মিন মাকুলাতিন মাকবুলাতিন ফিল আকলি আও মারজুলাতিন* গ্রন্থে উল্লেখিত আমাদের ও হিন্দুদের মধ্যকার কিছু বৈপরীত্য। এগুলোর কারণেও আমাদের মধ্যে বিরাগ ও বিদ্বেষ পরিলক্ষিত হয়।

তবে আমার দৃষ্টিতে হিন্দুরা রিসালাতের বাস্তবতা ও তাওহিদের মর্মবাণী না বোঝাটাই মুসলমানদের সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্ব ও বিদ্বেষের মূল কারণ। কেননা, মুসলমানদের মধ্যে যারা হিন্দুত্ব-প্রভাবিত সুফিবাদের সাধনা করেছে, তারা ইসলামের সঠিক আকিদা বিকৃত করে ছেড়েছে—যেসব আকিদা কুরআন-সুন্নাহের আলোকে সাহাবি ও তাবেয়িগণ লালন করতেন। আর যে আকিদা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল আর তাঁর পথেই চলেছিলেন শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া ও তাঁর পরবর্তী আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ইমামগণ।

উপরন্তু এ সুফিগণ ইসলামি আকিদার সঙ্গে মূর্তিপূজার বিশ্বাসের মিশ্রণ ঘটিয়েছে। এর বড় প্রমাণ, ভারতজুড়ে বহু কবরের ওপর নির্মিত সমাধিসমূহ ও এসবকে কেন্দ্র করে সংঘটিত তাওয়াফ, সিজদা ও সাহায্যপ্রার্থনার মতো কুফরি কর্মকাণ্ড। এসব কাজ মূলত হিন্দুরা করে থাকে তাদের মন্দিরকে কেন্দ্র করে।

এর পাশাপাশি হিন্দু লেখকদের ইসলাম ও ইসলামি ধর্মবিশ্বাস নিয়ে রটানো মিথ্যাচার ও প্রোপাগান্ডাসমূহও এর জন্য সমানভাবে দায়ী। তারা ব্যাপক মিথ্যাচার ছড়িয়েছে আমাদের ইতিহাস ও রাসুল ﷺ-এর জীবনচরিত নিয়ে। হিন্দু শাস্ত্রের প্রাথমিক একজন শিক্ষার্থী ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি বিরূপ ধারণা নিয়েই তার অধ্যয়ন শুরু করে। তাই ভারতের মুসলমানদের জন্য উচিত, তাঁদের ধর্মীয় মৌলিক গ্রন্থগুলো স্থানীয় ভাষায় ব্যাপক অনুবাদে প্রয়াসী হওয়া।

অন্যদিকে মুসলমানরা প্রায় আট শতক ধরে ভারতবর্ষ শাসন করেছে। কিন্তু তাদের মধ্যে আল্লাহর বিশেষ তাওফিকপ্রাপ্তদের ছাড়া সাধারণত এমন খুব বেশি শাসকের দেখা মেলেনি, যারা তাদের অধীন হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিতে কোনো উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বরং পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছিল যখন তাদের উদ্যোগে *বেদ*, *গীতা* ও *রামায়ণের* মতো হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলো আরবি ও ফারসিভাষায় অনূদিত হয়েছিল; যেখানে তারা কুরআন,

হাদিস, সিরাত ও ইসলামি ধর্মবিশ্বাসের বিবরণ-সংবলিত মৌলিক ও বিশুদ্ধ গ্রন্থাবলি সংস্কৃতসহ অন্যান্য স্থানীয় ভাষায় অনুবাদের ব্যাপারে উদাসীনতার পরিচয় দিয়েছেন। এমনকি আজ অবধি হিন্দিভাষায় কুরআনের নির্ভরযোগ্য বিশুদ্ধ কোনো অনুবাদ রচিত হয়নি। আমি কয়েকটি গ্রন্থাগারে কুরআনের হিন্দি অনুবাদের তথ্য পেয়ে তা পড়ে দেখেছি, যা ততটা সূক্ষ্মতার সঙ্গে অনুবাদ করা হয়নি। তাই এসবের পুনঃনিরীক্ষণ করা উচিত। সবচেয়ে ভালো হবে আকিদা ও আত্মশুদ্ধির অঙ্গনে সুপরিচিত কোনো আলিমের তত্ত্বাবধানে নতুনভাবে এর অনুবাদ সম্পন্ন করা।

কুরআনের অবিরত খিদমত আনজাম দিতে পারাটা সৌদি সরকারের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়। মহান আল্লাহর তাওফিকে কুরআনের অনুবাদ এবং এর তাফসিরের প্রচারের লক্ষ্যে মদিনা মুনাওয়ারায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'মাজমাউল মালিক ফাহাদ'। বিশ্বজুড়ে প্রতিটি মুসলমানের জন্য এই প্রথমবারের মতো বিস্তৃত পরিসরে নিজেদের মাতৃভাষায় কুরআনের অনুবাদ ও ব্যাখ্যাগ্রন্থের প্রচার এবং বিতরণ-উদ্যোগ দেখতে পাওয়া খুবই সম্মান ও আনন্দের।

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

উৎসগ্রন্থ

আরবি গ্রন্থসমূহ

১. কুরআন কারিম।
২. হাদিস গ্রন্থসমূহ।
৩. সিয়ার ও মাগাজি গ্রন্থসমূহ।
৪. *আল-ফাসলু ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়ায়ি ওয়ান নিহাল*, ইবনু হাজম প্রণীত।
৫. *আদইয়ানুল আলামিল কুবরা*, হাবিব সায়িদ প্রণীত।
৬. *হাজারাতুল হিনদ*, গুস্তাভ লে বন প্রণীত।
৭. *তাহকিকু মা লিল হিনদ*, আল বিরুনি প্রণীত
৮. *আদইয়ানুল হিনদ আল কুবরা*, ড. আহমাদ শালাবি প্রণীত।
৯. *আল-হিনদু ওয়াল আরাব ফি আহদির রিসালাহ*, কাজি আতহার মুবারকপুরি রচিত।
১০. *গীতার আরবি অনুবাদ*।
১১. *মনুস্মৃতির আরবি অনুবাদ*।
১২ *আল-আকিদা ওয়াশ শারিয়া*, গোল্ডজিহর প্রণীত (আরবি অনুবাদ)।
১৩. *আল-মিলাল ওয়ান নিহাল*, শাহারাস্তানি প্রণীত।
১৪. *কিসসাতুল হাজারাহ*, উইল ডুরান্ট প্রণীত (আরবি অনুবাদ)।
১৫. *আল বুরহান ফি মারিফাতি আকায়িদি আহলিল আদইয়ান*, আবুল ফজল সাকসাকি হাম্বলি প্রণীত।
১৬. *মাকালাতুন আনিল হিনদুসিয়া*, জামিয়া ইসলামিয়ার সাময়িকীতে প্রকাশিত।
১৭. *দিয়ানাতুন কাদিমাতুন*, শায়খ আবু জাহরা প্রণীত।
১৮. *মুশকিলাতুল উলুহিয়া*, ড. আবু গাললাব প্রণীত।

হিন্দি গ্রন্থাবলি

১. *চতুর্বেদ*।
২. *ভবিষ্য পুরাণ*, রাম শর্মা অনূদিত।
৩. *রামায়ণ*
৪. *মহাভারত*
৫. *মহাভারত ভাষা*, যোগেশ।
৬. *উপনিষদ*, ব্যাখ্যা—লাল গৌতম।
৭. *ভগবত-দর্শন*, রাম শর্মা।
৮. *হিন্দু ধর্মকোষ*, ড. রাজবলি পণ্ডিত।
৯. *বৈদিক ইনডেক্স*, রাম কুমার অনূদিত।
১০. *মনুস্মৃতি*, চেমন লাল গৌতম অনূদিত।

১১. *সত্যার্থ প্রকাশ*, দয়ানন্দ।
১২. *বিশ্ব ধর্ম-দর্শন*, বিহারিলাল নন্দা।
১৩. *সংস্কৃত কি চার অধ্যায়*, রামধারী সংঘ।
১৪. *বৈদিক ধর্মদর্শন*, নরেন্দ্র দেব।
১৫. *নরশংস আওর অন্তিম ঋষি*, বেদ প্রকাশ।
১৬. *কল্কি অবতার আওর মুহাম্মাদ ﷺ*, বেদ প্রকাশ।
১৭. *মহেঞ্জোদারো*, সতীশ চন্দ্র।
১৮. *বুদ্ধদর্শন*, রাহুল সাংকৃত্যায়ন।
১৯. *অন্তিম অবতার*, প্রফেসর মুতিউর রাহমান চতুর্বেদি।
২০. *সাপ্তাহিক কান্তি*
২১. *অহিংসা আওর সত্য*, রাম নাথ সিমন।

উর্দু গ্রন্থসমূহ

১. *ভগবত গীতা*, হাসান উদ্দিন আহমাদ অনূদিত।
২. *ওয়াদিয়ে সিন্ধ কি তাহজিব*, মুহাম্মাদ ইদরিস সিদ্দিকি অনূদিত।
৩. *ওয়াদিয়ে সিন্ধ আওর উসকি বাদ কি তাহজিব*।
৪. *দালায়েলুল কুরআন বিজাওয়াবি ইফতিরায়ি দয়ানন্দ ওয়া বুহতান*, রামনগরী।
৫. *কাদিম হিন্দি ফালসাফা*, রাম শিব মোহন লাল।
৬. *হক প্রকাশ*, শায়খ সানাউল্লাহ অমৃতসরী।
৭. *আওয়াগমন কি তাহকিকি জায়েজা*, রাম নগরী।
৮. *মুহাম্মাদ ঋষি*, শায়খ সানাউল্লাহ অমৃতসরী।
৯. *আরয়া সমাজ আকিদায়ে নাজাত*, রাম নগরী।
১০. *বেদ কি কাদামাত*, সাইয়িদ হামিদ আলি।
১১. *ইশক আওর ভক্তি*, ইমাদুল হাসান ফারুকি।
১২. *জদিদ হিন্দুস্থান মে জাতপাত*, শ্রী নাওয়াস।
১৩. *কাদিম হিন্দুস্থান কি সাকাফাত ওয়া তাহজিব*, কুসুম্বি।
১৪. *আগার আব ভি না জাগি তু*, শামস নাভিদ উসমানি।
১৫. *আস-সিখ ওয়াল আলমানিয়া*, করতার সিং।
১৬. *হিন্দু ধর্ম কি জাদিদ শাখসিয়াতেঁ*, মুহাম্মাদ ফারুক খান।
১৭. *আরয়া সমাজ কি তারিখ*, লালা লাজপত রায়।
১৮. *সিখ মাজহাব*, রফিক খান।
১৯. *হিন্দুস্থানি মাজাহিব*, দাওয়া পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা।
২০. *হিন্দুস্থানি তাহজিব কা মুসলমানুঁ পর আসর*।